بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রিয়াযুছ-ছালিহীন

জীবন পথের পাথেয়

[১ম-২য় খণ্ড একত্রে]

মূল

ইমাম আবু যাকারিয়্যা ইয়াহ্ইয়া বিন শরফ নববী (রহঃ)

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ্

শিক্ষক, আরবী ভাষা ও সাহিত্য

মাদরাসাতুল মাদীনাহ্, আশরাফাবাদ, ঢাকা

প্রকাশনায়

মোহাম্মদী কুতুবখানা

৩৯/১ নর্থব্রুক হল রোর্ড

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশক ঃ
মোঃ আমান উল্লাহ্
মোহাম্মদী কুতুবখানা
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবা ঃ ০১৭১৫৪১০৮৩৪
০১১৯২১৫০৮৯৪

উৎসর্গ

আম্মা-আব্বার মাগফেরাত কামনায়।

প্রকাশকাল ঃ
রবিউল আওয়াল, ১৪১৭ হিজরী
জুলাই, ১৯৯৬ ইং

মুদ্রণে ঃ
মোহাম্মদী প্রিন্টিং প্রেস
৪৯, হরনাথ ঘোষ রোড, ঢাকা-১২১১

কম্পিউটার কম্পোজঃ
দারুল কলম কম্পিউটার
মাদরাসাতুল মাদীনাহ্ আশরাফাবাদ,
লালবাগ, ঢাকা-১৩১০

মূল্য ঃ ৫০০.০০ (পাঁচশত) টাকা মাত্র

অনুবাদকের আরজ

ইহা তো জানা কথা যে, মানব জীবন ও মানব চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে এবং মুসলমানদের অন্তরে ঈমান ও ইয়াকীনের নূর পয়দা করিবার ক্ষেত্রে কোরআন ও হাদীছের চাইতে উত্তম ও বরকতপূর্ণ আর কিছু হইতে পারে না। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন-

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما ، كتاب الله و سنتى

তোমাদের মাঝে আমি দুইটি বিষয় রাখিয়া গেলাম। যতক্ষণ তোমরা উহাদিগকে আঁকড়াইয়া থাকিবে, কিছুতেই গোমরাহ হইবে না। একটি হইল আল্লাহর কিতাব এবং দ্বিতীয়টি হইল আমার সুন্নাহ।

তাই বিভিন্ন যুগে ওলামায়ে কেরাম উম্মতের ঈমান তাজা করিবার এবং আমল-আখলাক যিন্দা করিবার উদ্দেশ্যে কোরআন ও হাদীছের অশেষ বরকতপূর্ণ ভাণ্ডার হইতে চয়ন করিয়া বহু কিতাব সংকলন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, গাফেল বান্দাকে গাফলতের বরবাদি হইতে উদ্ধার করিয়া আল্লাহর সহিত সম্পর্ক জুড়িয়া দিবার ক্ষেত্রে এই সকল কিতাব অতি বরকতপূর্ণ ও কল্যাণকর প্রমাণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সপ্তম হিজরী শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ ইমাম নববী (রহঃ) সংকলিত رياض الصالحين কিতাবখানা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুতঃ বহু শত বৎসর যাবত এই বরকতপূর্ণ কিতাবখানা মুসলিম উম্মাহর ঈমান, আমল ও আখলাকের পথে এক সমুজ্জ্বল আলোকবর্তিকা রূপে কাজ করিয়া আসিতেছে। বিশেষতঃ আরব জাহানের দ্বীনদার মহলে ইহা অতীব গুরুত্ব,আজমত ও মুহব্বতের সহিত পঠিত হইয়া আসিতেছে। এমন কি দুনিয়ার বিভিন্ন ভাষায় ইহার তরজমাও প্রকাশিত হইয়াছে।

বহুদিন হইতে দিলের একান্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল, এই মহাবরকতপূর্ণ সংকলনখানার ব্যাখ্যাসহ বাংলা তরজমা করিয়া বাংলা ভাষী মুসলমান ভাইবোনদের একটি দ্বীনী খিদমত আঞ্জাম দিব, যাহাতে আল্লাহ্ রাহমান রাহীম অধমের প্রতি রাজী খুশী হইয়া এই টুটাফাটা মেহনতকে কবুল করেন এবং নাজাতের ফায়সালা করেন। و ما ذلك على الله بعزيز আল্লাহ পাকের জন্য উহা অসাধ্য কিছু নহে।

আজ হইতে দশ বৎসরেরও বেশী হইবে, আমি ও সুহৃদ বন্ধু মাওলানা ইসমাঈল বরিশালী সাহেব সম্মিলিতভাবে কিতাবখানার তরজমা শুরু করিয়াছিলাম এবং মাদরাসা-ই-নূরীয়া হইতে আমাদের সম্পাদনায় প্রকাশিত মাসিক রহমতে ধারাবাহিকভাবে উহা প্রকাশিত হইতে শুরু করিয়াছিল। কিন্তু-

ما كل ما يتمنى المرء يدركه – تجرى الرياح بما لا تشتهى السفن

মানুষের সব আরজু-আকাঙ্ক্ষাই কি সত্য হয়? নৌকার মর্জি মতই কি বায়ু প্রবাহিত হয়?

তাছাড়া كل أمر مرهون بوقته (সকল কিছু নির্ধারিত সময়ের নিগড়ে আবদ্ধ।) এই

অমোঘ বিধানও কার্যকর ছিল। ফলে এই মুবারক আমল শুরু হইবামাত্র বন্ধ হইয়া গেল। আফসোসের তখন অন্ত ছিলোনা। অবশেষে রাহমান রাহীম আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পুনরায় তাওফিক দান করিলেন। ফলে কিছুদিন পূর্বে ব্যাখ্যাসহ তরজমার কাজ পুনরারম্ভ হইল।

আলহামদু লিল্লাহ! ছুম্মা আলহামদু লিল্লাহ! দিলের বহুদিনের সেই সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা আজ তাঁহারই মেহেরবানীতে বাস্তবায়িত হইতে শুরু করিয়াছে। رياض الصالحين এর ব্যাখ্যাসহ বাংলা তরজমা প্রথম খণ্ড এখন মুসলমান ভাইবোনদের খিদমতে পেশ করা হইতেছে। আশা করি পরবর্তী খণ্ডগুলিও দ্রুত প্রকাশিত হইবে, ইনশাআল্লাহ।

প্রথমতঃ প্রতিটি হাদীছের সরল তরজমা পেশ করা হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ প্রতিটি হাদীছের শুরুতে একটি শিরোনাম যুক্ত করা হইয়াছে যাহাতে হাদীছের মূল বক্তব্য ফুটিয়া উঠে।

তৃতীয়তঃ 'ফায়দা' আকারে প্রতিটি হাদীছের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা পেশ করা হইয়াছে, যাহাতে হাদীছের মর্ম ও শিক্ষা হৃদয়ংগম করা সহজ হয়। কেননা প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা ছাড়া হাদীছ বুঝিয়া উঠা অনেক সময় সহজসাধ্য হয় না। এমন কি ভুল বুঝিবারও সমূহ সম্ভাবনা থাকে।

চতুর্থতঃ ক্ষেত্রবিশেষে 'হাদীছের শিক্ষা' এই শিরোনামে সংক্ষেপে সংশ্লিষ্ট হাদীছের মূল শিক্ষা তুলিয়া ধরা হইয়াছে।

ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কিতাবসমূহ হইতে সাহায্য লওয়া হইয়াছে।

১। دليل الفالحين ২। فتح البارى ৩। فتح الملهم ৪। شرح مسلم للنووى ৫। تكملة فتح الملهم ৬। عمدة القارى ৭। اسد الغابة ৮। روح المعانى ৯। تفسير ابن كثير ১০। معارف القران ১১। معارف الحديث

رياض الصالحين এর প্রথম উর্দূ অনুবাদ করিয়াছেন, মুসলিম বিশ্বের স্বনামধন্য ইসলামী চিন্তাবিদ ও আধ্যাত্মিক পুরুষ মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী (মুঃ যিঃ আঃ)-এর ভগ্নি মুহতারামা সাইয়্যেদা আমাতুল্লাহ তাসনীম (রহঃ) তিনি তাঁহার অনুবাদের নাম দিয়াছেন যাদে সফর (সফরের পাথেয়।) উহার অনুকরণে আমরা বাংলা অনুবাদখানার নাম রাখিলাম, জীবন পথের পাথেয়।

কিতাবখানার তরজমা, মুদ্রণ, প্রকাশনা ও পঠন-পাঠনসহ যে কোনভাবে যাহারা সংশ্লিষ্ট হইয়াছেন এবং অদূর ও সুদূর ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট হইবেন তাহাদের সকলকে এবং তাহাদের সহিত সম্পর্কিত সকলকে আল্লাহ তা'আলা কবুল করুন এবং জীবন-মরণ ও কবর-হাশর সকল কঠিন মুহূর্তে আপন রহমতের ওছিলায় হিফাযত করুন। আল্লাহুম্মা আমীন।

আবু তাহের মিছবাহ্
মাদরাসাতুল মাদীনাহ
১২ই রবিউল আউয়াল ১৪১৭হিজরী

সূচীপত্র

ইমাম নববী (রহঃ)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

সপ্তম হিজরী শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ ইমাম নববী (রহঃ)-এর পূর্ণ নাম ইয়াহয়া শরফ বিন মারী বিন হাসান বিন হোসায়ন বিন মুহাম্মদ বিন জুমু'আ বিন হিযাম আবু যাকারিয়া নববী দামেস্কী।

ছয়শত একত্রিশ হিজরীতে দামেস্কের শাসনাধীন হাওরান অঞ্চলের নাওয়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অতি শৈশব হইতেই তাঁহার পিতা সন্তানের শিক্ষা দীক্ষা ও উত্তম প্রতিপালনের প্রতি অতীব যত্নবান ছিলেন।

শৈশবকালেই তাঁহার মাঝে উজ্জ্বলতম ভবিষ্যতের যাবতীয় গুণ, বৈশিষ্ট্য ও সুলক্ষণ সমূহ পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল। শায়খ ইয়াসীন বিন ইউসুফ আলমারাকেশী (রহঃ) বলেন-

শায়খকে আমি দশ বৎসর বয়সেই তাঁহার জন্মভূমি নাওয়ায় দেখিয়াছিলাম। সমবয়সী ছেলেরা তাঁহাকে তাহাদের সহিত খেলাধুলায় শরীক হইতে জোর জবরদস্তি করিত। কিন্তু তিনি কাঁদিয়া ফেলিতেন এবং তাহাদের নিকট হইতে পলায়নপূর্বক দূরে কোথাও গিয়া ঐ অবস্থায় কোরআন তেলাওয়াত করিতে থাকিতেন। ফলে আমার অন্তরে তাঁহার প্রতি মুহব্বত পয়দা হইয়া গেল।

আমি তাঁহার বাল্যশিক্ষকের নিকট গমন করিয়া তাঁহার বিষয়ে বিশেষ যত্ন লইতে উপদেশ দিলাম এবং বলিলাম, আশা করা যায় যে, এই বালক তাহার যুগের শ্রেষ্ঠ আলিম ও শ্রেষ্ঠ যাহিদ বুজুর্গ হইবে।

জন্মভূমির পরিবেশে যখন তাঁহার জ্ঞান-পিপাসা নিবারণের বিশেষ সুবিধা হইতেছিল না তখন তাঁহার পিতা ছয়শত উনপঞ্চাশ হিজরীতে উনিশ বৎসর বয়সে তাঁহাকে দামেস্কে লইয়া আসিলেন। দামেস্ক তখন সকল শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ আলিম ও জ্ঞানপিপাসু তালিবুল ইলমগণের মিলনকেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। সেখানে তখন বিভিন্ন ইলম ও শাস্ত্র চর্চার তিনশতেরও অধিক শিক্ষাকেন্দ্র ছিল।

যুগের শীর্ষস্থানীয় আলিমগণের নিকট তিনি তাফসীর, হাদীছ, ফিকাহ, উছুল, রিজাল, আরবী ভাষা, ব্যাকরণ ও সাহিত্যসহ প্রচলিত সকল বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করেন এবং সমকালীন ওলামা মাশায়েখগণের নিকট হইতে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি লাভ করেন।

তাঁহার জ্ঞান-পিপাসা ও অধ্যয়ন নিবিষ্টতার অবস্থা ছিল এই যে, দীর্ঘ দুই বৎসর তিনি বিছানায় পিঠ রাখিয়া ঘুমান নাই। যখন ঘুমে খুব কাতর হইয়া পড়িতেন তখন স্তূপীকৃত কিতাবে হেলান দিয়া কিছুক্ষণ ঘুমাইয়া লইতেন এবং পুনঃ জাগ্রত হইয়া নব উদ্যমে অধ্যয়নে নিমগ্ন হইতেন।

আল্লামা হাফেজ যাহাবী (রহঃ) বলেন, ইলম চর্চায় অহর্নিশ নিমগ্নতার ক্ষেত্রে ইমাম নববীকে উদাহরণরূপে পেশ করা হইত। এমনকি পথে চলিবার সময়ও তিনি আলোচনা বা অধ্যয়নে ব্যস্ত থাকিতেন।

ইলম হাছিল করিবার জন্য অপরিহার্য যে আটটি গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কথা আল্লামা নববী (রহঃ) স্বরচিত المجموع। কিতাবে উল্লেখ করিয়াছেন সেইগুলি তাঁহার মাঝে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

ইলমী বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি তাঁহার চারিত্রিক পবিত্রতাও ছিল অতুলনীয়। এই ক্ষেত্রে সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ আবুল আব্বাস বিন ফারাহ (রহঃ)-এর সারগর্ভ মন্তব্য উল্লেখ করাই যথেষ্ট হইবে বলিয়া মনে করি। তিনি বলেন-

শায়খ মুহীউদ্দীন নববী (রহঃ)-এর চরিত্রে এমন তিনটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের একত্র সমাবেশ ঘটিয়াছিল যে, উহার কোন একটি যদি কাহারও ব্যক্তিত্বে প্রকাশ লাভ করিত তাহা হইলে পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকা হইতে সফর করিয়া মানুষ তাহার খিদমতে ভিড় জমাইত।

প্রথমতঃ ইলম অর্জন এবং ইলমের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব পালন।

দ্বিতীয়তঃ দুনিয়া এবং দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়ে যুহদ ও নির্মোহতা।

তৃতীয়তঃ সৎকাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ।

আটাশ বৎসর দামেস্কে অবস্থানের পর ছয়শত ছিয়াত্তর হিজরীতে তিনি জন্মভূমি নাওয়ায় ফিরিয়া আসেন। ইহার পূর্বে তিনি ওয়াকফ বিভাগ হইতে ধারকৃত কিতাবসমূহ ফেরত দিয়াছিলেন এবং আপন শায়খগণের কবর যিয়ারত করতঃ বহু অশ্রু বর্ষণ ও দু'আ করিয়াছিলেন। এবং জীবিত সাথী ও বন্ধুদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ভাবে তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া কোলাহলপূর্ণ দামেস্ক ত্যাগ করিয়া নাওয়ার শান্ত নির্জন পরিবেশে ফিরিয়া আসিলেন।

নাওয়ায় আসিবার পর তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং রজব মাসের চব্বিশ তারিখ রোজ বুধবার দিবাগত রাত্রে ইন্তিকাল করেন। সেখানেই তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়।

তাঁহার মৃত্যুসংবাদে গোটা দামেস্ক এবং উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল যেন কান্নায় ভাংগিয়া পড়িয়াছিল। বিশজনের মত প্রখ্যাত কবি তাঁহার মৃত্যুতে শোকগাথা রচনা করিয়াছিলেন। আল্লাহ তাঁহাকে সর্বোত্তম জাযা দান করুন। আমীন!

ইমাম নববী (রহঃ)–এর

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহর, যিনি মহাপরাক্রমশালী, মহাক্ষমতাবান, ক্ষমাশীল। যিনি অন্তর ও অন্তর্দৃষ্টির অধিকারীদের জন্য উপদেশ রূপে এবং বুদ্ধিমান ও শিক্ষাগ্রহণকারীদের জন্য নিদর্শন রূপে রাত্রকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন। যিনি আপন নির্বাচিত বান্দাদিগকে গাফলত হইতে জাগ্রত রাখিয়াছেন। অনন্তর এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার প্রতি তাহাদিগকে নিরাসক্ত করিয়াছেন এবং তাঁহার 'সদা অবলোকন'-এর বিশ্বাস এবং নিরন্তর চিন্তাশীলতা এবং উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণের মানসিকতা দ্বারা তাহাদিগকে (পুণ্যকর্মে) নিমগ্ন করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে সর্বদা অনুগত থাকিবার এবং চিরস্থায়ী আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও জাহান্নাম ওয়াজিবকারী বিষয় হইতে সতর্ক থাকিবার তাওফীক দান করিয়াছেন এবং অবস্থা ও প্রকৃতির আবর্তন-বিবর্তন সত্ত্বেও আনুগত্যে অটল থাকা নছীব করিয়াছেন।

তাঁহার প্রশংসা করিতেছি, চূড়ান্ত প্রশংসা এবং পবিত্রতম, ব্যাপকতম ও পূর্ণতম প্রশংসা এবং আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, যিনি অনুগ্রহশীল ও চিরমহান এবং দয়াবান ও করুণাময়। আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার বান্দা ও রাসূল এবং তাঁহার প্রিয়পাত্র ও প্রেমাস্পদ। (মানুষকে তিনি) সরল পথ প্রদর্শনকারী এবং সত্য–ধর্মের প্রতি আহ্বানকারী।

তাঁহার প্রতি এবং সকল আম্বিয়া কেরামের প্রতি এবং প্রত্যেক নবীর পরিবার-পরিজনের প্রতি এবং সকল নেকবান্দার প্রতি আল্লাহর পক্ষ হইতে রহমত ও শান্তি অবতীর্ণ হউক।

(হামদ ও ছালাত-এর পর) আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون * ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون *

জ্বিন ও ইনসানকে আমি শুধু আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। তাহাদের কাছে আমি রিযিক চাহি না এবং তাহারা আমাকে আহার দান করিবে, ইহাও চাহি না।

এই আয়াতের সুস্পষ্ট ঘোষণা হইল যে, জ্বিন ইনসানকে ইবাদতের জন্যই শুধু সৃষ্টি করা হইয়াছে। সুতরাং তাহাদের অবশ্যকর্তব্য হইল আপন সৃষ্টি-উদ্দেশ্যের প্রতি যত্নবান হওয়া এবং দুনিয়ার ভোগ বিলাস পরিহার করিয়া চলা এবং যুহদ ও নিরাসক্ত জীবন গ্রহণ করা। কেননা দুনিয়া হইল ধ্বংসশীল স্থান, অমরত্ব লাভের স্থান নহে এবং (অনন্ত জীবনের পথে) পাড়ি দিবার বাহন, আনন্দ ফুর্তির স্থান নহে, বিচ্ছিন্ন হইবার ক্ষেত্র, চিরস্থায়ী আবাসস্থল নহে। সুতরাং ইবাদতকারীগণই হইলেন সচেতনতম ব্যক্তি এবং যাহিদ ও নিরাসক্ত ব্যক্তিগণই হইলেন দুনিয়াতে বুদ্ধিমানতম ব্যক্তি।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন–

انما مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس و الانعام، حتى اذا اخذت الارض زخرفها و ازينت و ظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون *

দুনিয়ার জীবনের উদাহরণ হইল পানি, যাহা আমি আসমান হইতে নাযিল করিয়াছি। অনন্তর বৃষ্টির কারণে যমিনের উদ্ভিদ তরুতাজা হইয়া উঠিল, যাহা মানুষ ও পশু খাদ্য রূপে গ্রহণ করে। এমন কি যমিন যখন শোভা ধারণ করিল এবং (ফুলে ফলে) সুশোভিত হইল এবং উহার মালিকেরা ভাবিল যে, তাহারা উহার ফল ও ফসল সংগ্রহে সক্ষম তখন রাত্রে বা দিনে আমার ফায়সালা আসিয়া পৌছিল। তখন আমি ঐ ফসল এমনভাবে কর্তিত করিলাম যেন বিগত কালে এখানে কিছুই অংকুরিত হয় নাই। চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য এই ভাবেই আমি আমার নিদর্শনাদি বিশদভাবে বর্ণনা করি।

এই বিষয়ক আয়াত প্রচুর রহিয়াছে। কবি বড় সুন্দর বলিয়াছেন–

ان لله عبادا فطنا + طلقوا الدنيا و خافوا الفتنا

আল্লাহর কতিপয় বুদ্ধিমান বান্দা আছেন যাহারা ফিতনার ও মহাপরীক্ষার আশংকায় দুনিয়াকে তালাক দিয়াছেন। অর্থাৎ চিরদিনের জন্য বর্জন করিয়াছেন।

نظروا فيها فلما علموا + انها ليست لحى و طنا

দুনিয়ার হাকীকত চিন্তা করিয়া যখন তাহারা জানিলেন যে, ইহা কোন 'জীবনধারীর' স্থায়ী আবাস নহে।

جعلوها لجة و اتخذوا + صالح الاعمال فيها سفنا

তখন তাহারা ইহাকে পারাপারক্ষেত্র রূপে এবং নেক আমলকে (পারাপারের) নৌকা রূপে গ্রহণ করিলেন।

দুনিয়ার ক্ষণস্থায়িত্বের এই যখন অবস্থা এবং ইবাদত বন্দেগীই যখন আমাদের সৃষ্টি-উদ্দেশ্য সুতরাং আদেশপ্রাপ্ত বান্দার অবশ্যকর্তব্য হইল নেককারদের পথে নিজেকে পরিচালিত করা এবং চক্ষুষ্মান ও জ্ঞানবানদের পন্থা অনুসরণ করা এবং যেই পথের ইংগিত দিয়াছি (অর্থাৎ দুনিয়ার নিকৃষ্ট ভোগ বিলাস পরিহার করা এবং বন্দেগী আদায় করা) সেই পথে চলিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া এবং যেই বিষয়ে সতর্ক করিয়াছি (অর্থাৎ নেককারদের পথ এবং জ্ঞানবানদের পন্থা অনুসরণ করা) সেই বিষয়ে যত্নবান হওয়া।

আর এই মহান উদ্দেশ্য অর্জনের নির্ভুলতম পথ এবং বিশুদ্ধতম পন্থা হইল পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমগ্র মানব জাতির মহানতম নেতা আমাদের প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বিশুদ্ধ প্রমাণিত হাদীছ-এর শিক্ষা ও আদব গ্রহণ করা। তাঁহার প্রতি এবং সকল নবীর প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হউক।

আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করিয়াছেন–

و تعاونوا على البر و التقوى *

তোমরা পুণ্যকর্ম ও তাকওয়ার ব্যাপারে পরস্পর সহযোগিতা কর।

বিশুদ্ধ হাদীছে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

و الله فى عون العبد ما كان العبد فى عون اخيه *

বান্দা যতক্ষণ (তাহার অন্তর দ্বারা, শরীর দ্বারা, মাল দ্বারা কিংবা অন্য কোন উপায়ে) মুমিন ভাইয়ের সাহায্যে নিযুক্ত থাকে ততক্ষণ আল্লাহও বান্দার সাহায্যে নিযুক্ত থাকেন।

তিনি আরও বলিয়াছেন–

من دل على خير فله مثل اجر فاعله *

যে ব্যক্তি কোন নেক আমলের পথ প্রদর্শন করিবে সে ঐ নেক আমলকারীর মতই ছাওয়াব পাইবে।

তিনি আরও বলিয়াছেন–

من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجرهم شيئا *

যে ব্যক্তি কোন সৎকর্মের প্রতি আহ্বান করিবে সে ঐ সৎকর্ম অনুসরণকারীদের অনুরূপ ছাওয়াব লাভ করিবে তবে তাহাতে তাহাদের ছাওয়াব মোটেও কমিবে না।

হযরত আলী (রাঃ) -কে তিনি বলিয়াছেন–

فو الله لان يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم *

আল্লাহর কসম! তোমার দ্বারা আল্লাহ পাক একজন মানুষকেও হিদায়াত দান করা তোমার জন্য লাল উটের পাল হইতেও উত্তম।[১]

(উপরোল্লেখিত আয়াত ও হাদীছের কারণে) আমি বিশুদ্ধ হাদীছের একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন তৈয়ার করিবার চিন্তা করিয়াছি, যাহা পাঠকের জন্য আখিরাতের পথ (ও পাথেয়) রূপে সাব্যস্ত হইবে এবং যাহেরী আমল ও বাতেনী আমল[২] হাছিলের ক্ষেত্রে সহায়ক হইবে এবং তারগীব ও তারহীব[৩] উভয় প্রকার হাদীছ তাহাতে সংকলিত হইবে এবং আধ্যাত্মিক সাধকদের যাবতীয় গুণাবলী সংক্রান্ত হাদীছও (সংকলিত হইবে।) যথাঃ যুহদ (তথা দুনিয়ার প্রতি

১। আরবদের নিকট লাল উট শ্রেষ্ঠ ও মূল্যবানতম সম্পদ রূপে বিবেচিত। সেই হিসাবে ইহা বলা হইয়াছে; নচেৎ হিদায়াতের প্রতিদান ও লাল উটের মাঝে কোন তুলনাই চলে না। হাদীছের মতলব হইল, তোমার দ্বারা একজন মানুষের হিদায়াত লাভ করা তোমার জন্য দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হইতেও উত্তম।

২। যাহেরী আমল অর্থ যেই সমস্ত আমলের সম্পর্ক মানুষের বাহিরের অংগ প্রত্যংগের সহিত। যেমন রোযা, নামায ইত্যাদি। পক্ষান্তরে বাতেনী আমল অর্থ যেই সমস্ত আমলের সম্পর্ক অন্তর ও চিন্তার সহিত। যেমন ইখলাছ, আল্লাহপ্রেম, আল্লাহভীতি ইত্যাদি।

৩। নেক আমলে উৎসাহ দানকারী হাদীছ এবং মন্দ আমলের ব্যাপারে সতর্ককারী হাদীছ।

নিরাসক্তি)-মূলক হাদীছ। আত্মসংশোধন ও চরিত্র সংশোধনমূলক হাদীছ। হৃদয়ের পবিত্রতা ও চিকিৎসাবিষয়ক হাদীছ এবং অংগ প্রত্যংগকে (আল্লাহর নাফরমানী হইতে) রক্ষাকারী হাদীছ এবং মা'রিফাত ও অন্তর্জ্ঞানের অধিকারীদের কাম্য অন্যান্য গুণাবলীবিষয়ক হাদীছ (তাহাতে সংকলিত হইবে।)

এই সংকলনে আমি বিশুদ্ধ ও সহজবোধ্য হাদীছই শুধু প্রসিদ্ধ ও ছহী কিতাবের হাওয়ালাসহ উল্লেখ করিব এবং অধ্যায়গুলি কোরআন শরীফের আয়াত দ্বারা শুরু করিব। প্রয়োজনীয় শব্দ বিশ্লেষণ, অস্পষ্ট অর্থের ব্যাখ্যা প্রদান এবং উত্তম জ্ঞাতব্য বিষয়াদিও উল্লেখ করিব।

কোন হাদীছের শেষে যদি متفق عليه (বা সম্মিলিত) কথাটা উল্লেখ করি তবে ইহার অর্থ এই যে, হাদীছটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রহঃ) উভয়ে বর্ণনা করিয়াছেন।

সংকলনটি যদি সুসম্পন্ন হয় তবে আশা করি যে, উহা তাহার প্রতি যত্নশীল ব্যক্তিকে কল্যাণের পথে টানিয়া নিবে এবং সর্বপ্রকার ধ্বংসাত্মক ও নিকৃষ্ট কাজ হইতে বাধা দিয়া রাখিবে।

যে কোন ভাই এই সংকলন দ্বারা সামান্যও উপকৃত হইবেন তাহার নিকট আমার প্রার্থনা এই যে, তিনি যেন আমার জন্য, আমার আম্মা-আব্বার জন্য, আমার শায়খদের জন্য, সকল বন্ধু বান্ধবের জন্য এবং সমস্ত মুসলমানের জন্য দু'আ করেন।

মহান আল্লাহর উপরই আমি ভরসা করি এবং তাঁহার সমীপেই নিজেকে সমর্পণ করি। আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম ব্যবস্থাপক। মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ ছাড়া কাহারও কোন শক্তি ও ক্ষমতা নাই।

بسم الله الرحمن الرحيم

অধ্যায় – ১

ইখলাছ ও বিশুদ্ধ নিয়ত

সকল কাজে ও কথায় এবং প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সর্বাবস্থায় ইখলাছ ও বিশুদ্ধ নিয়তের প্রয়োজনীয়তা

আয়াতসমূহ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَ مَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ * حُنَفَاءَ وَ يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ، وَ يُؤْتُوا الزَّكٰوةَ، وَ ذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ *

তাহাদিগকে এই হুকুমই শুধু করা হইয়াছে যে, তাহারা আল্লাহর জন্য দ্বীনকে খালিছ করিয়া আল্লাহর ইবাদত কবিবে এবং নামায কায়েম করিবে [১] এবং যাকাত আদায় করিবে। আর ইহাই সঠিক দ্বীন।

আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন–

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَ لٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ *

আল্লাহর নিকট উহাদের (অর্থাৎ কোরবানীর) গোশত কিংবা উহাদের রক্ত কিছুই পৌঁছিবে না। তবে তাঁহার কাছে পৌঁছিবে শুধু তোমাদের তাকওয়া (ও আল্লাহভীতি)

আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন–

قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِى صُدُوْرِكُمْ أَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ *

আপনি বলিয়া দিন, তোমরা তোমাদের মনের কোন বিষয় প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর আল্লাহ তাহা জানেন।

ফায়দা ঃ

প্রথম আয়াতে ইহুদী ও নাছারাদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, তাওরাত ও ইঞ্জীল কিতাবে তাহাদের প্রতি এই নির্দেশই ছিল যে, তাহারা আল্লাহর ইবাদত করিবে এবং দ্বীনকে তাঁহার জন্য খালিছ করিবে অর্থাৎ অন্য কাহারও ইবাদত করিবে না। অন্য কাহাকেও শরীক করিবে না। এমন কি অন্য কাহাকেও সন্তুষ্ট করিবারও নিয়ত করিবে না বরং অন্য সকল ধর্ম হইতে মুখ ফিরাইয়া শুধু দ্বীন ইসলামের প্রতি অবিচল থাকিবে এবং নামায কায়েম করিবে ও যাকাত প্রদান করিবে

১। অর্থাৎ যত্নের সহিত সমস্ত হক আদায় করিয়া পড়িবে এবং অন্যকেও নামাযের দাওয়াত দিবে।

وَ ذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ অর্থাৎ এই সকল বিধান শুধু তাহাদেরই বৈশিষ্ট্য নহে। বরং দ্বীনে হক মাত্রেরই ইহা বৈশিষ্ট্য।

এই কারণেই কোরআন পাকেও হুবহু ঐ সকল আহকাম নাযিল হইয়াছে যাহা পূর্ববর্তীগণের কিতাবে তাহাদের প্রতি নাযিল হইয়াছে। সুতরাং কোরআনের বাণী অস্বীকার করিবার অর্থ নিজেদের কিতাবকেও অস্বীকার করা।

আয়াতের মর্মবাণী এই যে, সর্বযুগেই মানব জাতির প্রতি আল্লাহ্‌র ইবাদত করিবার নির্দেশ ছিল। আর এই ইবাদত তখনই শুধু গ্রহণযোগ্য হইবে যখন শুধু আল্লাহকে সন্তুষ্ট করাই নিয়ত হইবে। বস্তুতঃ নিয়তের ইখলাছই হইল যাবতীয় আমলের রূহ বা প্রাণ। ইহা ছাড়া আমলের কোনই মূল্য নাই। বরং উহা ধ্বংস ও বরবাদির কারণ হইবে।

দ্বিতীয় আয়াত সম্পর্কে আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, জাহেলিয়াতের যুগে মানুষ জবেহকৃত পশুর রক্ত বাইতুল্লাহর দেওয়ালে লেপিয়া দিত (এবং মনে করিত যে, আল্লাহ এই রক্ত গ্রহণ করিবেন) তাহাদের অনুসরণে মুসলমানরাও এইরূপ করিতে চাহিল। তখন এই আয়াত নাযিল হইল।

আয়াতের মর্মবাণী এই যে, আল্লাহ চিরমুখাপেক্ষাহীন। এই সমস্ত নেয়ামত তোমরাই ভোগ করিবে। আল্লাহর তাহাতে বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নাই। তবে তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করিয়া এবং শুধু তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া এই আমল করিয়া থাক তবে উহা আল্লাহর নিকট পৌঁছিবে। অর্থাৎ আল্লাহ খুশী হইয়া তোমাদের আমল গ্রহণ করিবেন।এবং প্রতিদান দিবেন। এই আয়াত হইতেও বোঝা গেল যে, নিয়তের বিশুদ্ধতাই আমল মকবুল হওয়ার শর্ত।

তৃতীয় আয়াতে মুমিনদিগকে সতর্ক করা হইয়াছে যে, কেহ যেন এই ধোকায় না পড়ে যে, অন্তরের বিষয় তো লুক্কায়িত, সুতরাং ইহা কাহারো জানিবার উপায় নাই। ইহা শয়তানি ধোকা। কেননা মানুষের বেলায় ইহা সত্য হইলেও আল্লাহর ক্ষেত্রে ইহা মিথ্যা। আল্লাহ তো এমন যে, তোমরা যাহা মুখে প্রকাশ কর উহা যেমন তিনি জানেন, তদ্রূপ যাহা অন্তরের অন্তস্থলে গোপন রাখ উহাও তিনি জানেন। অন্য আয়াতে আছে–

وَ اَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ *

তোমরা তোমাদের কথা গোপন কর কিংবা প্রকাশ কর; তাহাতে কিছুই যায় আসে না। কেননা আল্লাহ সকলের অন্তরের যাবতীয় বিষয় অবগত।

অন্য আয়াতে আল্লাহ প্রশ্নের আকারে আরো তাকীদ ও জোর দিয়া বলিতেছেন–

اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ *

তিনিই কি জানিবেন না যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, অথচ তিনি সূক্ষ্ম জ্ঞানী, সর্বজ্ঞ?

মোট কথা, প্রথম দুই আয়াতে ঘোষণা করা হইল যে, আল্লাহর ইবাদতই মানুষের একমাত্র কর্তব্য। আর এই ইবাদত নিয়তের বিশুদ্ধতা তথা ইখলাছ ও তাকওয়া ছাড়া কবুল হইবে না। আর এই আয়াতে ঘোষণা করা হইল যে, কাহার অন্তরের নিয়তের কি অবস্থা তাহা অবশ্যই আল্লাহ জানেন। সুতরাং অন্তরকে অতিঅবশ্যই রিয়া হইতে পাক ছাফ করিতে হইবে এবং নিয়তকে ছহী করিয়া লইতে হইবে।

হাদীছসমূহ

১। আমলের মাপকাঠি নিয়ত।

١ - وَعَنْ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَبِيْ حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلِ بْنِ عَبْدِ الْعُزّٰى بْنِ رِيَاحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُرْطِ بْنِ رَزَاحِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ الْقُرَشِيِّ الْعَدَوِيِّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ، وَاِنَّمَا لِكُلِّ امْرِىءٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهٖ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهٖ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيْبُهَا، اَوِ امْرَاَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلٰى صِحَّتِهٖ . رَوَاهُ اِمَامَا الْمُحَدِّثِيْنَ اَبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ بَرْدِزْبَه الْجُعْفِيُّ الْبُخَارِيُّ، وَاَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنُ مُسْلِمٍ الْقُشَيْرِيُّ النَّيْسَابُوْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِيْ صَحِيْحَيْهِمَا اللَّذَيْنِ هُمَا اَصَحُّ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ.

আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, সমস্ত আমল (এর গ্রহণযোগ্যতা) নিয়তের (বিশুদ্ধতার) উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক মানুষ যেমন নিয়ত করিবে তেমনই পাইবে। সুতরাং যেই ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের সন্তুষ্টি (লাভের) উদ্দেশ্যে হিজরত করিবে তাহার হিজরত আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের জন্যই হইবে। আর যে দুনিয়া হাছিল করিবার কিংবা কোন নারীকে বিবাহ করিবার উদ্দেশ্যে হিজরত করিবে তাহার হিজরত ঐ জন্যই হইবে যেই জন্য সে দেশ ত্যাগ করিয়াছে। (অর্থাৎ তাহার হিজরত অতি নিকৃষ্ট। কেননা ইহার সহিত আল্লাহর কোন সম্পর্ক নাই। সুতরাং আখিরাতে তাহার কোন হিসসা নাই) (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফাযদা ঃ

কোন কোন আমল নিয়ত ছাড়া শুদ্ধই হয় না, ছাওয়াব পাঁওয়া তো দূরের কথা। যেমন নামায, রোযা। কোন কোন আমল নিয়ত ছাড়া শুদ্ধ তো হইয়া যায় তবে উহার ছাওয়াব ও ফযীলত হাছিল হয় না। যেমন অযু। নিয়ত ছাড়া অযু করিলেও অযু হইয়া যাইবে এবং উহা দ্বারা নামায পড়া জায়েয হইবে। তবে হাদীছ শরীফে অযুর যেই সমস্ত ফযীলত বর্ণিত আছে ঐগুলি হাছিলের নিয়ত না করিলে উহা হাছিল হইবে না। তদ্রূপ মদপান, ব্যভিচার ও হারাম কাজ হইতে শুধু বিরত থাকিবার দ্বারা গোনাহ্ হইতে তো বাঁচিয়া যাইবে। কিন্তু আলাদা কোন ছাওয়াব হইবে না। কিন্তু যদি আল্লাহর নিষেধ মনে করিয়া আল্লাহকে সন্তুষ্ট করিবার নিয়তে বিরত থাকে তবে ছাওয়াবও হইবে। পক্ষান্তরে যদি মানুষকে খুশী করিবার জন্য বা সুনাম অর্জনের জন্য নেক আমল করে বা বদ আমল হইতে বিরত থাকে তবে ছাওয়াবের পরিবর্তে উল্টা গোনাহ হইবে। ইহাকে রিয়া বলে।

সুতরাং প্রথমে রিয়া হইতে বাঁচিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ইহার উপায় হইল, সর্বদা চিন্তা করিবে যে, যাহাকে দেখাইতে চাহিতেছি সে দেখিতেছে কি না জানা নাই। দেখিলেও আমাকে

ভাল বলিতেছে কি না জানা নাই। আর ভাল বলিলেও আমার কোন লাভ নাই। কারণ সেও আমার মতই মরণশীল মানুষ। কিছুদিন পর হয়ত আমার কথা বা আমার আমলের কথা তাহার মনেও থাকিবে না। কিংবা যদি কেহ খুশী হইয়া আমাকে দুনিয়ার তুচ্ছ কিছু দান করে তবে উহা তো ক্ষণস্থায়ী। অচিরেই শেষ হইয়া যাইবে। হয় সম্পদ আমার হাতছাড়া হইবে কিংবা আমি কবরে চলিয়া যাইব। মোটকথা, মানুষকে দেখাইবার জন্য নেক আমল করা ক্ষতি ও বরবাদি ছাড়া কিছুই নহে।

পক্ষান্তরে যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, বিশ্বজগত সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি আমাকে ভালবাসেন। তিনি আমার নেক আমল দেখিতে চাহিতেছেন। আমি যদি তাঁহাকে দেখাইবার জন্য এবং তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার নিয়তে আমল করি তবে তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন এবং সামান্য আমলেও বিরাট বিরাট প্রতিদান দিবেন। তাঁহার দান কোনদিন শেষ হইবে না। নষ্ট হইবে না। অনন্তকাল ভোগ করা যাইবে। আর কোন কিছুই তাঁহার অগোচরে নাই। দিনের আলোতে, রাত্রের অন্ধকারে যখনই যেখানে যে আমলই করি না কেন তিনি তাহা জানেন। এমন কি আমাদের মনের গোপন খবরও তাঁহার অজানা নাই।

দ্বিতীয়তঃ যে কোন আমল করিব আল্লাহর হুকুম মনে করিয়া তাঁহাকে রাজী খুশী করিবার নিয়তে করিব। হযরত মাওলানা মোহাম্মদ ইলয়াছ (রহঃ) বলিয়াছেন, আফসোসের বিষয় এই যে, একে তো আমরা নেক আমল খুব কম করি, তদুপরি যাহা করি তাহা গাফলতের সহিত করি, নিয়ত ছাড়া করি। ফলে আমলের ছাওয়াব ও ফযীলত হইতে মাহরূম ও বঞ্চিত হই।

অবশ্য ইমাম গায্যালী (রহঃ) লিখিয়াছেন যে, মুখের যিকির (ও তিলাওয়াত) গাফলতের সহিত হইলেও কিছু না কিছু ছাওয়াব পাওয়া যাইবে। একেবারে মাহরূম হইবে না।

আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে ছহী নিয়তসহ আমল করিবার তাওফীক দান করুন। আমীন।

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে সাধারণ মূলনীতি বর্ণনা করিয়াছেন যে, সমস্ত আমলের ভিত্তি হইল নিয়ত। মানুষ যেমন নিয়ত করিবে তেমনই প্রতিদান পাইবে। অতঃপর বিষয়টিকে পরিষ্কার করিবার জন্য তিনি এমন একটি ব্যাপকতাপূর্ণ উদাহরণ দিয়াছেন যাহাতে আদেশ ও নিষেধ জাতীয় সকল আমলই অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। আর হিজরতই হইল সেই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কেননা আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তু হইতে বিরত থাকা হিজরতেরই অন্তর্ভুক্ত। এই জন্য হাদীছ শরীফে আসিয়াছে–

المهاجر من هجر ما نهى الله عنه *

সেই প্রকৃত হিজরতকারী যে আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তু হইতে হিজরত করে (বিরত থাকে)।

তদ্রূপ আল্লাহর আদেশ সমূহ পালনের ক্ষেত্রে মনের ইচ্ছা ও নফসের খাহেশ ত্যাগ করিতে হয়। সুতরাং ইহাও হিজরত হইল। এইভাবে আদেশ ও নিষেধবাচক যাবতীয় আহকাম হিজরতের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল।

হিজরত শব্দের আভিধানিক অর্থ হইল ত্যাগ ও বর্জন। শরীয়তের পরিভাষায় হিজরত অর্থ দারুল কুফর ত্যাগ করিয়া দারুল ইসলামে গমন; যাহাতে আল্লাহর আদেশ নিষেধ নির্বিঘ্নে

পালন করা যায় এবং দ্বীন ঈমান রক্ষা পায়। ছাহাবা কেরাম যে পরিস্থিতিতে হিজরত করিয়াছেন তেমন পরিস্থিতি যে কোন যুগে যে কোন স্থানে দেখা দিবে তখন সেখান হইতে হিজরত করা ওয়াজিব বা অবশ্যকর্তব্য হইবে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, لا هجرة بعد الفتح (মক্কা বিজয়ের পরে আর কোন হিজরত নাই।) এই হাদীছের কি অর্থ? উত্তর এই যে, ইহার অর্থ হইল, মক্কা বিজয়ের পরে মক্কা হইতে হিজরত করিবার কোন যৌক্তিকতা নাই। কেননা পূর্বে ইহা দারুল কুফর ছিল কিন্তু এখন বিজয়ের মাধ্যমে দারুল ইসলাম হইয়া গিয়াছে।

স্ত্রীলোককে বিবাহ করিবার প্রসংগ এই জন্য আসিয়াছে যে, একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া হাদীছটি বর্ণিত হইয়াছিল। সেই ঘটনার দিকেই এখানে ইংগিত করা হইয়াছে। তাবরানীতে নির্ভরযোগ্য সনদে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন—

আমাদের মধ্য হইতে একজন লোক উম্মে কায়স নাম্নী জনৈকা স্ত্রীলোককে বিবাহের পয়গাম দিয়াছিল। উম্মে কায়স তখন শর্ত আরোপ করিল যে, তুমি যদি হিজরত কর তবেই আমি বিবাহে সম্মত হইব। লোকটি শর্ত মত হিজরত করিয়া উম্মে কায়সকে বিবাহ করিয়াছিল। এই জন্য আমরা তাহাকে 'উম্মে কায়সের জন্য হিজরতকারী' বলিতাম।

মৌলিক বিষয়ের পর বিশেষভাবে স্ত্রীলোকের প্রসংগ উত্থাপনের আরেকটি উদ্দেশ্য হইল এই বিষয়ে সতর্ক করা যে, উম্মতে মুহাম্মদিয়ার জন্য 'নারী' একটি ভয়ংকর ফিতনা। যেমন হাদীছ শরীফে আসিয়াছে—

ما تركت بعدى فتنه اضر على الرجال من النسآء *

আমার পরে পুরুষলোকদের জন্য স্ত্রীলোকদের চাইতে বড় কোন ফিতনা আমি রাখিয়া যাই নাই। সুতরাং স্ত্রীলোকের ফিতনা হইতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। ইহার প্রথম উপায় হইল সর্বদা দৃষ্টিকে অবনত রাখা। যেমন আল্লাহ পাক বলিয়াছেন—

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِن اَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوْجَهُمْ *

আপনি মুমিনদিগকে বলুন, তাহারা যেন আপন দৃষ্টি অবনত রাখে এবং আপন লজ্জাস্থান হিফাযত করে। দ্বিতীয় উপায় হইল সামর্থ্য থাকিলে বিবাহ করা আর সামর্থ্য না থাকিলে রোযা রাখা। কেননা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন—

يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر و احصن للفرج و من لم يستطع فعليه الصوم فانه له وجاء *

হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের ব্যয় নির্বাহ করিতে পারে সে যেন বিবাহ করিয়া লয়। কেননা তাহা দৃষ্টি অবনত রাখিতে অধিক সহায়ক এবং লজ্জাস্থানের হিফাযতে অধিক সক্ষম। আর যে তাহা না পারে সে যেন রোযা আঁকড়াইয়া ধরে। কেননা উহাতে তাহার কামশক্তি দমনের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

তৃতীয়তঃ কখনো যদি পর-নারীর প্রতি দৃষ্টি পড়িয়া যায় সংগে সংগে নযর নীচু করিয়া ফেলিবে এবং এই দু'আ পড়িবে—

اللهم انى اعوذ بك من فتنة النساء *

নিয়ত আরবী শব্দ। ইহার অর্থ কোন উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কোন কাজ বাস্তবে রূপ দানের দৃঢ় ইচ্ছা। আমলের ক্ষেত্রে নিয়তের বিভিন্ন স্তর রহিয়াছে। যেমন আওয়াম বা সাধারণ মানুষের নিয়ত হইল আল্লাহর দান ও দয়া স্মরণ না করিয়া শুধু প্রতিদান পাইবার নিয়ত করা। জাহিল ও মুর্খের নিয়ত হইল মন্দ পরিণতি ও বালা-মুছীবত হইতে রক্ষা পাইবার নিয়ত করা। মুনাফিকের নিয়ত হইল আল্লাহ ও মানুষের সামনে ভাল সাজিয়া থাকা। ওলামায়ে কেরামের নিয়ত হইল আদেশ পালন করা। আদেশের মর্যাদার কারণে নহে, বরং আদেশদাতার মর্যাদার কারণে। সাধকগণের নিয়ত হইল নিজেদের আমলের উপর ভরসা ত্যাগ করা। আর আহলে হাকীকত ও তত্ত্বজ্ঞানীগণের নিয়ত হইল আল্লাহর রাবূবিয়ত ও নিজেদের আবদিয়ত স্মরণ করা।

বর্ণিত হাদীছটির বিশুদ্ধতা সর্বসম্মত। হাদীছটি মুহাদ্দিছগণের দুই ইমামশিরোমণি আবু আব্দুল্লাহ মুহম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী (রহঃ) এবং আবুল হোসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (রহঃ) স্ব-স্ব গ্রন্থে সংকলন করিয়াছেন, যাহা মানব সংকলিত গ্রন্থসমূহের মাঝে বিশুদ্ধতম গ্রন্থরূপে স্বীকৃত।

২। স্ব-স্ব নিয়তের উপর মানুষের হাশর হইবে—

وَعَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ أُمِّ عَبْدِ اللهِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ:
«يَغْزُوْ جَيْشٌ الْكَعْبَةَ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ». قَالَتْ: قُلْتُ:
يَا رَسُوْلَ اللهِ، كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيْهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ!؟ قَالَ:
«يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، ثُمَّ يُبْعَثُوْنَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . هٰذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ.

উম্মুল মুমিনীন উম্মে আব্দুল্লাহ হযরত 'আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন—

এক লশকর কাবা (শরীফের) উপর হামলা চালাইবে। যখন তাহারা নির্জন মরুভূমিতে উপস্থিত হইবে তখন লশকরের অগ্রবর্তী ও পশ্চাদ্বর্তী সকলকেই ভূমিতে ধ্বসাইয়া দেওয়া হইবে। (হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন) আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহাদের অগ্রবর্তী ও পশ্চাদ্বর্তী সকলকে কিভাবে ধ্বসাইয়া দেওয়া হইবে। অথচ তাহাদের মধ্যে বাজারের লোকেরাও থাকিবে। (যাহারা শুধু জিনিসপত্র বিক্রি করিবার উদ্দেশ্যে বাহিনীর পিছনে পিছনে আসিয়া থাকে) এবং এমন লোকও থাকিবে যাহারা হামলাকারীদের দলভুক্ত নহে। (শুধু পথিমধ্যে তাহাদের সংগে মিশিয়া গিয়াছিল)? তিনি বলিলেন, তাহাদের অগ্রবর্তী ও পশ্চাদ্বর্তী সকলকেই ধ্বসাইয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর তাহারা নিজ নিজ নিয়ত অনুযায়ী পুনরুত্থিত হইবে (এবং হিসাব কিতাবের সময় তাহাদের সহিত তাহাদের নিয়তের অনুরূপ আচরণ করা হইবে।) (বুখারী ও মুসলিম শরীফ) তবে শব্দাবলী শুধু বুখারী শরীফ হইতে লওয়া হইয়াছে।

ফায়দা ঃ

মুসলিম শরীফের বর্ণনায় হাদীছটি এইভাবে আসিয়াছে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন,

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একবার) ঘুমের মাঝে অদ্ভূত আচরণ করিলেন। তখন আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, (আজ) আপনি এমন কিছু আচরণ করিয়াছেন যাহা কখনও করিতেন না। তিনি বলিলেন, আশ্চর্যের বিষয় যে, আমার উম্মতের একদল লোক বাইতুল্লায় আশ্রয় গ্রহণকারী কোরাইশের এক লোককে পাকড়াও করিবার জন্য বাইতুল্লাহ অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করিবে।

প্রশ্ন হয় যে, হানাদার বাহিনীর অগ্রবর্তী ও পশ্চাদ্‌বর্তী লোকদের অবস্থা তো জানা গেল কিন্তু মধ্যবর্তী লোকদের অবস্থা কি হইবে? মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় এই রূপ আছে–

يخسف باوسطهم ثم ينادى اولهم آخرهم ثم يخسف بهم فلا يبقى الا الشريد الذى يخبر عنهم *

(প্রথমে) মধ্যবর্তীদিগকে ধ্বসাইয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর তাহাদের অগ্রবর্তী অংশটি পশ্চাদ্‌বর্তী অংশকে ডাক দিবে। অতঃপর তাহাদের সকলকে ধ্বসাইয় দেওয়া হইবে। কেহই বাঁচিবে না। শুধু দলছুট দুই একজন ছাড়া যাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকদের কাহিনী শুনাইবে।

এই হাদীছ হইতে বোঝা গেল যে, কোন জনপদে নাফরমানী ও পাপাচার ব্যাপক হইয়া গেলে ব্যাপক আযাব নাযিল হয় এবং একত্রে বসবাসের কারণে নির্দোষীরাও দুনিয়ার আযাব হইতে রক্ষা পায় না। সুতরাং একান্ত অনন্যোপায় না হইলে পাপাচারের স্থানে থাকিতে নাই এবং জালিম ও নাফরমানদের সহিত উঠা-বসা করিতে নাই।

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা দাওয়াত ও তাবলীগের অপরিহার্যতাও সুপ্রমাণিত। কেননা কোন জনপদে যখন ব্যাপকভাবে আল্লাহর নাফরমানি শুরু হইয়া যায় তখন ব্যক্তিগত পর্যায়ে দ্বীন রক্ষা করা সম্ভব হয় না। আর সম্ভব হইলেও আল্লাহর আম আযাব হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না। সুতরাং আপন দ্বীন ও দ্বীনদারী রক্ষা করিতে হইলে এবং আম আযাব হইতে রেহাই পাইতে হইলে সাধ্যমত আমর বিল মারূফ ওয়া নাহী আনিল মুনকারের দায়িত্ব পালন করিতে হইবে এবং উহা ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং জামা'আতগত পর্যায়ে করিতে হইবে। এক মশহুর হাদীছে কুদসীতে আছে– আল্লাহ জিবরীল আলাইহিসসালামকে আদেশ করিলেন, অমুক জনপদকে উল্টাইয়া দাও। তখন হযরত জিবরীল (আঃ) আরয করিলেন। হে রব! তাহাদের মাঝে তো তোমার অমুক বান্দা আছে যে চোখের পলকের জন্য তোমার নাফরমানি করে নাই। আল্লাহ বলিলেন, তাহার ও তাহাদের সকলের উপরই জনপদকে উল্টাইয়া দাও। কেননা আমার জন্য তাহার মুখমণ্ডল কখনো বিমর্ষ হয় নাই। (অর্থাৎ তাহার চোখের সামনে আমার নাফরমানি হওয়া সত্ত্বেও সে নির্লিপ্ত ছিল।)

হাদীছের শিক্ষা ঃ নাফরমান ও জালিমদের সহিত উঠা-বসা করিলে আম আযাবে গ্রেফতার হইবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং তাহাদের সাহচর্য পরিত্যাগ করা উচিত।

৩। নিয়ত ও জিহাদের ছাওয়াব কিয়ামত পর্যন্ত চলিবে

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ، وَاِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَمَعْنَاهُ: لَا هِجْرَةَ مِنْ مَكَّةَ لِاَنَّهَا صَارَتْ دَارَ اِسْلَامٍ

হযরত "আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, (মক্কা) বিজয়ের পর (মক্কা হইতে) হিজরতের প্রয়োজন নাই। তবে নিয়ত ও জিহাদ অব্যাহত থাকিবে। সুতরাং যখনই তোমাদিগকে জিহাদের জন্য আহ্বান করা হইবে তখনই তোমরা অভিযাত্রা করিবে। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

হাদীছের অর্থ হইল এখন আর মক্কা হইতে হিজরতের অবকাশ নাই। কেননা উহা দারুল ইসলাম বা মুসলমানদের আবাসভূমি হইয়া গিয়াছে।

ফায়দা ঃ

হাদীছটির ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কেরাম বলিয়াছেন, নবুয়ত যুগে দুই কারণে হিজরত আবশ্যক ছিল। প্রথমতঃ নিজের দ্বীন ঈমান রক্ষা করা এবং স্বজাতির নির্যাতন হইতে রক্ষা পাওয়া।

দ্বিতীয়তঃ মদীনার অল্পসংখ্যক মুসলমানের শক্তিবৃদ্ধির জন্য মক্কা হইতে মদীনায় হিজরত করা। মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে যেহেতু উভয় কারণ বিদূরিত হইয়াছে সেহেতু এখন আর মক্কা হইতে হিজরতের অবকাশ নাই।

তবে ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত মত এই যে, কোন স্থানে যদি দ্বীনের উপর কায়েম থাকা সম্ভব না হয় তবে সেখান হইতে নিরাপদ স্থানে হিজরত করা অবশ্য কর্তব্য। এই জন্যই হাদীছ শরীফে আসিয়াছে–

لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار *

কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই যতদিন চলিবে ততদিন হিজরত বন্ধ হইবে না।

আল্লামা নববী (রহঃ) বলেন, হিজরত অতি ফযীলতপূর্ণ এক আমল। মক্কা বিজয়ের কারণে উহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখানে হিজরত না করিয়াও হিজরতের ফযীলত হাছিল করিবার সহজ পন্থা বলা হইয়াছে যে, তোমরা সকলেই নিজ নিজ দেশে অবস্থান কর। তবে এই নিয়ত রাখিও যে, প্রয়োজন হইলে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের জন্য জন্মভূমি ছাড়িয়া হিজরত করিব। তদ্রূপ জিহাদের আহ্বান আসিলে (কিংবা ইলম অর্জনের প্রয়োজনে) দেশ ত্যাগ করিব। এই নিয়তের বরকতে হিজরতের ফযীলত হাছিল হইয়া যাইবে।

আলোচ্য হাদীছে জিহাদের প্রতি মুসলমানদিগকে উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে। এক হাদীছে আসিয়াছে–

الجهاد ماض الى يوم القيامة *

অর্থাৎ কেয়ামত পর্যন্ত জিহাদ চলিবে।

ইহা ছাড়া বহু হাদীছে জিহাদের অসংখ্য ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ যেই দিন উম্মতের হাত হইতে জিহাদের আমল ছুটিয়া গিয়াছে তখন হইতেই তাহাদের যিল্লতি এবং কাফিরদের হাতে মার খাওয়া শুরু হইয়াছে। মৃত্যুর ভয় এবং জীবনের প্রতি মুহব্বতই হইল জিহাদের প্রতি অনিহার কারণ।

এখনও দেখা যায়, মুসলমানদের নানা রকম দুর্বলতা সত্ত্বেও যখনই তাহারা কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হয় তখন সংখ্যায় ও শক্তিতে বহুগুণ বেশী হইয়াও কাফিররা পর্যুদস্ত

হইয়া যায় এবং পৃথিবীর সমস্ত অমুসলমান জাতি এই অধঃপতনের যুগেও মুসলমানদের শৌর্যবীর্য দেখিয়া হতবাক হইয়া যায়। সুতরাং যখনই পৃথিবীর কোন স্থানে কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু হয় তখন সকল মুসলমানের অবশ্যকর্তব্য হইয়া পড়ে যথাসাধ্য উহাতে শরীক হওয়া এবং উহার জন্য সাধ্যমত পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করা।

হাদীছের শিক্ষা ঃ প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হইল প্রয়োজনের সময় হিজরত ও জিহাদ করিবার নিয়ত অন্তরে পোষন করা, যাহাতে হিজরত ও জিহাদের ছাওয়াব লাভ হইতে থাকে।

৪। নিয়ত হিসাবে আমলে শরীক থাকা

وَعَنْ اَبِيْ عَبْدِ اللهِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْاَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ غَزَاةٍ فَقَالَ: «اِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ لَرِجَالًا مَا سِرْتُمْ مَسِيْرًا، وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا اِلَّا كَانُوْا مَعَكُمْ حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ»، وَفِي رِوَايَةٍ: «اِلَّا شَرِكُوْكُمْ فِي الْاَجْرِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত কোন এক জিহাদে ছিলাম। তিনি বলিলেন, মদীনায় এমন কিছু লোক রহিয়া গিয়াছে যাহাদের অবস্থা এই যে, যত পথ তোমরা অতিক্রম করিয়াছ এবং যত উপত্যকা পার হইয়াছ, তাহারা তোমাদের সংগেই ছিল। অসুস্থতা তাহাদিগকে আটকাইয়া রাখিয়াছে।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "তাহারা আজর ও ছাওয়াবের ক্ষেত্রে তোমাদের (সমান) অংশীদার হইবে।" (মুসলিম শরীফ)

৫।

وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَجَعْنَا مِنْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «اِنَّ اَقْوَامًا خَلْفَنَا بِالْمَدِيْنَةِ مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلَا وَادِيًا اِلَّا وَهُمْ مَعَنَا، حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ».

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত তাবুক যুদ্ধ হইতে ফিরিতেছিলাম। তখন তিনি বলিলেন, কিছু লোককে আমরা মদীনায় ফেলিয়া আসিয়াছিলাম। (তাহাদের অবস্থা এই যে,) আমরা যত পাহাড়ী পথ বা উপত্যকা অতিক্রম করিয়াছি তাহারা আমাদের সংগেই ছিল। কোন ওযর তাহাদিগকে আটকাইয়া রাখিয়াছে। (বুখারী শরীফ)

ফায়দা ঃ

উভয় হাদীছ একই ঘটনা প্রসংগে বলা হইয়াছে। হযরত জাবির (রাঃ) তাবুক যুদ্ধের নাম উল্লেখ করেন নাই। পক্ষান্তরে হযরত আনাস (রাঃ) নামসহ বর্ণনা করিয়াছেন।

তাবুক সিরিয়া সীমান্তের একটি এলাকা। মদীনা হইতে উহার দূরত্ব প্রায় সাতশত কিলোমিটার। নবম হিজরীতে অনুষ্ঠিত তাবুকই ছিলো রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ গাযওয়া। রোম সম্রাট মদীনা আক্রমণের মতলবে সেনাবাহিনী প্রস্তুত করিতেছে–

এই সংবাদ পাইয়া রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক অভিযানে বাহির হইয়াছিলেন। তখন ছিল খুব গরম কাল এবং মদীনায় খেজুর পাকিবার মৌসুম। কিন্তু আল্লাহর রাসূলের পক্ষ হইতে জিহাদের আহ্বান আসিবামাত্র ছাহাবা কেরাম বাগানে পাকা খেজুর ফেলিয়া এবং মুরুভূমির ভয়ংকর গরম উপেক্ষা করিয়া তাবুক অভিযানে শামিল হইয়াছিলেন। এই অভিযানের খবর পাইয়া ভীত রোম সম্রাট মদীনা আক্রমণের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া সরিয়া পড়িয়াছিল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশ দিনের অধিক সময় তাবুকে অবস্থান করিয়া বিনা যুদ্ধে মদীনায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

(অসুস্থতা তাহাদিগকে আটকাইয়া রাখিয়াছে।) ইহা একটি অব্যক্ত প্রশ্নের উত্তর। কেননা জিহাদে শরীক না হইয়াও ছাওয়াবে শরীক হইবার খবর শুনিয়া ছাহাবা কেরামের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক ছিল। আবু দাউদ শরীফের বর্ণনায় অবশ্য প্রশ্নটি ব্যক্ত হইয়াছে। দেখুন–

قالوا يا رسول الله و كيف يكونون معنا و هم بالمدينة *

তাঁহারা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহারা তো মদীনায়। কিভাবে তাহারা আমাদের সহিত থাকিবে?

ইহার উত্তরে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ওযর তাহাদিগকে মজবুর করিয়াছিল। অর্থাৎ তাহাদের অন্তরে জিহাদে শরীক হইবার একান্ত আকাঙক্ষা ছিল। কিন্তু ওযরের কারণে শরীক হইতে পারে নাই। আর আল্লাহ তো বড় মেহেরবান। তিনি মানুষের মনের অবস্থার উপরও ছাওয়াব দিয়া থাকেন। সুতরাং তাহাদের নিয়তের বিশুদ্ধতার কারণে এবং জিহাদে শরীক হইতে না পারিবার মর্মজ্বালার কারণে আল্লাহ পাক তাহাদিগকে জিহাদে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারীর সমান আজর ও ছাওয়াব দান করিবেন।

شرح المصابيح কিতাবে আল্লামা 'আকুলী (রহঃ) বলেন, এই হাদীছ প্রমাণ করে যে, ওযরের কারণে জিহাদ হইতে পিছনে থাকা লোকেরা জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের সহিত ছাওয়াবে শরীক হইবে এবং সমপরিমাণেই শরীক হইবে। কেননা এক বর্ণনায় আছে و كان لهم مثل اجركم مضاعفا (তোমাদের মত বর্ধিত ছাওয়াবই তাহারা পাইবে।)

প্রশ্ন হইতে পারে যে, কোরআন শরীফে তো বলা হইয়াছে–

فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا *

উপবিষ্টদের উপর মুজাহিদগণকে বিরাট প্রতিদানের মাধ্যমে আল্লাহ শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন।

ইহাতে তো যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। ইহার উত্তর এই যে, আয়াতে ঐ সকল লোকদের কথা বলা হইয়াছে যাহারা কোন ওযর ছাড়া জিহাদ হইতে পিছাইয়া ছিল। কিংবা ওযরের কারণেই পিছাইয়া ছিল কিন্তু জিহাদে শরীক হইতে না পারিবার কারণে তেমন মর্মজ্বালা ছিল না। পক্ষান্তরে হাদীছে ঐ সকল লোকদের কথা বলা হইয়াছে যাহারা ওযরের কারণে পিছনে পড়িয়া ছিল এবং জিহাদে শরীক হইতে না পারিবার কারণে তাহাদের অন্তরে ভীষণ মর্মজ্বালা ছিল। সুতরাং আয়াত ও হাদীছের মাঝে কোন বৈপরীত্য নাই।

হাদীছের শিক্ষা ঃ ওযরের কারণে বা সামর্থ্যের অভাবের কারণে কোন নেক কাজে শরীক

হইতে না পারিলে অন্তরে আফসোস রাখা চাই। তখন আশা করা যায় যে, আল্লাহ পাক ছাওয়াবে শরীক রাখিবেন।

৬। পুত্রের হাতে গেলেও পিতা দানের ছাওয়াব হইতে বঞ্চিত হইবে না।

وَعَنْ اَبِيْ يَزِيْدَ مَعْنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ الْاَخْنَسِ ، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ ، وَهُوَ وَاَبُوْهُ وَجَدُّهُ صَحَابِيُّوْنَ ، قَالَ : كَانَ اَبِيْ يَزِيْدُ اَخْرَجَ دَنَانِيْرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ فَجِئْتُ فَاَخَذْتُهَا فَاَتَيْتُهُ بِهَا ، فَقَالَ : وَاللّٰهِ مَا اِيَّاكَ اَرَدْتُ ، فَخَاصَمْتُهُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : «لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيْدُ ، وَلَكَ مَا اَخَذْتَ يَا مَعْنُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

হযরত আবু ইয়াযীদ মা'আন বিন ইয়াযীদ বিন আখনাস (তিনি, তাঁহার আব্বা ও দাদা তিনজনই ছাহাবী ছিলেন) (রাঃ) বলেন, আমার আব্বা ছাদাকা করিবার জন্য কয়েকটি দীনার বাহির করিয়া মসজিদে এক ব্যক্তির নিকট রাখিলেন। আমি মসজিদে গিয়া উহা নিয়া নিলাম এবং ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। আমার আব্বা বলিলেন, আল্লাহর কসম, তোমাকে দিবার নিয়ত আমার ছিল না। তখন আমি তাঁহার নামে নালিশ লইয়া রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির হইলাম। তিনি বলিলেন, হে ইয়াযিদ! তুমি যাহা নিয়ত করিয়াছ তাহার ছাওয়াব তুমি পাইবে। আর হে মা'আন! তুমি যাহা লইয়াছ তাহা তোমার হইয়া গিয়াছে। (বুখারী শরীফ)

ফায়দা ঃ

হযরত মা'আন, তাঁহার আব্বা ও দাদা ইহারা তিনজনই ছাহাবী ছিলেন এবং বদর যুদ্ধে শরীক ছিলেন, আল্লামা কিরমানী (রহঃ) বলেন, এই মহাসৌভাগ্য অন্য কোন ছাহাবী পরিবারের ছিল না।

বাহ্যতঃ ইহাই মনে হয় যে, উহা নফল ছাদাকা ছিল। দীনারগুলি তিনি মসজিদে একজন লোকের হাতে দিয়া বলিয়াছিলেন, অভাবী কোন লোককে দান করিয়া দিও। হযরত মা'আন লোকটির নিকট গিয়া দান রূপে উহা গ্রহণ করিলেন। কেননা তিনিও অভাবী ছিলেন। হযরত ইয়াযীদ ইহা জানিতে পারিয়া ভাবিলেন, দীনারগুলি পুত্রের হাতে যাওয়ায় দানের ছাওয়াব তাঁহার হইবে না। এই জন্য ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত গড়াইয়াছিল। আর এই নববী ফায়সালার কারণ এই যে, পুত্রের নিয়ত না করিলেও তিনি তো অভাবী লোককেই দান করিবার নিয়ত করিয়াছিলেন। আর উহা অভাবী লোকের হাতেই গিয়াছে। তদ্রূপ পুত্রও উহা শরীয়তসম্মত উপায়ে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই ধরনেরই একটি ঘটনা হযরত মুহম্মদ বিন মুনকদির (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন—

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ *

কিছুতেই তোমরা পুণ্যলাভ করিতে পারিবে না যদি না তোমরা আল্লাহর রাস্তায় তোমাদের প্রিয় বস্তু খরচ না কর।

এই আয়াত যখন নাযিল হইল তখন হযরত যায়দ বিন হারিছা (রাঃ)-এর নিকট একটি ঘোড়া ছিল। ঐ ঘোড়া সকল সম্পদের মাঝে তাঁহার প্রিয়তম ছিল। তিনি ঐ ঘোড়া লইয়া হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির হইলেন এবং উহা আল্লাহর রাস্তায় ছাদাকা করিলেন। হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা কবুল করিলেন। অতঃপর হযরত যায়দের পুত্র হযরত উসামা (রাঃ)-কে দান করিলেন। এই কারণে হযরত যায়দ (রাঃ)-এর চেহারায় অখুশির ভাব দেখা গেল। কেননা ঘরের জিনিস ঘরেই ফিরিয়া আসিল। শুধু পিতার স্থলে পুত্রের হইল। হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলিলেন, আল্লাহ তোমার ছাদাকা কবুল করিয়াছেন। অর্থাৎ তোমার ছাদাকা আদায় হইয়া গিয়াছে। এখন আমি উহা যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই দান করিতে পারি। তোমার পুত্রকে দিতে পারি। তদ্রূপ তোমার অন্য কোন আত্মীয়কেও দান করিতে পারি কিংবা অপরিচিত কাহাকেও দান করিতে পারি। তুমি নিজে তো আর তোমার পুত্রকে দিতেছ না যাহাতে দানের ফযীলত নষ্ট হইবার কোন আশংকা থাকিতে পারে।

৭। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য স্ত্রীর মুখে খাবার তুলিয়া দেওয়াও ইবাদত

وَعَنْ اَبِي اِسْحَاقَ سَعْدِ بْنِ اَبِي وَقَّاصٍ مَالِكِ بْنِ اُهَيْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ ابْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُوَيِّ الْقُرَشِيِّ الزُّهْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، اَحَدِ الْعَشَرَةِ الْمَشْهُوْدِ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ، قَالَ: «جَاءَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِى فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى، وَاَنَا ذُوْ مَالٍ وَلَا يَرِثُنِيْ اِلَّا ابْنَةٌ لِيْ، اَفَاَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِيْ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَالشَّطْرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ فَقَالَ: لَا، قُلْتُ: فَالثُّلُثُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ - اَوْ كَبِيْرٌ - اِنَّكَ اَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ، وَاِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِيْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ اِلَّا اُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتّٰى مَا تَجْعَلُ فِيْ فِيْ اِمْرَاَتِكَ قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُخَلَّفُ بَعْدَ اَصْحَابِيْ؟ قَالَ: اِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِيْ بِهٖ وَجْهَ اللّٰهِ اِلَّا ازْدَدْتَ بِهٖ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ اَنْ تُخَلَّفَ حَتّٰى يَنْتَفِعَ بِكَ اَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُوْنَ. اَللّٰهُمَّ اَمْضِ لِاَصْحَابِيْ هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلٰى اَعْقَابِهِمْ، لٰكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ» يَرْثِيْ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

হযরত সা'আদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) (ইনি দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত মহাসৌভাগ্যবান দশজন ছাহাবার অন্যতম।) বলেন, বিদায় হজ্জের বছর আমার কঠিন অসুখের সময় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখিতে আসিলেন। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার অসুখের অবস্থা তো দেখিতেছেন। (বাঁচিবার কোন আশা নাই।) আমি প্রচুর সম্পদের অধিকারী। অথচ একমাত্র কন্যা ছাড়া আমার কোন ওয়ারিছ নাই। এমতাবস্থায় আমি কি আমার সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ ছাদাকা করিতে পারি? তিনি বলিলেন, না। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তবে অর্ধেক? তিনি

বলিলেন, না। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তবে এক তৃতীয়াংশ? তিনি বলিলেন, এক তৃতীয়াংশ (করিতে পার। তবে) এক তৃতীয়াংশও বেশী।

আপন ওয়ারিছদিগকে তুমি সচ্ছল অবস্থায় রাখিয়া যাওয়া তাহাদিগকে মানুষের দুয়ারে হাত পাতিবার মত অভাবী অবস্থায় রাখিয়া যাওয়া হইতে উত্তম।

আর দেখ, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে তুমি যাহাই খরচ করিবে উহার প্রতিদান অবশ্যই পাইবে। এমন কি স্ত্রীর মুখে যাহা তুলিয়া দিবে (উহারও ছাওয়াব পাইবে।)

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি আমার সংগীদের পরেও থাকিয়া যাইব? তিনি বলিলেন, অবশিষ্ট জীবনে তুমি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য যে আমলই করিবে উহার কারণে তোমার দরজা ও মর্তবা বুলন্দ হইবে। খুবই সম্ভব যে, তুমি জীবিত থাকিবে এবং তোমার দ্বারা একদল লোক উপকৃত হইবে এবং একদল লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

(অতঃপর তিনি বলিলেন,) হে আল্লাহ! আমার সাথীদের হিজরতকে শেষ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দাও। তাহাদিগকে পিছনের দিকে ফিরাইয়া দিও না। কিন্তু আসলে করুণাযোগ্য তো হইল বেচারা সা'আদ ইবনে খাওলাহ।

তাঁহার প্রতি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করুণা প্রকাশ করিতেন। কেননা তিনি মক্কায় মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

(বিদায় হজ্জের বছর) দশম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লক্ষাধিক ছাহাবার কাফেলাসহ যে হজ্জ করিয়াছিলেন, উহাকেই বিদায় হজ্জ বলে। কেননা এই হজ্জের সময় আরাফার মাঠে শেষ উপদেশ দানের মাধ্যমে উম্মতের নিকট হইতে তিনি বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দশম হিজরীর ২৫শে যিলকদ, রোজ শনিবার তিনি মক্কা শরীফে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ৯ই যিলহজ্জ আরাফার মাঠে সমবেত ছাহাবা কেরামের উদ্দেশ্যে এবং কেয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা উম্মতের উদ্দেশ্যে যে মহাগুরুত্বপূর্ণ উপদেশবাণী দান করিয়াছিলেন উহা বিদায় হজ্জের বিদায় ভাষণ নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ঐ ভাষণে তিনি বলিয়াছিলেন।

"মুসলমানদের জান-মাল ও ইজ্জত-আবরু পরস্পরের জন্য হারাম করা হইল।"

"তোমাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করিও। কেননা আল্লাহর নামে তোমরা তাহাদের লজ্জাস্থান নিজেদের জন্য হালাল করিয়াছ।"

"শোন; উপস্থিত ব্যক্তিরা যেন অনুপস্থিত ব্যক্তিদিগকে (যাহারা দুনিয়াতে বর্তমান আছে কিংবা পরবর্তীতে দুনিয়ায় আসিবে তাহাদিগকে) আমার উপদেশবাণী পৌঁছাইয়া দেয়।"

অবশেষে তিনি বলিলেন, দেখ; তোমাদিগকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তখন তোমরা কি বলিবে? ছাহাবা কেরাম আরয করিলেন, আমরা সাক্ষ্য দিব যে, আপনি স্বীয় দায়িত্ব

পালন করিয়াছেন এবং পৌঁছাইয়া দিয়াছেন এবং উপদেশ দান করিয়াছেন। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকাশের দিকে তর্জনী উত্তোলন করিলেন এবং সমবেত লোকদের প্রতি ইংগিত করিয়া তিনবার বলিলেন, اللهم اشهد হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকিও।

বিদায় হজ্জের প্রায় দুই মাস বাইশদিন পর তিনি দুনিয়া হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করেন এবং পরম প্রতিপালকের সান্নিধ্যে গমন করেন।

(আমাকে দেখিতে আসিলেম) ইহার শিক্ষা এই যে, বড়দের উচিত ছোট ও অধীনস্থদের অসুস্থতার সময় এবং অন্যান্য বিপদাপদের সময় তাহাদিগকে দেখিতে যাওয়া, তাহাদের খোঁজ খবর লওয়া। সান্ত্বনা দান করা এবং প্রয়োজনে সাধ্যমত সাহায্য করা। ইহাতে দুইটি ফায়দা। প্রথমতঃ বড়দের প্রতি ছোটদের অন্তরে আনুগত্য, কৃতজ্ঞতা ও মুহব্বত বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয়তঃ বড়দের অন্তরে বিনয় ও তাওয়াযু পয়দা হয়। উপরন্ত ইহাকে মুসলমানের প্রতি মুসলমানের হক হিসাবে হাদীছে উল্লেখ করা হইয়াছে এবং তাহাতে ছোট ও বড়র পার্থক্য করা হয় নাই। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

حق المسلم على المسلم ست اذا لقيته فسلم عليه و اذا دعاك فاجبه و اذا استنصحك فانصح له و اذا عطس فحمد الله فشمته و اذا مرض فعده و اذا مات فاتبعه *

মুসলমানের উপর মুসলমানের হক ছয়টি। তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহাকে সালাম করিবে। দাওয়াত দিলে তাহার দাওয়াত গ্রহণ করিবে। উপদেশ চাহিলে উপদেশ প্রদান করিবে। হাঁচি দিয়া আলহামদুলিল্লাহ বলিলে يرحمك الله বলিয়া উহার জওয়াব দিবে। অসুস্থ হইলে তাহাকে দেখিতে যাইবে এবং মৃত্যুবরণ করিলে তাহার জানাযার সংগে যাইবে।

তবে মনে রাখিতে হইবে যে, মুসলমানের হক মনে করিয়া ইহা করিতে হইবে। তবেই ছাওয়াব ও ফযীলত হাছিল হইবে। সামাজিকতার কথা চিন্তা করিয়া করিলে কোনই ফায়দা হইবে না।

(আমার অসুখের অবস্থা তো দেখিতেছেন) ইহা দ্বারা বোঝা গেল যে, সৎ উদ্দেশ্যে ও প্রয়োজনে নিজের অসুস্থতার কথা প্রকাশ করা জায়েয আছে। যেমন, চিকিৎসার জন্য, নেকবান্দার দু'আ লাভের জন্য, অছিয়ত করিবার জন্য কিংবা কাহারো জিজ্ঞাসার জওয়াব দিবার জন্য।

এক হাদীছে অবশ্য ইহার নিষেধ আসিয়াছে। তবে সেই হাদীছের অর্থ হইল, অসন্তুষ্টি, অধৈর্য ও অস্থিরতা হিসাবে অসুখের কথা বলা। কেননা তাহাতে অসুস্থতার আজর ও ছাওয়াব কমিয়া যায়।

(আপন ওয়ারিছদিগকে সচ্ছল অবস্থায় রাখিয়া যাওয়া) যদি কেহ ওয়ারিছদিগকে মাহরূম করিবার নিয়তে মৃত্যুর সময় দান ছাদকা করে তবে ছাওয়াবের পরিবর্তে উল্টা গোনাহ হইবে। হাঁ, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নিয়তে এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ দান বা ওছিয়ত করিতে পারে। উহাতে ছাওয়াব হইবে। পক্ষান্তরে যদি ওয়ারিছদের খিদমতের নিয়ত করিয়া সম্পদ রাখিয়া যায় তবে বিরাট আজর ও ছাওয়াব হাছিল হইবে। ওয়ারিছদের খিদমতের নিয়ত করা হউক বা না করা হউক মাল তো ছাড়িয়াই যাইতে হইবে। সংগে নেওয়ার তো কোন উপায় নাই। সুতরাং নিয়ত করিলে নিজেরই লাভ। আর আফসোস করিলে নিজেরই ক্ষতি।

(এমন কি স্ত্রীর মুখে যাহা তুলিয়া দিবে) সুবহানাল্লাহ! কত মেহেরবান আমাদের প্রতিপালক! ছাওয়াব লাভের কত সহজ উপায় করিয়া দিয়াছেন! বিবি বাচ্চাকে সবাই তো আদর সোহাগ করে। তাহাদের জন্য খরচ করে। কিন্তু গাফলতের কারণে নিয়ত না করিয়া কত বড় ছাওয়াব হইতে আমরা বঞ্চিত হইতেছি! এই জন্যই বলা হয় যে, মুমিনের ঘুম এমনকি পেশাব পায়াখানাও ইবাদত, যদি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের হুকুম মতো করা হয়।

স্ত্রীর সহিত গম্ভীর হইয়া থাকাকে অনেকে স্বামীত্বের প্রকাশ মনে করিয়া থাকে এবং হাস্য পরিহাস ও আদর সোহাগকে পৌরষের খেলাফ মনে করিয়া থাকে। ইহা ভ্রান্ত ধারণা। কেননা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার পবিত্র জীবনে আমাদের জন্য আদর্শ স্বামীর নমুনা রাখিয়া গিয়াছেন। স্ত্রীদের সহিত সেই আদর্শই অনুসরণ করা আমাদের কর্তব্য। হাদীছে আসিয়াছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণিমা-রাত্রে হযরত 'আয়েশা (রাঃ)-এর সহিত দুইবার দৌড় প্রতিযোগিতা করিয়াছিলেন। প্রথমবার হযরত 'আয়েশা (রাঃ) জয়লাভ করিয়াছিলেন। আর দ্বিতীয়বার তিনি জয়লাভ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, হে আয়েশা! আগের পরাজয়ের শোধ হইয়া গেল। আরও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত 'আয়েশা (রাঃ) পরস্পরের মুখ হইতে হাড় কাড়িয়া লইয়া চুষিতেন। অন্যান্য স্ত্রীদের সহিতও তাঁহার বিভিন্ন হাস্যরসের কথা বর্ণিত আছে। এমন কি সুন্দর সুন্দর গল্প বলিয়াও তিনি স্ত্রীগণকে আনন্দ দান করিতেন।

(আমি কি আমার সাথীদের পরেও থাকিয়া যাইব?) অর্থাৎ আমার সাথীরা আপনার সংগে মক্কা ত্যাগ করিয়া মদীনায় চলিয়া যাইবার পর আমি কি মক্কায় পড়িয়া থাকিব? ইহা তিনি মক্কায় মৃত্যুবরণ করিবার দুশ্চিন্তায় অস্থির হইয়া বলিয়াছিলেন। কেননা তিনি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য মক্কা হইতে হিজরত করিয়াছিলেন। এখন আশংকা করিতেছিলেন যে, মক্কায় মৃত্যু হইলে তাঁহার হিজরত ক্ষতিগ্রস্ত হইবে কিংবা ছাওয়াব কমিয়া যাইবে।

(খুবই সম্ভব যে, তুমি জীবিত থাকিবে) ইহা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম ভবিষ্যদ্বাণী। সকলে এবং হযরত সা'আদ (রাঃ) নিজেও তাঁহার বাঁচিবার আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাই তিনি সমস্ত সম্পত্তি দান করিবার মনস্থও করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে (ওয়ারিছদের) বহুবচন দ্বারা ইংগিত দিলেন যে, হযরত সা'আদ (রাঃ) বাঁচিয়া থাকিবেন এবং তাঁহার আরও সন্তান-সন্ততি হইবে। পরবর্তীতে তাহাই হইয়াছিল। ইহাছাড়া তিনি ইরাক বিজয়ের পরও জীবিত ছিলেন এবং কাদেসিয়া যুদ্ধে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বারা বহু লোক উপকৃত হইয়াছে। কেননা মুসলমানগণ যুদ্ধে গনীমত লাভ করিয়াছেন এবং ইরাকে প্রশাসক থাকা কালে মানুষের মাঝে তিনি ইনছাফ কায়েম করিয়াছেন, অনেকেই তাঁহার উত্তম চরিত্র ও সুবিচার দেখিয়া মুসলমান হইয়াছে।

তদ্রূপ কাফিররা অনেকেই তাঁহার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কেননা তাহারা তাঁহার দ্বারা নিহত হইয়া জাহান্নামী হইয়াছে। তাহাদের স্ত্রী-সন্তান বন্দী হইয়াছে এবং তাহাদের সম্পদ গনীমতরূপে বে-দখল হইয়াছে।

(মক্কায় মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন) অর্থাৎ যেখান হইতে হিজরত করিয়াছিলেন সেখানেই ফিরিয়া গিয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন।

হযরত সা'আদ বিন খাওলাহ (রাঃ)-এর ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। এক মতে তিনি আদৌ হিজরত করেন নাই এবং মক্কাতেই মারা গিয়াছেন। অন্য মতে, তিনি হিজরত করিয়াছিলেন এবং বদরের যুদ্ধেও শরীক ছিলেন। অতঃপর স্বেচ্ছায় মক্কায় ফিরিয়া সেখানে মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন। তৃতীয় মতে বিদায় হজ্জের বৎসর বা সপ্তম হিজরীতে সন্ধির বছর তিনি মক্কায় মারা গিয়াছেন।

প্রথম বর্ণনা মতে তাঁহার দুর্দশার কারণ হইল হিজরত না করা। দ্বিতীয় মতে দুর্দশার কারণ স্বেচ্ছায় মক্কায় ফিরিয়া যাওয়া এবং সেখানে মৃত্যুবরণ করিবার কারণে হিজরত বাতিল হইয়া যাওয়া। তৃতীয় মতে দুর্দশার কারণ হইল, যে কোন ভাবেই হউক হিজরতের সময় ত্যাগ করিয়া যাওয়া ভূমিতে মৃত্যুর কারণে পূর্ণ ছাওয়াব কমিয়া যাওয়া।

হাদীছের শিক্ষা ঃ আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং কেহ যদি আল্লাহর হুকুম মনে করিয়া পরিবার পরিজনের জন্য হালাল পথে উপার্জন ও হালাল পথে খরচ করে তবে বিরাট আজর ও ছাওয়াব হইবে। এমন কি সাধারণ মোবাহ কাজও যদি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হয় তবে উহাও ইবাদত হইয়া যায়। যেমন স্ত্রীর মুখে খাবার তুলিয়া দেওয়ার সহিত আখিরাতের দূরতম সম্পর্কও নাই। কিন্তু নিয়তের কারণে উহা ইবাদত হইয়া যাইবে। মোটকথা মুমিনের যিন্দেগীর যাবতীয় কাজকর্ম ও আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। বাহ্যতঃ উহাকে যতই দ্বীন মনে করা হউক রিয়া বা নিয়তের ফাসাদের কারণে উহা দুনিয়া হইয়া যাইবে। আবার কোন কাজ বাহ্যতঃ যতই দুনিয়া মনে হউক নিয়তের দ্বারা উহা দ্বীন হইয়া যাইবে।

৮। অন্তর বা দিল হইল আসল।

٧ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ صَخْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلٰى اَجْسَامِكُمْ، وَلَا اِلٰى صُوَرِكُمْ، وَلٰكِنْ يَنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের শরীর কিংবা তোমাদের চেহারা ছুরত দেখেন না। বরং তিনি তোমাদের অন্তর দেখিয়া থাকেন।

ফায়দা ঃ

আলোচ্য হাদীছের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ পাকের নযর তথা নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভ করা বাহ্যিক আমলের উপর নির্ভরশীল নহে। বরং কলবের অবস্থার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং বান্দার কর্তব্য হইল তাহার কলবের অবস্থার প্রতি যত্নবান হওয়া এবং উহার প্রতি সদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা এবং শিরক, অহংকার হিংসা, বিদ্বেষ ইত্যাদি ব্যাধি হইতে কলবকে পবিত্র রাখা এবং ঈমান, ইখলাছ, বিনয়, আল্লাহর প্রতি ভয় ও মুহব্বত ইত্যাদি মহৎ গুণাবলী দ্বারা অন্তরকে সুসজ্জিত করিবার প্রতি অশেষ যত্নবান হওয়া। কেননা কলব হইল মাহবুবের নযরের স্থান। ইহাকেই কোরআন শরীফে تزكية (বা আত্মসংশোধন) বলা হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে–

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى *

যে ব্যক্তি (আপন আত্মা ও কলবের) পবিত্রতা অর্জন করিয়াছে সে সফলকাম হইয়াছে।

কলবের ইছলাহ ও সংশোধন অংগ প্রত্যংগের যাবতীয় আমলের উপর অগ্রগণ্য। কেননা কলবই হইল শরীয়তের যাবতীয় আমল ছহী হইবার মাপকাঠি। তাই হাদীছ শরীফে আসিয়াছে—

الا ان فى الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله الا و هى القلب *

শোন, মানব দেহে একটি গোশতের টুকরা আছে। উহা যদি ঠিক হইয়া যায় তবে গোটা দেহ ঠিক হইয়া যাইবে। আর উহা যদি নষ্ট হইয়া যায় তবে গোটা দেহ নষ্ট হইয়া যাইবে। শোন, ঐ গোশতের টুকরা হইল কলব।

কলবকে সংশোধন করিবার উপায় হইল সকল কাজে আল্লাহকে হাযির নাযির মুরাকাবা করা; যাহাকে হাদীছ শরীফে 'ইহছান' বলা হইয়াছে। অর্থাৎ এই চিন্তা করা যে, আল্লাহকে আমি দেখিতেছি। ইহা সম্ভব না হইলে অন্তত এই চিন্তা করা যে, আল্লাহ তো আমাকে দেখিতেছেন।

তবে মনে রাখিতে হইবে যে, শরীরের রোগব্যাধির চিকিৎসা যেমন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া নিজে নিজে করা সম্ভব নহে; তদ্রূপ কলবের রোগব্যাধির চিকিৎসাও রূহানী চিকিৎসক তথা আল্লাহওয়ালাদের তত্ত্বাবধান ও তারবিয়াত ছাড়া নিজে নিজে সম্ভব নহে। বরং উহাতে অধিকতর গোমরাহী ও বরবাদিসমূহের আশংকা রহিয়াছে। সুতরাং কর্তব্য হইল খাঁটি আল্লাহওয়ালার ছোহবত গ্রহণ করিয়া নিজেকে তাহার হাতে সোপর্দ করিয়া দেওয়া এবং তাহার তত্ত্বাবধানে কলবের তাযকিয়া ও সংশোধনের কাজে আজীবন আত্মনিয়োগ করিয়া থাকা এবং মুহূর্তের জন্যও এই বিষয়ে গাফিল না হওয়া। কেননা মানবজাতির দুশমন শয়তান প্রতি মুহূর্তে ওত পাতিয়া রহিয়াছে। হাদীছ শরীফে আছে যে, শয়তানের একটি শুঁড় আছে। সে মুমিনের কলবের পাশে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। যখনই তাহার কলব গাফিল হয় তখনই সে উহাতে তাহার শুঁড় ঢুকাইয়া দেয়।

হাদীছের আরেকটি শিক্ষা এই যে, যেহেতু সমস্ত যাহেরী আমলের মাপকাঠি হইল কলব। আর কলবের অবস্থা আমাদের নযর হইতে গায়েব সেহেতু কাহারো বাহ্যিক নেক আমল দেখিয়া তাহার সততা সম্পর্কে সুনিশ্চিত ফয়সালা করা উচিত নহে। কেননা হয়ত আল্লাহ পাক তাহার কলবের এমন কোন খারাপ অবস্থার কথা জানেন যাহার ফলে তাহার বাহ্যিক কোন আমলই গ্রহণ (যোগ্য) নহে। তদ্রূপ কাহারো নাফরমানি দেখিয়াই তাহার সম্পর্কে মন্দ হইবার সুনিশ্চিত ফায়সালা করা উচিত নহে। কেননা হইতে পারে যে, আল্লাহ পাক তাহার কলবের এমন কোন ভাল অবস্থা জানেন যাহার কারণে তাহাকে তিনি মাফ করিয়া দিবেন। মোটকথা কাহারও নেক আমল দেখিয়া তাহার তাযীমের ক্ষেত্রে সীমা লংঘন করিতে নাই। আবার মন্দ আমল দেখিয়া কোন মুসলমানকে ঘৃণা করিতে নাই। বরং পাপকে ঘৃণা করিতে হইবে। আর পাপীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া তাহাকে পাপের পথ হইতে উদ্ধারের চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাও এই হাদীছে শিক্ষা যে, নিজের শারীরিক সৌন্দর্য লইয়া গর্ব করা উচিত নহে। তদ্রূপ অন্যের শারীরিক খুঁত বা অসৌন্দর্য সম্পর্কে কটাক্ষ করিতে নাই। কেননা ওলামায়ে কেরাম হাদীছের এমন অর্থও করিয়াছেন যে, আল্লাহ পাক তোমাদের শারীরিক সৌন্দর্যের প্রতি

নযর করেন না বরং তোমাদের কলবের প্রতি নযর করেন। সুতরাং শারীরিক সৌন্দর্য মর্যাদা ও নৈকট্যের মাপকাঠি নহে। বরং কলবের সৌন্দর্য ও পবিত্রতাই হইল মাপকাঠি। যেমন এক যুদ্ধে এক কুৎসিত দর্শন হাবশী ছাহাবী আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি দেখিতে অসুন্দর। আমার শরীর দুর্গন্ধযুক্ত। এমতাবস্থায় আমি যদি নিহত হই তবে কি আমি (যাহাদের জন্য জান্নাত তৈয়ার করা হইয়াছে।) তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হইব? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, অবশ্যই তুমি তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হইবে। তখন ঐ ছাহাবী লড়াই করিয়া শহীদ হইলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার জানাযা দেখিয়া বলিলেন, আল্লাহ তোমাকে সুদর্শন করিয়া দিন এবং তোমার শরীরকে সুগন্ধযুক্ত করিয়া দিন।

এক হাদীছে বর্ণিত আছে যে, যাহির নামক এক ছাহাবী ছিলেন। তিনি গ্রামে বাস করিতেন। তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য গ্রাম হইতে গ্রামীণ হাদিয়া আনিতেন। আর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরিয়া যাইবার সময় তাহাকে শহর হইতে প্রয়োজনীয় রসদ দিয়া দিতেন। এই প্রসংগে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিতেন, যাহির আমাদের গ্রাম আর আমরা তাহার শহর। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে ভালবাসিতেন। তিনি ছিলেন দেখিতে কুৎসিত।

একদিন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নিকট তাশরীফ আনয়ন করিলেন। উক্ত ছাহাবী (তখন বাজারে) তাহার পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে পিছন হইতে এমনভাবে জড়াইয়া ধরিলেন যে, তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাই বলিয়া উঠিলেন কে তুমি? আমাকে ছাড়িয়া দাও। পরে তিনি ফিরিয়া তাকাইলেন এবং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বুঝিতে পারিলেন। তখন তিনি তাহার পিঠ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বুকের সহিত ভালভাবে লাগাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিতে লাগিলেন এই গোলামকে কে খরিদ করিবে? লোকটি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তবে তো আমাকে খুবই কমদামী দেখিতে পাইবেন (আমার মত কুৎসিত গোলাম পয়সা খরচ করিয়া কে খরিদ করিবে।) তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কিন্তু আল্লাহর নিকট তুমি কমদামী নহ।

৯। জিহাদের নিয়ত

وَعَنْ اَبِيْ مُوْسٰى عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ الْاَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، اَيُّ ذٰلِكَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

হযরত আবু মুসা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঐ লোক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল যে বীরত্ব প্রকাশের জন্য লড়াই করে কিংবা স্বজাত্যবোধের কারণে লড়াই করে কিংবা লোক দেখাইবার জন্য লড়াই করে। ইহার কোনটি আল্লাহর রাস্তায় (লড়াই বলিয়া গণ্য হইবে?) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীন বুলন্দ হইবার জন্য লড়াই করিবে ঐ লড়াই-ই আল্লাহর রাস্তায় (বলিয়া গণ্য হইবে।)

ফায়দা ঃ

অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় যে লড়াই উহার উৎস হইবে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করিবার মানসিকতাজাত আত্মিক শক্তি। ভিতরের ক্রোধ বা পাশব শক্তি উহার উৎস হইবে না।

বস্তুতঃ এইখানেই অন্যান্য জাতির যুদ্ধ ও ইসলামী জিহাদের পার্থক্য। পৃথিবীর ইতিহাসে যত যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে সেইগুলির উদ্দেশ্য ছিল অন্য জাতিকে পদানত করিবার মাধ্যমে স্বজাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করা। সুতরাং নিছক ক্রোধ ও পাশবিকতাই ছিল তাহাদের যুদ্ধের উৎস।

পক্ষান্তরে ইসলামী জিহাদের উদ্দেশ্য হইল আল্লাহর যমিনে আল্লাহর দ্বীনকে জয়ী করিবার মাধ্যমে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা এবং আল্লাহর বান্দাদিগকে চিরস্থায়ী জাহান্নামের বরবাদি হইতে উদ্ধার করা। এই কারণেই দেখা যায়; ওয়াহশীর মত নিষ্ঠুর হাবসী দাসও ছাহাবা কেরামের কাতারে শামিল হইয়া গেলেন শুধু কালিমা উচ্চারণের মাধ্যমে। কেহ তাঁহার প্রতি অংগুলি নির্দেশেরও সুযোগ পাইল না। (আল্লাহ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হউন।)

বর্ণিত আছে যে, এক যুদ্ধে হযরত আলী (রাঃ) তাঁহার প্রতিপক্ষ এক যোদ্ধাকে পরাভূত করিয়া তাহার বুকে চাপিয়া বসিলেন এবং তাহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলেন। লোকটি মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া দিগ্বিদিগজ্ঞানশূন্য হইয়া হযরত আলী (রাঃ)-এর মুখে থুথু ছিটাইয়া দিল। হযরত আলী (রাঃ) সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

অমুসলিম সৈনিক বিস্মিত হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিবার কারণ জানিতে চাহিল। তিনি বলিলেন, এতক্ষণ আমি তোমার সহিত লড়াই করিতেছিলাম আল্লাহকে সন্তুষ্টি করিবার জন্য। কিন্তু যখন তুমি আমার মুখে থুথু ছিটাইয়া দিলে তখন আমার ভিতরে ক্রোধ সৃষ্টি হইল। এখন যদি তোমাকে হত্যা করি তবে ইহার উৎস হইবে ভিতরের ক্রোধ। আল্লাহর সন্তুষ্টি নহে। আর ক্রোধের বশীভূত হইয়া লড়াই করিবার নাম জিহাদ নহে। তাই তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম। শত্রু সৈনিক বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিল, যে ধর্ম তাহার অনুসারীকে যুদ্ধের ময়দানে এতখানি আত্মসংযমী হইতে শিক্ষা দেয় সেই ধর্ম অব্যশই সত্যধর্ম। লোকটি তৎক্ষণাৎ কালিমা উচ্চারণ করিয়া মুসলমান হইয়া গেল।

পক্ষান্তরে আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে যে জিহাদ (বা অন্য কোন আমল) হইবে তাহার পরিণাম জাহান্নাম ছাড়া অন্য কিছু নহে। বর্ণিত আছে, কেয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আল্লাহর সামনে উপস্থিত করা হইবে। আল্লাহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন। কি আমল লইয়া আসিয়াছ। সে বলিবে, হে রব! তোমার রাস্তায় গলা কাটাইয়া শহীদ হইয়াছি। আল্লাহ বলিবেন, মিথ্যা বলিতেছ। তুমি তো লড়াই করিয়াছ যাহাতে লোকেরা তোমাকে বাহাদুর বলে। তাহা তো বলা হইয়াছে, তখন তাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপের আদেশ করা হইবে।

মোটকথা, এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, বিশুদ্ধ নিয়তই হইল আমল কবুল হইবার মাপকাঠি।

১০। হত্যাকারী ও নিহত উভয়ে জাহান্নামী।

- وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ الثَّقَفِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِي النَّارِ»، قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، هٰذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُوْلِ؟ قَالَ: «إِنَّه كَانَ حَرِيْصًا عَلٰى قَتْلِ صَاحِبِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

হযরত আবু বকর নোফায় বিন হারিছ ছাকাফী (রাঃ) হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, দুই মুসলমান যখন নিজ নিজ তলোয়ার লইয়া পরস্পর মুখামুখি হয় তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ে জাহান্নামী হইবে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হত্যাকারীর বিষয় তো বুঝিলাম, কিন্তু নিহত ব্যক্তির বিষয়টা কি? (সে তো মজলুম, সে কেন জাহান্নামী হইবে?) তিনি বলিলেন, সে তো তাহার প্রতিপক্ষকে হত্যা করিবার প্রয়াসী ছিল। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

(উভয়ে জাহান্নামী হইবে।) হত্যাকারীকে আল্লাহ যদি মাফ না করেন তবে তো তাহার জাহান্নামী হইবার কারণ পরিষ্কার। কেননা সে জালিম। পক্ষান্তরে নিহত ব্যক্তিকে আপাততঃ মজলুম মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে সেও জালিম। কেননা উভয়ে অন্যায়ভাবে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল এবং উভয়েই অপর পক্ষকে হত্যা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর ছিল।

যেই সকল হাদীছে আসিয়াছে যে, বান্দা মনে মনে গোনাহর যে ইচ্ছা করে ফিরেশতা উহা লিখেন না, যতক্ষণ না সে উহা বাস্তবে রূপদান করে; তাহার অর্থ হইল, গোনাহ করিবার হালকা ও প্রাথমিক ইচ্ছা। পক্ষান্তরে আলোচ্য হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, গোনাহ করিবার পোক্ত ও সুদৃঢ় ইচ্ছা করা হইলে উহা গোনাহ হিসাবে ধরা হইবে। যদিও উহা বাস্তবে না করে অথবা না করিতে পারে। যখন বাস্তবেও উহা করিবে তখন দ্বিতীয় গোনাহ লেখা হইবে। আর যদি দৃঢ় ইচ্ছা করিবার পর আল্লাহর ভয়ে উহা না করে তবে একটি নেকী লেখা হইবে।

হযরত ওছমান (রাঃ)-এর শাহাদতের পর যখন গৃহযুদ্ধ শুরু হইল এবং নিজ নিজ ইজতিহাদের কারণে উম্মত হযরত 'আলী ও হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) এই দুই শিবিরে বিভক্ত হইয়া পড়িল তখন বহু ছাহাবা কেরাম এই হাদীছের কারণেই কোন পক্ষে যোগদান না করিয়া ঘরে বসিয়া পড়িয়াছিলেন। এমন কি হযরত আবু বকরাহ (রাঃ) এতদূর পর্যন্ত বলিয়াছিলেন যে, কেহ যদি আমার ঘরে আসিয়া আমাকে হত্যা করিতে উদ্যত হয় তবু তাহার বিরুদ্ধে আমি অস্ত্রধারণ করিব না।

আজ যাহারা অন্যায় ক্ষমতাবলে এবং পাশবিকতায় উন্মত্ত হইয়া মুসলমান ভাইয়ের রক্তে হাত রাংগাইতেছে তাহাদের এই হাদীছ হইতে শিক্ষা গ্রহণ করা কর্তব্য।

অবশ্য কেহ যদি আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করে তবে সে এই হাদীছের হুঁশিয়ারির অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

তদ্রূপ দুই মুসলিম বাহিনীতে যদি ফিতনা ও যুদ্ধ শুরু হয় তখন সাধারণ ছাহাবা কেরাম ও ওলামায়ে ইসলামের মাযহাব এই যে, হকপন্থী দলের সাহায্য করা ওয়াজিব হইবে এবং ভ্রান্ত

পক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে হইবে যতক্ষণ না তাহারা হক পথে ফিরিয়া আসে। কেননা আল্লাহ পাক ইরশাদ করিয়াছেন–

فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ *

তখন বিদ্রোহকারী দলের বিরুদ্ধে লড়াই কর যতক্ষণ না তাহারা আল্লাহর আদেশের দিকে ফিরিয়া আসে।

ইহাছাড়া ঘরে বসিয়া থাকিবার পন্থা অনুসরণ করিলে তো সর্বত্র ফাসাদ ছড়াইয়া পড়িবে এবং ফিতনাকারীদেরই জয় জয়কার হইবে। আর হকপন্থীরা কোণঠাসা হইয়া পড়িবে।

আল্লামা নববী (রহঃ) আলোচ্য হাদীছের ব্যাখ্যা এইভাবে দিয়াছেন যে, ইহা ঐ সময় যখন উভয় পক্ষ জালিম ও ভ্রান্ত হয় এবং কোন পক্ষের নিকট ইজতিহাদ ও শরীয়তসম্মত দলিল প্রমাণ না থাকে। পক্ষান্তরে যদি এক পক্ষে শরীয়তসম্মত ইজতিহাদ থাকে, যেমন হযরত আলী (রাঃ) ও খারেজীদের ক্ষেত্রে ছিল কিংবা যদি উভয় পক্ষে শরীয়তসম্মত ইজতিহাদ থাকে, যেমন হযরত আয়েশা ও হযরত আলী (রাঃ)-এর মাঝে ছিল কিংবা হযরত আলী ও হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-এর মাঝে ছিল তবে তাহাদের ক্ষেত্রে এই হাদীছ প্রযোজ্য হইবে না।

হাদীছের শিক্ষা ঃ অন্যায়ভাবে অর্থাৎ শরীয়তের পূর্ণ অনুমোদন ছাড়া কোন মুসলমান (এবং অমুসলমান)-এর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা যাইবে না। করিলে জাহান্নামের আগুনে জ্বলিতে হইবে।

১১। জামা'আতে ছাওয়াব বেশী হইবার কারণ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِيْ جَمَاعَةٍ تَزِيْدُ عَلٰى صَلَاتِهِ فِيْ سُوْقِهِ وَبَيْتِهِ بِضْعًا وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً وَذٰلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيْدُ إِلَّا الصَّلَاةَ، لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ حَتّٰى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ، وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّوْنَ عَلٰى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِيْ مَجْلِسِهِ الَّذِيْ صَلّٰى فِيْهِ يَقُوْلُوْنَ: «اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اَللّٰهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيْهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَهٰذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ .

وَقَوْلُهُ ﷺ: «يَنْهَزُهُ» هُوَ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَالْهَاءِ وَبِالزَّايِ : أَيْ يُخْرِجُهُ وَيُنْهِضُهُ .

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, জামাতের সহিত নামায পড়িবার ছাওয়াব দোকানে বা ঘরে নামায পড়িবার চাইতে বিশগুণেরও কিছু বেশী।

কারণ এই যে, যখন কোন ব্যক্তি অযু করে এবং উত্তম রূপে অযু করে। অতঃপর শুধু নামাযের নিয়তেই ঘর হইতে বাহির হইয়া মসজিদে আসে, তখন মসজিদে প্রবেশ করা পর্যন্ত প্রতি পদক্ষেপে তাহার একটি মর্তবা বুলন্দ করা হয় এবং একটি গোনাহ মাফ করা

হয়।

যখন সে মসজিদে প্রবেশ করে তখন হইতে সে নামাযে রত বলিয়া গণ্য হয়, যতক্ষণ সে শুধু নামাযের উদ্দেশ্যে আবদ্ধ থাকে। আর তোমাদের কেহ যতক্ষণ পরবর্তী নামাযের অপেক্ষায় (মসজিদের) ঐ স্থানে বসিয়া থাকে যেখানে নামায পড়িয়াছিল, ততক্ষণ ফিরিশতাগণ তাহার জন্য এই দু'আ করিতে থাকেন, হে আল্লাহ! তাহার প্রতি রহম করুন। হে আল্লাহ! তাহাকে মাফ করুন। হে আল্লাহ! তাহার তাওবা কবুল করুন। যতক্ষণ সে অযু ভংগ না করে (অথবা যতক্ষণ সে নিজের কোন আচরণ দ্বারা ফিরিশতাগণকে ও মুসল্লীগণকে কষ্ট না দেয়) ততক্ষণ এই দু'আ চলিতে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেন, আলোচ্য হাদীছের সারমর্ম এই যে, মসজিদে জামা'আতের সহিত নামায পড়া বাড়ীতে নামায পড়া হইতে উত্তম, জামা'আতের সহিত পড়া হউক কিংবা একাকী।

আল্লামা ইবনে দাকীকুল ঈদ (রহঃ) বলেন, আমার মনে হয়; হাদীছের উদ্দেশ্য হইল মসজিদের বা-জামা'আত নামাযকে মসজিদের বা বাহিরের একাকী নামাযের সহিত তুলনা করা। তবে মসজিদের জামা'আতে যাহারা উপস্থিত হয় না তাহারা যেহেতু সাধারণতঃ বাড়ীতে ও বাজারে একাকীই নামায পড়িয়া থাকে সেহেতু সাধারণভাবে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, (মসজিদের) জামা'আতের নামায বাড়ীর ও বাজারের নামায হইতে উত্তম। প্রকৃতপক্ষে মসজিদ মুখ্য নহে। জামা'আতের সহিত নামাযই মুখ্য। সুতরাং অন্যত্র যদি জামা'আতের সহিত নামায পড়া হয় তবে উহা মসজিদের বা-জামা'আত নামাযের সমমর্যাদারই হইবে। কেননা হাদীছ শরীফে আছে–

جعلت لى الارض مسجدا

গোটা ভূপৃষ্ঠকেই আমার জন্য মসজিদ করা হইয়াছে।

কিন্তু আল্লামা ইবনুল হাজারের বক্তব্যই অধিক যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কেননা মসজিদ অভিমুখী পদক্ষেপের যে ফযীলত উহা তো বাড়ীর বা বাজারের জামা'আতে নাই।

আল্লামা ইবনে হাজার (রহঃ) আরো বলেন, হাদীছকে বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করিলেও বাড়ীর ও বাজারের নামায সমমর্যাদাপূর্ণ হওয়া প্রমাণিত হয় না। কেননা মসজিদের নামাযের তুলনায় কম মর্যাদাপূর্ণ হইবার ক্ষেত্রে উভয় স্থানের নামায সমান হওয়া সত্ত্বেও উভয় স্থানের নামাযের মাঝে মর্যাদার তারতম্য হইতে কোন বাধা নাই। তদ্রূপ বাড়ীর ও বাজারের বা-জামা'আত নামায এবং একাকী নামাযের মাঝেও মর্যাদাগত অভিন্নতা জরুরী নহে। বরং ইহাই স্বাভাবিক যে, হাদীছে উল্লেখিত বহুগুণ মর্যাদার বিষয়টি শুধু মসজিদের জামা'আতের সহিত সম্পৃক্ত। তবে সামগ্রিকভাবে বাড়ীর নামায সামগ্রিকভাবে বাজারের নামায হইতে উত্তম। কেননা হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে যে, বাজার হইল শয়তানের বিচরণ ক্ষেত্র। তদ্রূপ বাজারের ও বাড়ীর বা-জামা'আত নামায একাকী নামায হইতে উত্তম।

হাদীছের ব্যাখ্যা যাহাই হউক ইহা পরিষ্কার যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে মসজিদের জামা'আতের

গুরুত্ব অপরিসীম। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমাদের যামানায় তো অবস্থা এই ছিল যে, প্রকাশ্য মুনাফিকই শুধু জামা'আতে অনুপস্থিত হইত। সাধারণ মুনাফিকদেরও জামা'আত তরক করিবার হিম্মত হইত না। এমন কি অসুস্থ ব্যক্তিও যদি দুইজনের কাঁধে ভর দিয়া মসজিদে হাযির হইতে পারিত তবে তাহাই করিত।

এক হাদীছে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যদি তাহারা জামা'আতের ফযীলত জানিত তবে মাটিতে গড়াইয়া হইলেও মসজিদে গিয়া জামা'আতের সহিত নামায পড়িত।

পক্ষান্তরে যাহারা মসজিদের জামা'আতে হাযির হয় না তাহাদের প্রতি কঠিন ক্রোধ প্রকাশ করিয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীছে ইরশাদ করিয়াছেন, আমার মন চাহে যে, কয়েকজন যুবককে কিছু লাকড়ী যোগাড় করিতে বলি। অতঃপর সেই সমস্ত বাড়ী ঘর জ্বালাইয়া দেই যাহারা বিনা ওযরে ঘরে নামায পড়ে।

আমাদের অবস্থা তো এই যে, দোকানদারি বা সংসারের ঝামেলাকেও আমরা ওযর হিসাবে ধরিয়া লইয়াছি। কিন্তু উপরোক্ত হাদীছের কঠিন হুঁশিয়ারি যদি আমাদের হৃদয়ংগম হইয়া যায় তবে কোন ওযরই আর ওযর হিসাবে টিকিবে না। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে ছহী বুঝ ও ছহী আমলের তাওফীক দান করুন। আমীন।

(বিশগুণেরও কিছু বেশী) এই বর্ণনায় নির্দিষ্ট সংখ্যা উল্লেখ করা হয় নাই। কিন্তু এক বর্ণনায় আছে خمسا و عشرين ضعفا বা পঁচিশগুণ বেশী। অন্য এক বর্ণনায় আছে سبعا و عشرين درجة (সাতাশগুণ বেশী) এই সংখ্যা– পার্থক্যের ব্যাখ্যা প্রসংগে আলিমগণ বিভিন্ন মত ব্যক্ত করিয়াছেন। একটি মত এই যে, নামাযীদের নিয়ত ও ইখলাছের পার্থক্যের কারণে পরিমাণ বেশী কম হইবে। আরেকটি মত এই যে, এশা ও ফজরের জামা'আতে শরীক হইবার ছাওয়াব সাতাশগুণ। কেননা এই দুই সময়ে জামা'আতে হাযির হওয়া বেশী কষ্টকর মনে হয়। কোন কোন মতে উম্মতের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ক্রমে বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইহার প্রকাশ দেখা যায়। সেই হিসাবে বলা যায় যে, প্রথমে পঁচিশগুণ ছিল, পরে সাতাশগুণ হইয়াছে।

(উত্তম রূপে অযু করে) অর্থাৎ অযুর যাবতীয় সুন্নাত, মুস্তাহাব ও আদব রক্ষা করিয়া অযু করা। যেমন মিছওয়াক করা, অযুর যত ফযীলত হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে সেইগুলি হাছিলের নিয়ত করা, বিসমিল্লাহ্ বলা, ডান অংগ আগে ধোয়া, তরতীব রক্ষা করা, সকল অংগ তিনবার করিয়া উত্তমরূপে ধোয়া, অযুর যাবতীয় দু'আ পড়া ইত্যাদি।

(মসজিদে প্রবেশ করে) প্রশ্ন হইল, যে ব্যক্তি মসজিদের জামা'আতে শরীক হইবার নিয়ত করিল কিন্তু পারিল না সে কি এই ফযীলত পাইবে, ইহার উত্তর এই যে, ৪ ও ৫নং হাদীছের মর্ম হইতে বোঝা যায় যে, সেও জামা'আতের ফযীলত পাইবে? যদি তাহার অন্তরে জামা'আতে শরীক হইবার আকাঙ্ক্ষা এবং ওযরের কারণে শরীক হইতে না পারিবার মর্মজ্বালা থাকে। যেমন ওযরের কারণে তাবুক যুদ্ধে যাঁহারা শরীক হইতে পারেন নাই তাঁহাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, মদীনায় এমন কিছু লোক রহিয়া গিয়াছে, যাহাদের অবস্থা এই যে, আমরা যত পাহাড়ী পথ ও উপত্যকা অতিক্রম করিয়াছি তাহারা

আমাদের সংগেই ছিল। কোন ওযর তাহাদিগকে আটকাইয়া রাখিয়াছে। তাহারা আজর ও ছাওয়াবের ক্ষেত্রে তোমাদের সমান অংশিদার হইবে।

(দু'আ করিতে থাকেন) ইহা দ্বারা অন্যান্য আমলের উপর নামাযের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। কেননা মুছল্লীদের জন্য ফিরিশতাগণ দু'আ করেন। তদ্রূপ ফিরিশতাগণের উপর নেককার লোকদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। কেননা নেককারগণ তাহাদের ইবাদত দ্বারা সর্বদা উচ্চ হইতে উচ্চতর মর্যাদা লাভ করিতে থাকেন। আর ফিরিশতাগণ স্বস্থানে থাকিয়া তাহাদের জন্য দু'আ ইস্তিগফারে মশগুল থাকেন। অবশ্য এই ফিরিশতাগণ প্রত্যেকের সংগে বিদ্যমান হিফাযতকারী ফিরিশতা হইতে পারেন। আবার অন্য ফিরিশতাও হইতে পারেন যাহাদিগকে এই কাজের জন্য আল্লাহর পক্ষ হইতে নিযুক্ত করা হয়।

(যেখানে সে নামায পড়িয়াছিল) আল্লামা কালাকশান্দী (রহঃ) বলেন, এই হাদীছের দাবী এই যে, যদি সে তাহার নামাযের স্থান ছাড়িয়া মসজিদের অন্যস্থানে গিয়া নামাযের অপেক্ষা করিতে থাকে তবে এই ফযীলত পাইবে না। কিন্তু হাফেয ইবন হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেন, হাদীছের উদ্দেশ্য ইহা নহে। বরং সেও এই ফযীলতের অধিকারী হইবে। কেননা আসল উদ্দেশ্য মসজিদে নামাযের ইন্তিযার করা

আল্লামা আলবাহী (রহঃ) উভয়ের মাঝে সমন্বয় সাধন করিয়া বলেন, যে ব্যক্তি মসজিদে নিজের নামাযের স্থানে অপেক্ষা করিতেছে এবং যে নিজের নামাযের স্থান হইতে সরিয়া মসজিদেই অন্যস্থানে অপেক্ষা করিতেছে উভয়েই নামাযের ইন্তিযারে থাকিবার কারণে নামাযের অবস্থায় আছে বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু ফিরিশতাগণের দু'আ ঐ ব্যক্তির জন্যই খাছ যে, নিজের স্থান হইতে নড়ে নাই। বরং সেইখানেই জমিয়া থাকিয়া পরবর্তী নামাযের অপেক্ষা করিতেছে।

হাদীছের শিক্ষা ঃ নামাযের জন্য উত্তম রূপে অযু করা এবং মসজিদে জামা'আতের সহিত নামায আদায় করা কর্তব্য।

১২। নেক আমলের শুধু নিয়ত করিলেই ছাওয়াব।

وَعَنْ اَبِي الْعَبَّاسِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ، ﷺ، فِيْمَا يَرْوِيْ عَنْ رَبِّه، تَبَارَكَ وَتَعَالٰى قَالَ: «اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذٰلِكَ: فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَاِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ عشر حسنات الى سبعمائة ضعف الى اضعاف كثيرة، وَاِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ عِنْدَه حَسَنَةً كَامِلَةً، وَاِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন। আর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা নেকসমূহ এবং গোনাহসমূহ লিখিলেন। অতঃপর ঐ গুলি প্রকাশ করিয়া দিলেন। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন নেক আমলের নিয়ত করিল কিন্তু উহা বাস্তবে করিল না, আল্লাহ তাঁহার নিকট উহাকে

একটি পূর্ণ নেকী রূপে লিখিয়া রাখেন আর যে ব্যক্তি নেক আমলের নিয়ত করিল এবং উহা আমলও করিল, আল্লাহ্ তাঁহার নিকট উহাকে দশটি নেকী হইতে সাতশত পর্যন্ত কিংবা আরও অনেক বেশী গুণ নেকী লিখিয়া রাখেন।

আর যে ব্যক্তি কোন গোনাহের নিয়ত করিল কিন্তু উহা বাস্তবে করিল না, আল্লাহ্ তাঁহার নিকট উহাকে একটি পূর্ণ নেকী লিখিয়া রাখেন। আর যদি সে গোনাহের নিয়ত করিল এবং উহা বাস্তবেও করিল তখন আল্লাহ্ উহাকে একটি গোনাহ্ রূপে লিখিয়া রাখেন।

ফায়দা ঃ

ইহা মূলতঃ একটি হাদীছে কুদসী। বুখারী ও মুসলিম শরীফের অন্য বর্ণনায় ইহা প্রত্যক্ষ হাদীছে কুদসী রূপেই বর্ণিত হইয়াছে। যেমন,

يقول الله عز و جل: اذا اراد عبدى ان يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها ، فان عملها فاكتبوها عليه بمثلها ، و ان تركها لاجلى فاكتبوها له حسنة، و اذا اراد ان يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة و اذا عملها فاكتبوها له بعشر امثالها ، و اذا تحدث بان يعمل سيئة فانا اغفرها له ما لم يعملها، فاذا عمله فانا اكتبها عليه بمثلها *

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা যখন কোন বদ আমল করিবার ইচ্ছা করে, তখন উহা করিবার পূর্ব পর্যন্ত উহা তাহার নামে লিখিও না। যদি সে উহা করে তবে তাহার নামে উহা ঐ পরিমাণই লিখিও। আর যদি সে আমার খাতিরে উহা বর্জন করে তবে উহা তাহার নামে একটি নেক আমল রূপে লিখিও।

পক্ষান্তরে যদি সে কোন নেক আমল করিবার নিয়ত করে অথচ উহা আমল করিল না তবে উহা তাহার নামে একটি নেক আমল রূপে লিখিও। আর যদি উহা আমলও করে তবে উহা তাহার নামে দশগুণ করিয়া লিখিও। আর যদি সে কোন বদ আমল করিবে বলিয়া আলোচনা করে তবে যতক্ষণ সে উহা না করে ততক্ষণ আমি তাহার এই গোনাহ্ মাফ করিয়া দিব। আর যখন সে উহা করিবে তখন আমি তাহার নামে উহা ঐ পরিমাণই লিখিব।

(আল্লাহ্ তা'আলা নেকসমূহ্ ও গোনাহ্সমূহ্ লিখিলেন) অর্থাৎ বান্দা যত নেক আমল ও বদ আমল করিবে বলিয়া আল্লাহর ইলমের মধ্যে রহিয়াছে তাহা তিনি আপন কুদরতে লিখিলেন। অতঃপর আমল লিপিবদ্ধকারী ফিরিশতাগণের সম্মুখে তাহা প্রকাশ করিলেন, যাহাতে তাহারা আমল লিপিবদ্ধ করিবার সমগ্র প্রক্রিয়াটি বুঝিতে পারেন এবং প্রতিবার জিজ্ঞাসা করিতে না হয় যে, কিভাবে লেখা হইবে।

(নেক আমলের নিয়ত করিল) এখানে দৃঢ় ইচ্ছা উদ্দেশ্য, যাহাতে অন্তরে করিবার দিকটি প্রবল হয়। দুর্বল ইচ্ছা যাহাতে করিবার দিকটি না করিবার উপর প্রবল হয় না। বরং অন্তরে আবছাভাবে ইচ্ছাটি উদিত হইয়া আবার মুছিয়া যায়, এই ধরনের দুর্বল ইচ্ছা উদ্দেশ্য নহে। উহা নেক আমল রূপে লিখিত হইবে না।

নেক আমলের নিয়তকে নেক আমল রূপে লেখিবার কারণ এই যে, নেক আমল যেমন অংগ প্রত্যংগের আমল তদ্রূপ নিয়তও কলবের আমল। সুতরাং নিয়তের দ্বারা প্রকৃতপক্ষে কলবের গণ্ডিতে আমলটি অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে।

(পূর্ণ নেকীরূপে লিখিয়া রাখেন) শুধু নেকী না বলিয়া পুর্ণ নেকী বলিবার কারণ এই যে, হয়ত কেহ ধারণা করিতে পারে যে, যেহেতু ইহা প্রকৃত আমল নহে বরং আমলের ইচ্ছা বা নিয়ত মাত্র সুতরাং তাহার ছাওয়াব প্রকৃত আমলের মত পূর্ণ ছাওয়াব হইবে না। কিছু কম অবশ্যই হইবে। এই ভুল ধারণা দূর করিবার জন্য বলা হইয়াছে যে, পুর্ণ আমলের ছাওয়াবই সে পাইবে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, আমলের নিয়তকারী ও আমলকারী উভয়ে এক স্তরের হইতে পারে কিভাবে? ইহার জওয়াব এই যে, যে ব্যক্তি শুধু নিয়ত করিল কিন্তু আমল করিল না সে তো শুধু নিয়তের কারণে ছাওয়াব পাইল। পক্ষান্তরে যে আমল করিল সে তো নিয়তও করিয়াছিল। কেননা আমলের পূর্বে আমলের নিয়ত তো অবশ্যই হইবে। সুতরাং সে নিয়তের কারণেও ছাওয়াব পাইল, আমলেরও ছাওয়াব পাইল। সুতরাং সর্বাবস্থায় তাহার স্থান ঐ ব্যক্তির উপরেই থাকিল যে শুধু নিয়ত করিয়াছে; আমল করে নাই। ইহাছাড়া আমলকারীর জন্য দশগুণের সুসংবাদ তো আছেই।

অর্থাৎ মূল ছাওয়াবের ক্ষেত্রে আমলকারী ও আমলের নিয়তকারী উভয়ে সমান। কিন্তু বহু গুণ ছাওয়াব লাভের ফযীলত শুধু আমলকারীর সহিত খাছ।

(দশগুণ) ইহা যে কোন নেক আমলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অর্থাৎ কোন নেক আমল করিবার মাত্র উহার দশগুণ ছাওয়াব হইয়া যাইবে। ইরশাদ হইয়াছে–

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا *

যে ব্যক্তি নেক আমল করিবে তাহার জন্য রহিয়াছে উহার দশগুণ।

তবে নিয়তের বিশুদ্ধতা এবং আমলের যাবতীয় আদব রক্ষা করা না করা এবং আমলের সময় ও স্থান তারতম্যের কারণে উহা দশগুণ হইতে শুরু করিয়া সাতশত গুণ পর্যন্ত হইতে পারে।

নিম্নোক্ত আয়াতে এই দিকে ইংগিত করা হইয়াছে–

كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِأَةُ حَبَّةٍ *

ঐ একটি দানার ন্যায় যাহা সাতটি শীষ অংকুরিত করিল। প্রতিটি শীষে রহিয়াছে একশত দানা।

বুখারী ও মুসলিম শরীফেরই অন্য এক বর্ণনায় আসিয়াছে–

الى سبعمائة ضعف الا الصيام فانه لى و انا اجزى به *

সাতশত গুণ পর্যন্ত, রোযা ছাড়া। কেননা রোযা শুধু আমার এবং আমি নিজে উহার বিনিময় দান করিব।

ইহা দ্বারা বোঝা গেল যে, রোযার ছাওয়াব কতগুণ বেশী হইবে উহার পরিমাণ আল্লাহ ছাড়া কাহারও ইলমের মধ্যে নাই। কেননা রোযা হইল সর্বোচ্চ প্রকারের ছবর। আর ছবরকারীদের সর্ম্পকে বলা হইয়াছে–

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ *

ছবরকারীদিগকে তাহাদের প্রতিদান বেলা-হিসাব পুর্ণরূপে দান করা হইবে।

(অনেক বেশী গুণ) ইহা আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তিনি যাহাকে ইচ্ছা, যত বেশী ইচ্ছা দান করিতে পারেন। ইরশাদ হইয়াছে–

وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ

আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা বেশীগুণ দান করিবেন।

আল্লাহর রহমত সম্পর্কে প্রত্যেক মুমিনের অন্তরে এই আশা থাকা উচিত যে, আমার আমল যদিও কোন যোগ্যতা রাখে না। তবু ইনশাআল্লাহ! আমার আমলকে তিনি ঐ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিবেন যাহার প্রতিদান বেলা-হিসাব দান করিবেন।

হাদীছ শরীফে বর্ণিত 'বেশী' যে কি পরিমাণ বেশী তাহার কোন সীমা নাই। সুতরাং বেশীর যত সর্বোচ্চ পরিমাণ কল্পনা করা যায় উহাই করিতে হইবে। যেমন কেহ একটি দানা ছাদাকা করিল। আল্লাহর ফজলে উহার হিসাব এইভাবে হইবে যে, যদি উহাকে উর্বরতম কোন ভূমিতে সর্বোত্তম যত্নের সহিত বপন করা হয়। অতঃপর উহার ফসল সংগ্রহ করা হয় এবং ঐ সমস্ত ফসল অনুরূপভাবে বপন কর হয়। এইভাবে কেয়ামত পর্যন্ত চলিতে থাকে তবে ঐ একটি দানা শস্যের অসংখ্য বিরাট পাহাড় সৃষ্টি করিয়া ফেলিবে। কিন্তু ঐ দানার ছাওয়াব উহার চাইতেও বেশী হইবে।

(গোনাহের নিয়ত করিল কিন্তু উহা করিল না) অর্থাৎ কাজটি পরিহার করিল কিংবা কথাটি উচ্চারণ করিল না এবং না করিবার কারণ হইল আল্লাহর ভয়। আল্লাহর প্রতি লজ্জা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের ইচ্ছা। লোকভয় ও লোকলজ্জা নহে কিংবা অক্ষমতা ও অপারগতা নহে। রিয়া নহে। এই সমস্ত জিনিস গোনাহ না করিবার কারণ হইলে ছাওয়াব তো দূরের কথা ইহার জন্য আলাদা গোনাহ হইবে। কেননা মাখলুকের ভয় বা লজ্জা বা সন্তুষ্টিকে আল্লাহর ভয় ও সন্তুষ্টির উপর অগ্রাধিকার দান করা হারাম।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, নেক আমলের ইচ্ছায় একটি নেক হইলে বদ আমলের ইচ্ছায় অনুরূপ একটি গোনাহ হওয়া উচিত। কেননা নেক আমলের ইচ্ছা যেমন কলবের আমল তদ্রুপ বদ আমলের ইচ্ছাও তো কলবের আমল।

ইহার জওয়াব এই যে, প্রথমতঃ আল্লাহর দয়া ও মেহেরবানির উপর কাহার কি বলিবার থাকিতে পারে? দ্বিতীয়তঃ বদ আমলের ইচ্ছা করিবার পর তো সে বিরত রহিয়াছে। আর ইহা স্বীকৃত যে, বদ আমল হইতে বিরত থাকা অতি উত্তম বিষয়। আর ইহা বদ আমলের ইচ্ছার পরে হইয়াছে। সুতরাং ইহা পূর্ববর্তী ইচ্ছাকে মুছিয়া ফেলিবে। কেননা ইরশাদ হইয়াছে–

إِنَّ الْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ *

নেক আমল সমূহ মন্দ আমল সমূহকে মুছিয়া ফেলে।

(একটি গোনাহ লিখিয়া রাখেন) মুসনাদে আহমদের বর্ণনায় এই অশংটিও রহিয়াছে– و لم تضاعف عليه (উহা তাহার উপর গুণ করা হয় না)

কোরআন শরীফে ইরশাদ হইয়াছে–

فَلَا يُجْزٰى اِلَّا مِثْلَهَا

তাহাকে শুধু অনুরূপ জাযা দান করা হইবে।

তবে ইহা ঠিক যে স্থানের কিংবা সময়ের কিংবা মর্যাদার কারণে কিংবা আল্লাহর সহিত নৈকট্যের কারণে একটি গোনাহ অধিকতর গুরুতর হইয়া যায়। যেমন পবিত্র মাসগুলিতে বা রমযান মাসে বা মক্কা শরীফে কেহ কোন গোনাহ করিল কিংবা বিভিন্ন নেয়ামত ও সান্নিধ্য দ্বারা আল্লাহ যাহাকে ধন্য করিয়াছেন সে কোন নাফরমানি করিয়া বসিল তাহার গোনাহ অন্যদের গোনাহের তুলনায় অবশ্যই গুরুতর হইবে এবং উহার পাকড়াও অধিকতর কঠোর হইবে। বাদশাহর দরবারে থাকিয়া কোন দরবারীর অন্যায় করা সাধারণ প্রজার দূরে থাকিয়া অন্যায় করিবার চাইতে অবশ্যই অধিক গুরুতর হইবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ একটি বিষয় জানা দরকার যে, মানুষের অন্তরে গোনাহের যে ইচ্ছা জাগ্রত হয় উহার পাঁচটি স্তর। প্রথম স্তরকে الهاجس বলে, অর্থাৎ গোনাহের ইচ্ছার প্রথম উদ্ভব। দ্বিতীয় স্তর হইল উদ্ভব হইবার পর অন্তরে উহার অবস্থান দীর্ঘ হওয়া। ইহাকে الخاطر বলে। তৃতীয় স্তর হইল করিব কি করিব না এই দোদুল্যমানতা। কিন্তু কোন দিক স্থির হইতেছে না। ইহাকে বলে حديث النفس চতুর্থ স্তর হইল الهم অর্থাৎ করিবার দিকটি অগ্রাধিকার লাভ করা এবং ঐ দিকে অন্তর অধিক ঝুঁকিয়া পড়া। পরবর্তী ও সর্বোচ্চ স্তর হইল العزم অর্থাৎ করিবার পাকাপোক্ত ইচ্ছা। এই স্তরে কোন বাধা বিঘ্ন না থাকিলে কাজটি ঘটিয়া যায়। বাধা বিঘ্ন থাকিলে বিলম্বিত হয় মাত্র।

এই পাঁচ স্তরের মধ্যে প্রথম স্তরটি সর্ব সম্মতিক্রমে মাফ। উহা ধরা হইবে না। কেননা উহা রোধ করা মানুষের সাধ্যের বাহিরে। পরবর্তী দুই স্তর যদিও রোধ করা মানুষের সাধ্যভুক্ত তথাপি ছহী হাদীছ দ্বারা উহা মাফ হওয়া প্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

ان الله تجاوز عن امتى ما حدثته نفسها ما لم تتكلم او تعمل به *

নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাক আমার উম্মতের ঐ সকল গোনাহ মাফ করিয়া দিয়াছেন যাহা তাহার অন্তর চিন্তা করিয়াছে যতক্ষণ সে উহা মুখে উচ্চারণ না করে [১] কিংবা কার্যে পরিণত না করে [২]।

নেক আমলের ইচ্ছার ক্ষেত্রেও এই তিনটি স্তরে কোন ছাওয়াব হইবে না।

১। অর্থাৎ গোনাহটি যদি কথা জাতীয় হয়।

২। অর্থাৎ গোনাহটি যদি কর্মজাতীয় হয়।

চতুর্থ স্তর তথা الهم এর ক্ষেত্রে ছহী হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, নেক আমলের ক্ষেত্রে নেকী লেখা হইবে কিন্তু বদ আমলের ক্ষেত্রে গোনাহ লেখা হইবে না। তবে দেখা হইবে যে, আল্লাহর ভয়ে সে উহা পরিহার করে কি না। যদি পরিহার করে তবে একটি নেকী লেখা হইবে। আর যদি উহা করিয়া বসে তবে একটি গোনাহ লেখা হইবে।

এই ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতম মত এই যে, বদ আমলের গোনাহ শুধু লেখা হইবে। গোনাহের চিন্তাটি গোনাহ হিসাবে লেখা হইবে না।

আল্লামা সাবকী (রহঃ) অবশ্য বলেন, অন্তরের চিন্তা ও ইচ্ছা মাফ হওয়া নিঃশর্ত নয়। বরং মুখে উচ্চারণ না করা এবং কার্যে পরিণত না করিবার সহিত শর্তযুক্ত। যদি আমলে রূপান্তরিত করে তবে দুই বিষয়ে পাকড়াও করা হইবে। বদ আমল করিবার কারণে এবং চিন্তা বা ইচ্ছা করিবার কারণে। তখন চিন্তা ও ইচ্ছা মাফ হইবে না। হাদীছের বাহ্যিক অর্থ অবশ্য ইহাই।

যাহারা আপত্তি করিয়াছেন যে, এই অবস্থায় তো একটি বদ আমলের দুইটি গোনাহ হওয়া লাযিম হইবে। তাহাদের আপত্তির জওয়াবে সাবকীর পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, ইচ্ছা তখন আলাদা একটি বদ আমল রূপে গণ্য হইবে। (আল্লাহই উত্তম জানেন।)

হাদীছের শিক্ষা ঃ অন্তরে গোনাহের ইচ্ছা জাগ্রত হইবামাত্র আল্লাহর আযমত ও বড়ত্ব চিন্তা করা উচিত এবং এই কথা মনে করিয়া গোনাহ না করা উচিত যে, আল্লাহর খাতিরে গোনাহ হইতে বিরত থাকিলে গোনাহের ইচ্ছাকে তিনি নেকী রূপে লিখিবেন।

১৩। মকবুল আমলের ওছিলায় বিপদ উদ্ধার হয়

وَعَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: «انْطَلَقَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتّٰى آوَاهُمُ الْمَبِيْتُ اِلٰى غَارٍ فَدَخَلُوْهُ، فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْغَارَ؛ فَقَالُوْا: اِنَّهُ لَا يُنْجِيْكُمْ مِنْ هٰذِهِ الصَّخْرَةِ اِلَّا اَنْ تَدْعُوْا اللّٰهَ بِصَالِحِ اَعْمَالِكُمْ. قَالَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ: اَللّٰهُمَّ كَانَ لِيْ اَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ، وَكُنْتُ لَا اَغْبِقُ قَبْلَهُمَا اَهْلًا وَلَا مَالًا. فَنَاٰى بِي طَلَبُ الشَّجَرِ يَوْمًا فَلَمْ اُرِحْ عَلَيْهِمَا حَتّٰى نَامَا فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوْقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ، فَكَرِهْتُ اَنْ اُوْقِظَهُمَا وَاَنْ اَغْبِقَ قَبْلَهُمَا اَهْلًا اَوْ مَالًا، فَلَبِثْتُ - وَالْقَدَحُ عَلٰى يَدِيْ - اَنْتَظِرُ اسْتِيْقَاظَهُمَا حَتّٰى بَرَقَ الْفَجْرُ وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ - فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غَبُوْقَهُمَا. اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ مِنْ هٰذِهِ الصَّخْرَةِ، فَانْفَرَجَتْ شَيْئًا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ الْخُرُوْجَ مِنْهُ. قَالَ الْآخَرُ: اَللّٰهُمَّ اِنَّهُ كَانَتْ لِيْ ابْنَةُ عَمٍّ كَانَتْ اَحَبَّ النَّاسِ اِلَيَّ»، وَفِيْ رِوَايَةٍ: «كُنْتُ اُحِبُّهَا كَاَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ، فَاَرَدْتُهَا عَلٰى نَفْسِهَا فَامْتَنَعَتْ مِنِّيْ حَتّٰى اَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِيْنَ فَجَاءَتْنِيْ فَاَعْطَيْتُهَا عِشْرِيْنَ وَمِائَةَ دِيْنَارٍ عَلٰى اَنْ تُخَلِّيَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ، حَتّٰى اِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا»، وَفِيْ رِوَايَةٍ: «فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا،

قَالَتِ: اتَّقِ اللهَ وَلَا تَفُضَّ الْخَاتَمَ اِلَّا بِحَقِّهِ، فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ اَحَبُّ النَّاسِ اِلَيَّ وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي اَعْطَيْتُهَا، اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ غَيْرَ اَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ الْخُرُوْجَ مِنْهَا. وَقَالَ الثَّالِثُ: اَللّٰهُمَّ اسْتَاْجَرْتُ اُجَرَاءَ وَاَعْطَيْتُهُمْ اَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِيْ لَهُ وَذَهَبَ، فَثَمَّرْتُ اَجْرَهُ حَتّٰى كَثُرَتْ مِنْهُ الْاَمْوَالُ، فَجَاءَنِيْ بَعْدَ حِيْنٍ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ اَدِّ اِلَيَّ اَجْرِي، فَقُلْتُ: كُلُّ مَا تَرَى مِنْ اَجْرِكَ: مِنَ الْاِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيْقِ. فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ لَا تَسْتَهْزِئُ بِيْ! فَقُلْتُ: لَا اَسْتَهْزِئُ بِكَ، فَاَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا، اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوْا يَمْشُوْنَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্য হইতে তিনজন লোক কোথাও যাইতেছিল। পথে রাত্রি যাপনের প্রয়োজনে তাহারা এক গুহায় প্রবেশ করিল। তখন হঠাৎ পাহাড় হইতে একটি বড় পাথর গড়াইয়া পড়িল এবং উহা তাহাদের গুহার মুখ বন্ধ করিয়া দিল। তাহারা পরস্পর বলাবলি করিল, এই পাথর হইতে কেহ তোমাদিগকে উদ্ধার করিতে পারিবে না, তবে যদি তোমরা তোমাদের নেক আমলের ওছিলা দিয়া আল্লাহর নিকট দু'আ কর। তখন তাহাদের একজন বলিল, হে আল্লাহ! আমার আম্মা আব্বা বৃদ্ধ ছিলেন। আমি তাহাদের পূর্বে আমার বিবি-বাচ্চাকে এবং চাকর-বাকরকে দুধ পান করাইতাম না। একদিন ঘাসের সন্ধানে বকরীপাল লইয়া দূরে চলিয়া গেলাম। পথে সন্ধ্যা হইয়া গেল। ফলে তাহারা উভয়ে ঘুমাইয়া পড়িবার আগে ফিরিতে পারিলাম না। আমি তাহাদের জন্য দুধ দোহন করিলাম। কিন্তু দেখি; তাহারা ঘুমাইয়া আছেন। তাহাদিগকে জাগাইয়া আরামে ব্যাঘাত ঘটানো কিংবা তাহাদের আগে বিবি-বাচ্চা ও চাকর-বাকরকে দুধ খাওয়ানো আমার কাছে খারাপ মনে হইল। তখন আমি পেয়ালা হাতে লইয়া তাহাদের জাগ্রত হইবার অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। এমন কি ভোর হইয়া গেল। অথচ বাচ্চারা ক্ষুধার কারণে আমার পায়ের কাছে কাঁদিয়া লুটোপুটি খাইতেছিল। অবশেষে যখন তাহারা জাগ্রত হইলেন তখন তাহারা (আগে) দুধ পান করিলেন (অতঃপর বিবি-বাচ্চাকে পান করাইলাম।) হে আল্লাহ! যদি এই আমল আমি তোমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য করিয়া থাকি তবে আমাদের উপর হইতে এই পাথর সরাইয়া দাও। তখন পাথর সামান্য সরিয়া গেল। কিন্তু তাহাতে তাহারা উহা হইতে বাহির হইতে পারিতেছিল না।

দ্বিতীয়জন বলিল, হে আল্লাহ! আমার এক চাচাত বোন ছিল। আর সে আমার নিকট সকলের চাইতে প্রিয় ছিল। অন্য রেওয়ায়েতে আছে– এক নারীর প্রতি এক পুরুষের যতটা ভালবাসা হইতে পারে আমি তাহাকে ততটা ভালবাসিতাম। তাই আমি তাহাকে ভোগ করিতে চাহিলাম। কিন্তু সে আমাকে প্রত্যাখ্যান করিল। কিন্তু এক বৎসর সে দুর্ভিক্ষগ্রস্তা হইল এবং (দিশাহারা হইয়া) আমার নিকট আসিল। আমি তাহাকে নির্জনে দেখা করিবার শর্তে একশত বিশ দিনার দিলাম। সে রাজী হইল (এবং শর্ত মত নির্জনে দেখা করিল)

যখন আমি তাহাকে আয়ত্বে আনিলাম। অন্য বর্ণনায় আছে– যখন আমি তাহার উরুদ্বয়ের মাঝখানে বসিলাম তখন সে বলিয়া উঠিল, আল্লাহকে ভয় কর এবং বিবাহ ছাড়া সম্ভ্রম নষ্ট করিও না। এই কথা শুনিয়া আমি তাহার নিকট হইতে সরিয়া আসিলাম। অথচ সে আমার অতিভালবাসার পাত্রী ছিল। তদুপরি তাহাকে দেওয়া স্বর্ণমুদ্রাও ত্যাগ করিলাম। (ফেরত লইলাম না) হে আল্লাহ! যদি এই আমল তোমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য করিয়া থাকি তবে যেই বিপদে আমরা আছি তাহা আমাদের উপর হইতে দূর কর। তখন পাথর সরিয়া গেল। তবে এতটুকু, যাহাতে তাহারা উহা হইতে বাহির হইতে পারিতেছিল না।

তৃতীয়জন বলিল, হে আল্লাহ! আমি কয়েকজন মজদুর নিযুক্ত করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে প্রাপ্য পারিশ্রমিক দান করিয়াছিলাম। কিন্তু একজন লোক তাহার পারিশ্রমিক ফেলিয়া চলিয়া গেল। তখন আমি তাহার পারিশ্রমিক ব্যবসায় খাটাইলাম। কিছুদিনের মধ্যে (ব্যবসায়ের মাধ্যমে) ঐ অর্থ হইতে প্রচুর সম্পদ অর্জিত হইল। একদিন সে আসিয়া বলিল, হে আল্লাহর বান্দা! আমার পারিশ্রমিক দাও। আমি তাহাকে বলিলাম, এই উট, গরু, বকরী ও দাস দাসী যাহা কিছু দেখিতেছ সবই তোমার পারিশ্রমিক। সে বলিল, হে আল্লাহর বান্দা! আমার সহিত রসিকতা করিও না। আমি বলিলাম, তোমার সহিত রসিকতা করিতেছি না। (যাহা বলিতেছি সত্যই বলিতেছি।) তখন সে সমস্ত কিছু হাঁকাইয়া লইয়া গেল। কিছুই রাখিয়া গেল না। হে আল্লাহ! যদি এই আমল তোমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য করিয়া থাকি তবে আমাদের বিপদ দূর কর। তখন পাথর সরিয়া গেল আর তাহারা (গুহা হইতে) বাহির হইয়া আসিল। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

(নেক আমলের ওছিলা দিয়া দু'আ করা) এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিভিন্ন বিপদাপদের মুহূর্তে অতীতের কোন নেক আমলের ওছিলা দিয়া আল্লাহর দরবারে বিপদ মুক্তির জন্য দু'আ করা পছন্দনীয়। অবশ্য আমলটি এমন হওয়া দরকার যে, উহা সম্পর্কে অন্তরে আশ্বস্তি হয় যে, উহা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হইয়াছিল। কেননা পূর্ববর্তী জাতির এই তিনজন এইরূপ করিয়াছিল এবং তাহাদের দু'আ কবুলও হইয়াছিল। আর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের প্রশংসা ও ফযীলত বর্ণনা উপলক্ষে এই ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন।

(তাহাদের একজন বলিল) তিনজনের মধ্যে তাহার আলোচনা প্রথমে আনিয়া এই দিকে ইংগিত করা হইল যে, মাতা-পিতার খিদমত অতিউচ্চ মর্তবার নেক আমল।

কোরআন ও হাদীছের বিভিন্ন আয়াত ও বাণী দ্বারা ইহা পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, মাতা-পিতার খিদমত ও ফরমাবরদারি হইল মানব জীবনে চিরসৌভাগ্য লাভের বড় উপায়। তদ্রূপ মাতা-পিতার খিদমতে অবহেলা এবং তাহাদের অবাধ্যতাই হইল দুনিয়া ও আখিরাতের বরবাদির বড় কারণ। পবিত্র কোরআনে মাতা-পিতার প্রতি সদাচরণের জোর তাগিদ করা হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে–

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا *

ইনসানকে আমি আপন মাতা-পিতার সহিত সদাচরণের আদেশ করিয়াছি। তাহার আম্মা তাহাকে অতি কষ্টে গর্ভে ধারণ করিয়াছে এবং অতি কষ্টে তাহাকে প্রসব করিয়াছে।

আরেক আয়াতে মানব সন্তানকে আল্লাহ পাক মাতা-পিতার জন্য এইভাবে দু'আ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন–

فَلَا تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَ قُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا *

তাহাদের একজন কিংবা উভয়ে যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হন তবে তাহাদের সামনে 'উহ' শব্দটিও বলিও না এবং তাহাদের সহিত রুক্ষ আচরণ করিও না বরং তাহাদের সহিত আদবপূর্ণ কথা বল এবং করুণাবশতঃ তাহাদের প্রতি নম্রতার ডানা অবনমিত করিও এবং বলিও, হে আমাদের প্রতিপালক! তাহাদের প্রতি করুণা করুন, যেমন তাহারা শৈশবে আমাকে লালন পালন করিয়াছেন।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন, সন্তানের উপর মাতা-পিতার হক কি? তিনি বলিলেন, তাহারা উভয়ে তোমার জান্নাত অথবা জাহান্নাম (অর্থাৎ তাঁহাদের খেদমত করিলে জান্নাতে যাইবে আর তাহাদিগকে কষ্ট দিলে জাহান্নামে যাইবে।)

হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এবং সকল মুসলমান ভাই-বোনকে বনী ইসরাঈলের এই নেককার লোকটির মত মাতা পিতার খিদমত করিবার তাওফিক দান কর। আমীন।

(একশত বিশ দীনার) বুখারী শরীফের অন্য অধ্যায়ে এবং মুসলিম শরীফে একশত দীনার বলা হইয়াছে। তবে দুই বর্ণনায় কোন বৈপরীত্ব নাই। কেননা কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা তাহার উর্ধ্বের সংখ্যার সম্ভাবনা বাতিল করে না। কিংবা হইতে পারে যে, একশত দিনার ছিল স্ত্রীলোকটির দাবী। আর সে নিজের পক্ষ হইতে অতিরিক্ত বিশ দীনার দান করিয়াছিল। সুতরাং এক বর্ণনায় দাবীকৃত অর্থের পরিমাণ উল্লেখ করা হইয়াছে। আর অন্য বর্ণনায় প্রদত্ত অর্থের সর্বমোট পরিমাণ উল্লেখ করা হইয়াছে।

(আল্লাহকে ভয় কর) বস্তুতঃ আল্লাহর ভয়ই হইল সেই শক্তি যাহা মানুষকে নির্জনেও গোনাহ হইতে ফিরাইয়া রাখিতে পারে। পক্ষান্তরে অন্তর হইতে আল্লাহর ভয় যদি চলিয়া যায় তখন দুনিয়ার কোন আইন যত কঠোরই হউক উহা মানুষকে অন্যায় ও অধর্ম হইতে বিরত রাখিতে পারে না। কেননা মানুষ যখন বুঝিতে পারে যে, আইন প্রয়োগকারী ব্যক্তিটি তাহাকে দেখিতেছে না এবং দেখিবার কোন সম্ভাবনাও নাই তখন তাহার অন্তরে শাস্তির ভয় থাকিবে না। ফলে কোন অন্যায় করিতে সে দ্বিধাবোধ করিবে না। পক্ষান্তরে যখন তাহার অন্তরে এই ভয় থাকিবে যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাহাকে দেখিতেছেন তখন সে দুনিয়ার শাসক ও শাস্তিদাতাদের চোখের আড়ালেও অন্যায় করিতে সাহস পাইবে না। এই জন্য সমাজ হইতে অপরাধ নির্মূল করিতে হইলে সর্বপ্রথম মানুষের অন্তরে আল্লাহর ভয় জাগ্রত করা দরকার এবং ঐ সকল অবস্থা দূর করা কর্তব্য যাহা মানুষের অন্তর হইতে আল্লাহর ভয় মুছিয়া ফেলে।

(যাহা কিছু দেখিতেছ সবই তোমার পারিশ্রমিক) আলোচ্য তিন ব্যক্তির বিশেষ তিনটি নেক আমল উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে বোঝা যায় যে, তাহারা তিনজন এই তিনটি

বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল। প্রথমজনের বৈশিষ্ট্য ছিল মাতা-পিতার খিদমত। দ্বিতীয়জনের বৈশিষ্ট্য ছিল চারিত্রিক পবিত্রতা ও আল্লাহর ভয়। আর তৃতীয়জনের বৈশিষ্ট্য ছিল আমানতদারী। মূলতঃ পূর্ববর্তী উম্মতের তিন ব্যক্তির এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উম্মতকেও এই সকল গুণ অর্জন করিতে উৎসাহিত করিয়াছেন।

এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণ হয় যে, আমল গ্রহণযোগ্য হইবার জন্য নিয়তের বিশুদ্ধতা ও ইখলাছই মাপকাঠি। কেননা তিনজনই এই কথা বলিয়াছেন যে, হে আল্লাহ যদি আমি এই আমল শুধু তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করিয়া থাকি তবে এই বিপদ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর।

হাদীছের শিক্ষা ঃ মাতা-পিতার খিদমত, আল্লাহর ভয়, আমানতদারি এই তিনটি গুণ আল্লাহর অতি প্রিয়– সুতরাং সকলের এই সমস্ত গুণে গুণান্বিত হওয়া উচিত।

বিগত নেক আমলের ওছিলা দিয়ে দু'আ করা দু'আ কবুল হইবার কারণ।

অধ্যায় – ২

তাওবা

তাওবার শর্ত সমূহ

ওলামায়ে কেরামের মতে (ছগীরা, কবীরা, যাহেরী, বাতেনী) সকল গোনাহ হইতেই তাওবা করা ওয়াজিব। যদি আল্লাহ ও বান্দার মাঝে গোনাহ হইয়া থাকে এবং কোন মানুষের হকের সহিত সম্পৃক্ত না হইয়া থাকে তবে তাওবার শর্ত তিনটি।

প্রথম শর্ত হইল, গোনাহ হইতে বিরত হওয়া। দ্বিতীয় শর্ত, কৃতকর্মের উপর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া। তৃতীয় শর্ত, এই গোনাহ আর কখনো না করিবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা। এই তিন শর্তের কোন একটি অনুপস্থিত হইলে তাহার তাওবা বিশুদ্ধ হইবে না।

আর যদি গোনাহের সম্পর্ক কোন মানুষের সহিত হয় তবে তাওবার শর্ত চারিটি।

উপরোল্লেখিত এই তিনটি, আর চতুর্থটি এই যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হক হইতে নিজেকে দায়মুক্ত করিতে হইবে। মাল হইলে উহা হকদারকে ফেরত দিতে হইবে। অপবাদজনিত শাস্তি বা এই ধরণের কিছু হইলে হকদারকে উহা উশূল করিবার সুযোগ দিবে কিংবা মাফ করাইয়া লইবে। আর গীবত করিয়া থাকিলে তাহার সহিত বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া লইবে। (অর্থাৎ যাহার গীবত করা হইয়াছে সে যদি জানিয়া থাকে তবে তাহার কাছে মাফ চাহিবে। আর না জানিয়া থাকিলে তাহাকে জানাইবার দরকার নাই। শুধু তাহার জন্য দু'আ ও ইসতিগফার করিবে।)

সমস্ত গোনাহ হইতে তাওবা করা ওয়াজিব। তবে আংশিক গোনাহ হইতে তাওবা করিলে হক্কানী ওলামায়ে কেরামের মতে ঐ গোনাহ হইতে তাহার তাওবা ছহী হইবে। আর অন্যান্য গোনাহ বহাল থাকিয়া যাইবে।

তাওবা ওয়াজিব হইবার স্বপক্ষে কোরআন, সুন্নাহ ও ইজমা-এর দলীল রহিয়াছে।

আয়াতসমূহ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন–

وَ تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ *

হে ঈমানদারগণ। তোমরা সকলে আল্লাহর নিকট তাওবা কর। তবেই তোমরা নিঃসন্দেহে সফলতা লাভ করিবে।

اِسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوا اِلَيْهِ *

তোমরা আপন প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা চাহ অতঃপর তাঁহার নিকট তাওবা কর।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا تُوبُوْا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَصُوْحًا *

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নিকট তাওবা কর। খাঁটি তাওবা।

ফায়দা ঃ

প্রথম আয়াতে المؤمنون বলা হইয়াছে যাহা শুধু পুরুষদিগকে বোঝায়। তবে এখানে শুধু পরুষেরা উদ্দেশ্য নহে বরং ইহাতে স্ত্রীলোকেরাও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ এর শাব্দিক অর্থ হয়ত তোমরা সফলকাম হইবে। কোরআন শরীফের বিভিন্ন বাংলা তরজমায় এইরূপ তরজমা দেখা যায়। ইহা শাব্দিক তরজমা। প্রকৃতপক্ষে কোরআনে যখন لعل যোগে কোন সুসংবাদ বা প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করা হয় তখন উহা সম্ভাবনার পরিবর্তে নিশ্চয়তার অর্থ প্রকাশ করে। তাই আমরা তরজমা করিয়াছি 'নিঃসন্দেহে তোমরা সফলতা লাভ করিবে।'

جميعا অর্থ সকলে। ইহা দ্বারা এই দিকে ইংগিত করা হইয়াছে যে, মানুষ মাত্রই গোনাহগার। কেহই নিজেকে নিষ্পাপ বলিয়া দাবী করিতে পারিবে না। কেননা নিজের অজান্তেও অনেক গোনাহ হইয়া যায়। আবার ইবাদত করিতে গিয়াও ত্রুটি হইয়া যায়। এমন কে আছে যে দাবী করিতে পারে যে, সারা জীবন আল্লাহর প্রতিটি ইবাদত যাবতীয় হক আদায় করিয়া করিতে পারিয়াছে? শোকরের কথাই ধরা হউক। আল্লাহর প্রতিটি নেয়ামতের শোকর আদায় করা ওয়াজিব। অথচ কোন মানুষের পক্ষেই তাহা সম্ভব নহে। কেননা নেয়ামত অসংখ্য وَ اِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا (তোমরা যদি আল্লাহর নেয়ামত গণনা করিতে চাহ তবে গণনা করিতে পারিবে না।) এই যে, আমি নির্বিঘ্নে প্রতিটি শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে পারিতেছি। প্রতিটি শ্বাস প্রশ্বাস একটি নেয়ামত। সুতরাং উহার শোকর আদায় করিতে হইবে।

আর এই শোকর আদায় করিতে করিতেই জীবন চলিয়া যাইবে। কিন্তু শেষ হইবে না। কেননা যেই শ্বাস প্রশ্বাসের সময় পূর্ববর্তী শ্বাস প্রশ্বাসের শোকর আদায় করিব, উহার শোকর আদায় করিবার যিম্মা থাকিয়া যাইবে। প্রতি মুহূর্তের সুস্থতার এবং অন্যান্য নেয়ামতের শোকর আদায় করিব কখন? মোটকথা, অন্তত শোকর আদায়ের অক্ষমতার কারণেও প্রত্যেক মুমিন নর-নারীকে অবশ্যই তাওবা ইস্তিগফার করিতে হইবে।

توبة আরবী শব্দ। ইহার আভিধানিক অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। তাওবার সহিত الى الله যুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং তাওবার অর্থ হইল আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা। আল্লাহর সহিত সম্পর্কই হইল মুমিনের আসল অবস্থা। গোনাহের মাধ্যমে আল্লাহর সহিত বান্দার সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যায় এবং বান্দা আল্লাহর নৈকট্য হইতে দূরে সরিয়া পড়ে। এই ছিন্ন সম্পর্ক পুনস্থাপন এবং পুনরায় আল্লাহ পাকের নৈকট্যে ফিরিয়া আসিবার জন্য বান্দার প্রতি অশেষ দয়াবশতঃ আল্লাহ পাক তাওবার ব্যবস্থা রাখিয়াছেন এবং মুমিন বান্দাদের প্রতি তাওবার আদেশ জারি করিয়াছেন।

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ পাকের শাহী দরবার হইতে এমন দয়া প্রকাশ পাইবার পরও যাহারা পাপে নিমগ্ন থাকিয়া দূরে সরিয়া থাকে এবং তাওবার মাধ্যমে নৈকট্যে ফিরিয়া আসিবার সুযোগ গ্রহণ করে না তাহরা বড়ই দুর্ভাগা।

আল্লাহ পাক তাওবার আদেশ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। বরং বিভিন্ন আয়াতে শান্ত্বনা বাণী শোনাইয়াছেন যে, গোনাহ যত বড়ই হউক আমার রহমত হইতে নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। খাঁটি অন্তরে তাওবা করিলে আমি অবশ্যই তাওবা কবুল করিব। ইরশাদ হইয়াছে–

وَ هُوَ الَّذِىْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَ يَعْفُوْ عَنِ السَّيِّئَاتِ *

আর তিনিই তো আপন বান্দাদের তাওবা কবুল করিয়া থাকেন এবং পাপ সমূহ ক্ষমা করেন

وَ اِنِّىْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى *

আর নিঃসন্দেহে আমি তাহাদের জন্য অতি ক্ষমাশীল যাহারা তাওবা করে এবং ঈমান আনয়ন করে এবং নেক আমল করে। অতঃপর সৎপথে স্থির থাকে।

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ، اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ *

আপনি বলুন। হে আমার বান্দাগণ! যাহারা (আল্লাহর নাফরমানি করতঃ) নিজেদের উপর জুলুম করিয়াছ, তোমরা আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ হইও না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সমস্ত গোনহ মাফ করিবেন। কেননা তিনি বড়ই ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু।

এক হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ পাক বলেন–

يا ابن آدم: انك ما دعوتنى و رجوتنى غفرت لك على ما كان فيك و لا ابالى، يا ابن آدم: لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك و لا ابالى، يا ابن آدم: لو اتيتنى بقراب الارض خطايا ثم لقيتنى لا تشرك بى شيئا لا تيتك بقرابها مغفرة *

হে আদম সন্তান! যতক্ষণ তুমি আমাকে ডাকিতে থাকিবে এবং আমার নিকট আশা করিতে থাকিবে ততক্ষণ আমি তোমাকে ক্ষমা করিতে থাকিব। তোমার গোনাহ পরিমাণে যতই হউক আমি পরোয়া করিব না।

হে আদম সন্তান! তোমার গোনাহ যদি (পরিমাণে বাড়িয়া) আসমানের উচ্চতাকেও স্পর্শ করে। অতঃপর তুমি আমার নিকট মাগফিরাত প্রার্থনা কর, তবে আমি তোমাকে মাফ করিয়া দিব। কোন পরোয়া করিব না।

হে আদম সন্তান! তুমি যদি পৃথিবীর সমপরিমাণ গোনাহ করিয়াও আমার নিকট আস এবং এই অবস্থায় আমার সহিত সাক্ষাৎ কর যে কোন কিছুকে আমার সহিত শরীক কর নাই তবে আমিও তোমার সামনে ঐ পরিমাণ মাগফিরাত হাযির করিব।

জনৈক তত্ত্বজ্ঞানী বড় সুন্দর কথা বলিয়াছেন, পৃথিবীর শত শত কোটি মানুষের মলমূত্র ও নাজাসাত প্রতি মুহূর্তে বিভিন্ন নর্দমার মাধ্যমে সমুদ্রের বুকে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। কিন্তু সমুদ্র উহাকে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতেছে যে, বুঝিবারও কোন উপায় নাই। ভাবিয়া দেখুন! আল্লাহর সৃষ্টি এই মহাবিশ্বজগতের তুলনায় সমুদ্রের কিইবা অস্তিত্ব রহিয়াছে! সামান্য এক সমুদ্রের মাঝে যদি শত শত কোটি মানুষের গলিজ নাজাসাত মুহূর্তের মধ্যে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবার এমন ক্ষমতা থাকে তবে আল্লাহ পাকের রহমতের অকূল দরিয়া কি আমাদের গোনাহ খাতাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে পারিবে না!

এই জন্যই তো আল্লাহর পেয়ারা নবী আমাদিগকে দু'আ শিক্ষা দিয়াছেন–

اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا و رحمتك ارجى عندنا من عملنا *

হে আল্লাহ! আপনার মাগফিরাত আমাদের যাবতীয় গোনাহ হইতে অধিক প্রশস্ত এবং আপনার রহমত আমাদের নিকট আমাদের আমল হইতে অধিক ভরসার পাত্র।

তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ পাক তাওবাতুন-নাছূহার আদেশ করিয়াছেন।

তাওবাতুন-নাছূহ সম্পর্কে পূর্ববর্তীগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা বলিয়াছেন। সবগুলির সারমর্ম অবশ্য অভিন্ন।

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব ও উবাই ইবনে কা'আব (রাঃ) বলিয়াছেন–

التوبة النصوح ان يتوب من الذنب ثم لا يعود اليه كما لا يعود اللبن الى الضرع *

তাওবাতুন-নাছূহ অর্থ কোন গোনাহ হইতে তাওবা করিবার পর কখনো ঐ গোনাহের দিকে প্রত্যাবর্তন করিবে না। যেমন দুধ ওলানে প্রত্যাবর্তন করে না।

কালবী (রহঃ) বলেন, তাওবাতুন-নাছূহ অর্থ মুখে ইস্তিগফার করিবে। অন্তরে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হইবে এবং দেহসত্তাকে সংযত করিবে।

শারহুল মানাযিল কিতাবে আল্লামা যারঈ (রহঃ) বলেন, তিনটি বিষয়ের সমন্বয় হইল তাওবাতুন-নাছূহ। প্রথমতঃ জীবনের সমস্ত গোনাহ হইতে তাওবা করা। দ্বিতীয়তঃ পূর্ণ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা এবং ভবিষ্যতে আর কোন গোনাহ না করিবার ব্যাপারে দ্বিধাহীন চিত্ত হওয়া। তৃতীয়তঃ নিয়তকে খালিছ করা। অর্থাৎ শুধু আল্লাহর আযাবের ভয় এবং পুরস্কারের আশায় তাওবা করা। মর্যাদা, সুনাম ও স্বার্থচিন্তা কিংবা লোকনিন্দার ভয়ে তাওবা না করা। কেননা তখন তাওবা আল্লাহর জন্য খালিছ হইবে না।

তাওবার জন্য যে সকল শর্ত আলিমগণ উল্লেখ করিয়াছেন উহা নিম্নোক্ত আয়াত হইতে

প্রমাণিত হয়।

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوا وَ اَصْلَحُوْا وَ بَيَّنُوْا *

তবে যাহারা তাওবা করে এবং সংশোধন করে এবং প্রকাশ করে।

রূহুল মা'আনীতে ইহার তাফসীর প্রসংগে বলা হইয়াছে–

অর্থাৎ তাহাদের দ্বারা আল্লাহর বান্দার যে হক নষ্ট হইয়াছে উহা সংশোধন করিতে হইবে। অর্থাৎ হকদারকে তাহার হক ফিরাইয়া দিতে হইবে। কথার মাধ্যমে বা লেখার মাধ্যমে মানুষের মাঝে যেইভাবে গোমরাহী ছড়ানো হইয়াছে ঐভাবে গোমরাহী হইতে তাওবার ঘোষণা দিতে হইবে।

শুধু মুখে 'তাওবা' বলিলে হইবে না। বরং اصلحوا নিজের অবস্থার ইছলাহ বা সংশোধনও করিতে হইবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে খাঁটি তাওবা করিবার তাওফীক দান করুন। আমীন।

হাদীছসমূহ

১৪। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাওবা ইস্তিগফার

وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «وَاللهِ اِنِّي لَاَسْتَغْفِرُ اللهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ فِيْ الْيَوْمِ اَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, আমি দিনে সত্তর বারেরও বেশী আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাঁহার নিকট তাওবা করি। (বুখারী শরীফ)

১৫। বারংবার তাওবা করা কর্তব্য

وَعَنِ الْاَغَرِّ بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يَا اَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوا اِلَى اللهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ فَاِنِّيْ اَتُوْبُ فِيْ الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

হযরত আগার বিন ইয়াসার মুযানী (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, হে লোক সকল! আল্লাহর নিকট তাওবা কর এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। কেননা আমি দিনে একশতবার তাওবা করি।

(মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

(তাওবা করি) অর্থাৎ যে তাওবা ও ইস্তিগফার তাঁহার নিষ্পাপ গুণের শান উপযোগী। তাঁহার তাওবা ও ইস্তিগফারের কারণ ছিলো এই যে, প্রতি মুহূর্তে আধ্যাত্মিক জগতে তাঁহার তরক্কী ও উন্নতি হইতে থাকিত। সুতরাং উর্ধ্বতর স্তরে উপনীত হইয়া পূর্ববর্তী স্তরকে তিনি আপন আবদিয়াত ও বন্দেগীর ত্রুটি মনে করিয়া তাওবা ইস্তিগফার করিতেন। অর্থাৎ তাঁহার

তাওবা ও ইস্তিগফার গোনাহের কারণে ছিল না। এই অনুভূতির কারণে ছিল যে, আল্লাহর জালাল ও কামালের শান মুতাবিক আবদিয়াত ও বন্দেগী আদায় করিতে তিনি অক্ষম। বস্তুতঃ এই অনুভূতি তাঁহার পরম পূর্ণতারই পরিচায়ক।

আরেকটি কারণ হইল উম্মতকে তাওবা ইস্তিগফারের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। কেননা তিনি নিষ্পাপ ও শ্রেষ্ঠ মানব হওয়া সত্ত্বেও যখন এতবার তাওবা ইস্তিগফার করিতেছেন তখন প্রতি মুহূর্তে গোনাহ হওয়া অবস্থায় আমাদের কত বেশী তাওবা ইস্তিগফার করা কর্তব্য হইতে পারে?

এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যাহার অন্তরে আল্লাহর মারিফাত যতবেশী উদ্ভাসিত হইবে, উর্ধ্বজগতের অনন্ত রহস্য যাহার সামনে যত বেশী উন্মোচিত হইবে এবং আপন আবদিয়াতের হাকীকত যাহার সামনে যত বেশী প্রকাশিত হইবে ইবাদত ও বন্দেগীর ক্ষেত্রে নিজেকে তিনি তত বেশী অসম্পূর্ণ ও অপরাধী মনে করিবেন এবং নিজের অস্তিত্বের উপর লজ্জিত হইতে থাকিবেন। এই কারণেই হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিতেন, হায় আবু বকর! তুমি যদি ঘাস হইতে, বকরী তোমাকে খাইয়া ফেলিত। তুমি যদি লাকড়ী হইতে তোমাকে জ্বালাইয়া ফেলা হইত। হায়! তোমাকে যদি তোমার মা প্রসবই না করিত! অথচ হযরত আবু বকর (রাঃ) ছিলেন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, যাহাকে দুনিয়াতে জান্নাতের সুসংবাদ দান করা হইয়াছে এবং হযরত জিবরীল আমীনের মাধ্যমে স্বয়ং আল্লাহ পাক তাঁহাকে সালাম পাঠাইয়াছেন। সেই ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহার মত ক্রন্দনকারী কেহ ছিল না।

যুগে যুগে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের এমনই ছিল অবস্থা। প্রতি মুহূর্তে নিজেদিগকে তাহারা আল্লাহ পাকের শাহী দরবারে অপরাধী মনে করিতেন এবং তাওবা ইস্তিগফার করিতে থাকিতেন। তাই জনৈক তত্ত্বজ্ঞানী বলিয়াছেন, অজ্ঞতা তৃপ্তি আনে। আর তৃপ্তি গোমরাহীতে নিক্ষেপ করে। পক্ষান্তরে জ্ঞান ভীতি আনয়ন করে আর ভীতি, তাওবা ও ইস্তিগফারে উদ্বুদ্ধ করে। সেই জ্ঞান ও ভীতির কিছু অংশ আল্লাহ আমাদের মত কমিনা ও নিকম্মাদিগকেও দান করুন। আমীন।

হাদীছের শিক্ষা ঃ যখনই কোন গোনাহ হইবে তখনই আল্লাহর রহমতের কথা স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত মনে তাওবা করা উচিত।

১৬। বান্দার তাওবা দ্বারা আল্লাহ খুশী হন

وَعَنْ اَبِيْ حَمْزَةَ اَنَسِ بْنِ مَالِكِ الْاَنْصَارِيِّ خَادِمِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَلّٰهُ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهٖ مِنْ اَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلٰى بَعِيْرِهٖ وَقَدْ اَضَلَّهٗ فِيْ اَرْضٍ فَلَاةٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «لَلّٰهُ اَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهٖ حِيْنَ يَتُوْبُ اِلَيْهِ مِنْ اَحَدِكُمْ كَانَ عَلٰى رَاحِلَتِهٖ بِاَرْضٍ فَلَاةٍ، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهٗ وَشَرَابُهٗ فَاَيِسَ مِنْهَا، فَاَتٰى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِيْ ظِلِّهَا، وَقَدْ اَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهٖ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ اِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهٗ، فَاَخَذَ بِخِطَامِهَا

ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ : اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عَبْدِيْ وَاَنَا رَبُّكَ، اَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ »

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেম আবু হামযাহ হযরত আনাস বিন মালিক আনসারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তাঁহার বান্দার তাওবা দ্বারা তোমাদের ঐ ব্যক্তির চাইতে বেশী খুশী হন, যে বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে তাহার বাহন উটটি হারাইয়া ফেলিবার পর হঠাৎ করিয়া পাইয়া যায়। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

মুসলিম শরীফের বর্ণনায় আছে, কোন বান্দা যখন তাওবা করে তখন আল্লাহ তাহার তাওবা দ্বারা তোমাদের ঐ ব্যক্তির চাইতে বেশী খুশী হন যে বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে তাহার বাহনের উপর ছিল। পরে তাহা তাহার হাতছাড়া হইয়া গেল। তাহাতে তাহার খাবার ও পানি ছিল। তখন সে বাহনের ব্যাপারে নিরাশ হইয়া এক গাছের ছায়ায় শুইয়া পড়িল। (এবং মওতের জন্য প্রস্তুত হইয়া গেল।) সে যখন এই নৈরাশ্যের অবস্থায় ছিল তখন হঠাৎ দেখে যে, তাহার সওয়ারি তাহার নিকটে দাঁড়াইয়া আছে। তখন সে সওয়ারির লাগাম ধরিয়া আনন্দের আতিশয্যে বলিয়া উঠিল, হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা এবং আমি তোমার মনিব। আনন্দের আতিশয্যে সে এইরূপ ভুল বলিয়া ফেলিল।

ফায়দা ঃ

(বেশী খুশী হন) আল্লাহ পাক নিরাকার। তাঁহার হাকীকত ও সত্ত্বা ক্ষুদ্র মানবীয় বোধ ও বুদ্ধির উর্ধ্বে। সুতরাং ক্রোধ, আনন্দ, হাসি, খুশি ইত্যাদি ক্ষুদ্র মানবীয় গুণাবলী হইতে তিনি চিরপবিত্র। সুতরাং এখানে আল্লাহর খুশী হইবার অর্থ বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া। বান্দার আনন্দ ও খুশির সহিত আল্লাহর সন্তুষ্টিকে উপমা দিবার উদ্দেশ্য হইল বান্দার সীমাবদ্ধ যেহেনে বিষয়টিকে বোধগম্য ও পরিষ্কার করা।

(তাহাতে তাহার খাবার ও পানি ছিল।) অর্থাৎ দুই দিক হইতে বাহনটি তাহার প্রয়োজন ছিল। প্রথমতঃ সামগ্রিকভাবে জীবন রক্ষার উদ্দেশ্যে মরুভূমি হইতে বাহির হইবার জন্য বাহন হিসাবে প্রয়োজন ছিল। দ্বিতীয়তঃ খাদ্য ও পানীয় দ্বারা তাৎক্ষণিক জীবন রক্ষার জন্যও বাহনটির প্রয়োজন ছিল।

(গাছের ছায়ায় শুইয়া পড়িল।) মরুভূমিতে বাহন তালাশ করিবার কারণে সে ক্লান্ত ছিল এবং ক্ষুধা-পিপাসার কারণে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল ইহাছাড়া মৃত্যুর বাহ্যিক আসবাব জমা হইবার কারণে মৃত্যু সম্পর্কে সে নিশ্চিত ছিল। এই অবস্থায় আল্লাহর সহিত যাহাদের সম্পর্ক নাই বরং দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জিন্দেগীর লোভ লালসার নিগড়ে যাহারা আবদ্ধ তাহারা অস্থির হইয়া পড়ে এবং দিশাহারা হইয়া অস্বাভাবিক আচরণ শুরু করে। কিন্তু আল্লাহর সহিত যাহাদের সম্পর্ক আছে এবং আখিরাতের অনন্ত জীবনের প্রতি বিশ্বাস ও আকাঙ্ক্ষা যাহাদের অন্তরে আছে তাহারা নিশ্চিত মৃত্যুর মুখেও বিচলিত হয় না। বরং প্রশান্ত চিত্তে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়। মরুভূমিতে বাহনহারা বিপদগ্রস্ত লোকটি দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত ছিল বিধায় প্রশান্ত চিত্তে মৃত্যুকে আলিংগন করিবার জন্য গাছের নীচে গিয়া শুইয়া পড়িল।

(হঠাৎ দেখে যে, তাহার সওয়ারি) এখানে এই ইংগিত পাওয়া যায় যে, সংকট ও দুর্যোগ

চরমে পৌঁছিবার পরই আল্লাহর গায়বী মদদ আসে এবং এই দিকেও ইংগিত যে, সমস্ত আসবাব যখন বান্দার হাতছাড়া হইয়া যায় এবং বান্দা নিজেকে আল্লাহর রহমের উপর ছাড়িয়া দেয় তখনই আল্লাহর পক্ষ হইতে গায়বি মদদ শুরু হয়।

একই ধরনের মযমুন অন্যান্য হাদীছেও বর্ণিত হইয়াছে। আল্লামা ছুয়ূতী (রহঃ) الجامع الصغير কিতাবে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

الله يفرح بتوبة التائب من الظمآن الوارد، و من العقيم الوالد و من الضال الواجد. فمن تاب توبة نصوحا انسى الله حفظة و جوارحه و بقاع الارض كلها خطاياه و ذنوبه *

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাওবাকারীর তাওবা দ্বারা জলাশয়ে উপনীত পিপাসার্তের চাইতে বেশী এবং সন্তান লাভকারী বন্ধ্যা ব্যক্তির চাইতে বেশী এবং হারানো বস্তু প্রাপ্ত ব্যক্তির চাইতে বেশী খুশী হন। সুতরাং যে তাওবাতুন-নাছুহ করে আল্লাহ পাক তাহার হিসাব সংরক্ষণকারী ফিরিশতাগণকে এবং (গোনাহের সহিত জড়িত) তাহার অংগ প্রত্যংগকে এবং ভূখণ্ডের সকল অঞ্চলকে (যেখানে সে গোনাহ করিয়াছে) তাহার পাপ ও গোনাহসমূহ ভুলাইয়া দেন।

হাদীছের শিক্ষা ঃ বান্দা যত পাপ করিয়া থাকুক না কেন, আল্লাহ পাক তাহার অনুতপ্ত মনের খাঁটি তাওবা দ্বারা খুশী হন এবং মাফ করিয়া দেন।

১৭। দিনে-রাত্রে আল্লাহ্ তাওবা কবুল করেন

وَعَنْ اَبِي مُوْسٰى عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ الْاَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اِنَّ اللهَ تَعَالٰى يَبْسُطُ يَدَهٗ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهٗ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবু মুসা আশ'আরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা রাত্রে তাঁহার হস্ত প্রসারিত করেন, যেন দিনে গোনাহকারীরা তাওবা করিয়া লয় এবং দিনে তাঁহার হস্ত প্রসারিত করেন, যেন রাত্রে গোনাহকারীরা তাওবা করিয়া লয়। (এইরূপ চলিতে থাকিবে) যতদিন না সূর্য অস্ত যাইবার দিক হইতে উদিত হয়।

ফায়দা ঃ

হস্ত প্রসারিত করিবার অর্থ বান্দার কাছে তাওবা তলব করা। কেননা অভ্যাস এই যে, মানুষ যখন কিছু পাইতে চায় বা তলব করে তখন সেই কাম্য বস্তুর দিকে হাত বাড়াইয়া দেয়। কিংবা ইহার অর্থ তাওবা কবুল করিবার ইংগিত করা। কেননা আরবের লোকেরা কোন কিছুর প্রতি সন্তুষ্ট হইলে উহা গ্রহণ করিবার জন্য হস্ত প্রসারিত করে। আর অসন্তুষ্ট হইলে উহা হইতে হাত গুটাইয়া লয়।

হাদীছের দুইটি ব্যাখ্যা ওলামায়ে কেরাম করিয়াছেন, প্রথমতঃ আল্লাহ প্রতিরাত্রে হস্ত প্রসারিত করেন গতদিনের গোনাহকারীদের তাওবা কবুল করিবার জন্য। তদ্রূপ দিনে হস্ত প্রসারিত করেন গতরাত্রের গোনাহকারীদের তাওবা কবুল করিবার জন্য।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এই যে, আল্লাহ পাক রাত্র হইতেই দিনের পাপীদের প্রতি আপন দান ও অনুগ্রহের বিস্তার ঘটান যাহাতে তাহারা দিনে তাওবা করিবার তাওফিক লাভ করে। আবার দিনেই রাত্রের পাপীদের প্রতি আপন দান ও অনুগ্রহের বিস্তার ঘটান যাহাতে রাত্রে তাহারা তাওবার তাওফীক লাভ করে। এইভাবে পাপীদের উপর পূর্ব হইতে বিস্তারকৃত অনুগ্রহের কারণেই তাহারা পরবর্তীতে তাওবা করিবার অনুপ্রেরণা লাভ করে এবং তাওবা করে।

(হস্ত প্রসারিত করেন) يد বা আল্লাহর হস্তের কি অর্থ? তদ্রূপ وجه (চেহারা) رجل (পা) ইত্যাদি শব্দ আল্লাহর শানে ব্যবহৃত হইয়াছে। তদ্রূপ কোরআন শরীফে আসিয়াছে اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى (রহমান আরশে অধিষ্ঠিত হইলেন।) ইহারই বা কি অর্থ? এই সম্পর্কে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের উত্তর এই যে, আল্লাহর সত্তা নিরাকার। মানব জ্ঞান আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীর স্বরূপ পূর্ণ রূপে বুঝিতে অক্ষম। সুতরাং এই সম্পর্কিত প্রশ্নের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হওয়া অর্থহীন। এমন কি গোমরাহীর আশংকাপূর্ণ। সুতরাং এই সম্পর্কে সংক্ষেপে এইরূপ বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত যে, এইগুলি দ্বারা আল্লাহ পাকের যাহা উদ্দিষ্ট তাহাই হক ও সত্য। অতঃপর নিজেদের পক্ষ হইতে কোন ব্যাখ্যা বা অর্থ উদ্ভাবনের চিন্তা করাও অন্যায়।

হযরত ইমাম মালিক (রহঃ)-কে কেহ اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى এর অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি অবনত মস্তকে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, ইহার বাহ্যিক অর্থ তো জানাই আছে। কিন্তু ইহার অবস্থা ও স্বরূপ মানব বুদ্ধি অনুধাবন করিতে পারে না। সুতরাং ইহা (দ্বারা আল্লাহর যাহা উদ্দেশ্য তাহা)তেই বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব। স্বরূপ জানিতে চাওয়া বিদআত। কেননা ছাহাবা কেরাম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই ধরনের প্রশ্ন করেন নাই।

আকাবিরীনে আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আত তথা সুফয়ান ছাওরী, ইমাম আওযা'য়ী, লাঈছ বিন সাআদ, সুফয়ান বিন ওয়াইনাহ, আব্দুল্লাহ বিন মোবারক প্রমুখ বলিয়াছেন, আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কিত আয়াতগুলি কোনরূপ ব্যাখ্যা ছাড়া যেই অবস্থায় আছে সেই অবস্থাতেই বিশ্বাস করা উচিত। –তাফসীরে মাযহারী।

বস্তুতঃ আকল ও বুদ্ধি এবং জ্ঞান ও যুক্তিরও দাবী ইহাই। কেননা মানবজাতি তাহার সম্মিলিত মেধা ও বুদ্ধি ব্যবহার করিয়াও কি আজ পর্যন্ত মহাবিশ্বজগতের অপার রহস্যের কোন কূল কিনারা করিতে পারিয়াছে? না কি কিয়ামত পর্যন্ত পারিবে! প্রতিদিনই তো তাহাকে বিশ্বজগতের বিভিন্ন রহস্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিতে হইতেছে।

এমতাবস্থায় কি করিয়া সে হিম্মত করে স্বয়ং স্রষ্টার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করিবার? এই জন্যই হাদীছ শরীফে সতর্কবাণী আসিয়াছে–

تفكروا فى خلق الله و لا تفكروا فى الله *

আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা কর। আল্লাহ সম্পর্কে চিন্তা করিও না।

(সূর্য অস্ত যাইবার দিক হইতে উদিত হয়) কেয়ামতের পূর্বে সূর্য অস্ত যাইবার দিক হইতে উদিত হইয়া মধ্যাকাশ পর্যন্ত পৌঁছিবে। অতঃপর স্বাভাবিক অস্তাচলের দিকে ফিরিয়া আসিবে এবং অস্ত যাইবে। এই নিদর্শন প্রকাশ পাইবার পর তাওবার দরওয়াজা বন্ধ হইয়া

যাইবে। এই দিকে ইংগিত করিয়াই আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا *

যে দিন আপনার প্রতিপালকের কোন কোন নিদর্শন প্রকাশ পাইবে সেই দিন ঐ ব্যক্তির ঈমান কোন কাজে আসিবে না যে পূর্ব হইতে ঈমানদার ছিল না। কিংবা (ঈমানদার তো ছিল। কিন্তু) আপন ঈমানের গণ্ডিতে সে কোন নেক কাজ করে নাই।

তাওবা কবুলের শেষ সীমা দুইটি। একটি হইল সমগ্র মানবজাতির জন্য। এই হাদীছে এবং পরবর্তী হাদীছে উহাই বর্ণনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয়টি হইল প্রত্যেক মানুষের নিজের জন্য। উহা সামনের হাদীছে বলা হইয়াছে।

১৮। তাওবা কবুলের শেষ সময়

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللهُ عَلَيْهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সূর্য অস্ত যাইবার দিক হইতে সূর্যের উদয় হইবার পূর্বে তাওবা করিবে তাহার তাওবা আল্লাহ কবুল করিবেন। (মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

এই নিদর্শন আত্মপ্রকাশ করিবার দিন হইতে তাওবার দরওয়াজা বন্ধ হইয়া যাইবে। প্রশ্ন হইল, তাওবার দরওয়াজা বন্ধ হইবার এই বিধান কি সূর্যোদয়ের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের জন্য সাধারণ নাকি শুধু পূর্ববর্তীদের সহিত খাছ? (কেননা তাহারা তাওবা বিলম্বিত করিবার অপরাধে অপরাধী। পক্ষান্তরে পরবর্তীরা সেই অপরাধে অপরাধী নহে) এই বিষয়ে গবেষক আলিমগণ দ্বিধান্বিত। নিশ্চিত করিয়া কোন কিছু বলিতে পারেন নাই। আল্লাহ পাকই তাঁহার শান সম্পর্কে পূর্ণ অবগত।

(তাওবা কবুল করিবেন) আল্লামা নববী (রহঃ) বলেন, তাওবার যাবতীয় শর্ত পাওয়া যাইবার পরও আল্লাহ তা'আলার উপর বান্দার তওবা কবুল করা আকল ও যুক্তির নিরিখে জরুরী নহে। তবে আল্লাহ পাক দয়া ও অনুগ্রহ করিয়া কবুল করিবেন। শরীয়তের বাণী ও ইজমা দ্বারা এই কবুলিয়াতের কথা আমরা জানিতে পারিয়াছি।

১৯। মৃত্যু–যন্ত্রণার পূর্ব পর্যন্ত তাওবা সম্ভব

وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ পাক মৃত্যুর গরগরা শুরু হইবার পূর্ব

পর্যন্ত বান্দার তাওবা কবুল করেন। (তিরমিযি শরীফ)

ফায়দা ঃ

গরগরা শুরু হইবার অর্থ রূহ বাহির হইবার জন্য কণ্ঠনালীতে আসিয়া যাওয়া। কোরআন শরীফে ইরশাদ হইয়াছে–

وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ حَتّٰى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتَ قَالَ اِنِّىْ تُبْتُ الْاٰنَ *

তাওবা তাহাদের জন্য নহে যাহারা মন্দ কাজ করিতে থাকে। এমন কি যখন মৃত্যু তাহাদের কাহারও সামনে উপস্থিত হয় তখন সে বলে, আমি এখন তাওবা করিলাম।

মৃত্যু উপস্থিত হইবার অর্থ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, মৃত্যুর ফিরিশতাকে দেখিতে পাওয়া। অন্যরা বলিয়াছেন, ইহার অর্থ মৃত্যু নিশ্চিত হইয়া যাওয়া। মৃত্যুর ফিরিশতা দেখুক বা না দেখুক। অর্থাৎ এমন অবস্থায় পৌঁছিয়া যাওয়া যাহার পর প্রাণের অস্তিত্ব বজায় থাকা সম্ভব নহে। হাদীছের 'গরগরা' শব্দেরও ইহাই অর্থ। এই অবস্থায় উপনীত হইবার পূর্বে বান্দা তাওবা করিলে তাহার তাওবা কবুল হইবে।

গরগরা শুরু হইবার পর তাওবা কবুল না হইবার কারণ এই যে, তাওবার অন্যতম শর্ত হইল ভবিষ্যতে এই গোনাহ পুনরায় না করিবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা। বলাবাহুল্য যে, ইহা তখনই সম্ভব হইবে যখন তাওবাকারী গোনাহ করিতে সক্ষম থাকিবে। অথচ এখন তাহার সক্ষমতার অবস্থা নাই। ইহাছাড়া ঈমান ও আমলের সম্পর্ক হইল গায়বের সহিত। অথচ গরগরা শুরু হইবার পর তাহার অন্তর্চক্ষু হইতে পর্দা সরিয়া যায় এবং সকল গায়বি বিষয় সে প্রত্যক্ষ করিতে থাকে। ফলে ঈমান বিল গায়বের সুযোগ তাহার থাকে না। সুতরাং ঐ সময়ের তাওবা অর্থহীন হইয়া যায়।

ফির'আউন এমন সময় ঈমান আনিয়াছিল। কিন্তু তাহার ঈমান প্রত্যাখ্যান করিয়া আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন–

اٰلْاٰنَ وَ قَدْ عَصَيْتَ مِنْ قَبْلُ *

এখন! অথচ ইতিপূর্বে তুমি নাফরমানি করিয়াছ।

হাদীছের শিক্ষা ঃ এই সকল হাদীছে মুসলমানদিগকে তাওবার দরওয়াজা বন্ধ হইয়া যাইবার পূর্বে তাওবা করিতে উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে।

২০। তাওবার দরওয়াজার অর্থ

وَعَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: اَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ يَا زِرُّ؟ فَقُلْتُ: ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ ، فَقَالَ: اِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ اَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًى بِمَا يَطْلُبُ، فَقُلْتُ: اِنَّهُ قَدْ حَكَّ فِيْ صَدْرِيْ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ ، وَكُنْتَ امْرَءًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَجِئْتُ اَسْأَلُكَ: هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ فِيْ ذٰلِكَ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، كَانَ يَأْمُرُنَا اِذَا كُنَّا سَفْرًا - اَوْ مُسَافِرِيْنَ - اَنْ

لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ اِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، لٰكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ . فَقُلْتُ: هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ فِي الْهَوٰى شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ إِذْ نَادَاهُ اَعْرَابِيٌّ بِصَوْتٍ لَهُ جَهْوَرِيٍّ : يَا مُحَمَّدُ، فَاَجَابَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ نَحْوًا مِنْ صَوْتِهِ: «هَاؤُمُ» ، فَقُلْتُ لَهُ: وَيْحَكَ اُغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ فَاِنَّكَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَدْ نُهِيتَ عَنْ هٰذَا! فَقَالَ: وَاللهِ لَا اَغْضُضُ. قَالَ الْاَعْرَابِيُّ: اَلْمَرْءُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» فَمَا زَالَ يُحَدِّثُنَا حَتّٰى ذَكَرَ بَابًا مِنَ الْمَغْرِبِ مَسِيْرَةُ عَرْضِهِ اَوْ يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِيْ عَرْضِهِ اَرْبَعِيْنَ اَوْ سَبْعِيْنَ عَامًا. قَالَ سُفْيَانُ اَحَدُ الرُّوَاةِ. قِبَلَ الشَّامِ خَلَقَهُ اللهُ تَعَالٰى يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ مَفْتُوْحًا لِلتَّوْبَةِ لَا يُغْلَقُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْهُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

হযরত যির্‌র ইবনে হোবায়শ (রহঃ) বলেন, আমি মোজার উপর মাসাহ্ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ছাফওয়ান বিন আস্‌সাল (রাঃ)-এর খিদমতে হাযির হইলাম। তিনি বলিলেন, হে যির্‌র! কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছ? আমি বলিলাম, ইলম হাছিল করিবার জন্য আসিয়াছি। তিনি বলিলেন, ইলম সন্ধানকারীর ইলম সন্ধানের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া ফিরিশতাগণ তাহার জন্য তাহাদের ডানা বিছাইয়া দেন। আমি বলিলাম, পেশাব পায়খানার পর মোজার উপর মাসাহ্ করিবার বিষয়টি আমার মনে খটকা সৃষ্টি করিতেছে। আপনি তো নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছাহাবী ছিলেন। তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি। আপনি কি তাঁহাকে এই বিষয়ে কিছু বলিতে শুনিয়াছেন?

তিনি বলিলেন, যখন আমরা সফরে থাকিতাম তখন তিনি আমাদিগকে হুকুম দিতেন যেন আমরা তিনদিন ও তিনরাত্র পর্যন্ত পেশাব পায়খানা ও নিদ্রার পর আমাদের (চামড়ার) মোজা না খুলি। তবে 'জানাবাত' বা গোসল ফরয হইবার অবস্থা ছাড়া। (ঐ সময় খুলিয়া পা ধুইতে হইবে।)

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুহব্বত সম্পর্কে কিছু বলিতে শুনিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত কোন এক সফরে ছিলাম। আমরা তাঁহার নিকটে (বসা) ছিলাম। এমন সময় এক বেদুঈন তাহার স্বভাবসুলভ জোরদার আওয়াজে 'হে মুহম্মদ' বলিয়া ডাক দিল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহারই মতো (জোরদার) আওয়াজে সাড়া দিয়া বলিলেন, কি বলিতেছ? আমি (ছাফওয়ান) তাহাকে বলিলাম, আরে ভালমানুষ! স্বর নীচু কর। তুমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে আছ। আর তাঁহার সামনে জোরে কথা বলিবার ব্যাপারে (আল্লাহর পক্ষ হইতে) তোমাকে নিষেধ করা হইয়াছে।

বেদুঈন বলিল, আমি আওয়াজ নীচু করিব না। অতঃপর বেদুঈন বলিল, মানুষ (জীবিত বা মৃত) একদল লোককে (তাহাদের সততা ও ধার্মিকতার কারণে) ভালবাসে। কিন্তু (কর্মে ও গুণে) তাহাদের সমস্তরে পৌঁছিতে পারে না। (এই ভালবাসার কি মূল্য?)

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মানুষ যাহাকে ভালবাসে (কেয়ামতের দিন) তাহার সংগেই থাকিবে।

এইভাবে আলোচনার এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যাস্তের দিকে বিদ্যমান একটি দরওয়াজার কথা উল্লেখ করিলেন। উহার প্রশস্ততার দূরত্ব হইল একজন সওয়ারের চল্লিশ বা সত্তর বৎসরের পথ।

আল্লাহ পাক আসমান যমিন সৃষ্টি করিবার দিনই ঐ দরওয়াজা সৃষ্টি করিয়াছেন। তাওবার জন্য উহা খোলা রহিয়াছে। অস্ত যাইবার দিক হইতে সুর্যোদয় হইবার পূর্ব পর্যন্ত ঐ দরওয়াজা বন্ধ হইবে না।

(তিরমিযি ও অন্যান্য) ইমাম তিরমিযি (রহঃ) বলিয়াছেন হাদীছটি ছহী ও হাসান পর্যায়ের।

ফায়দা ঃ

(মোজার উপর) এই ধরণের চামড়ার মোজা শীতপ্রধান দেশে ব্যবহার করা হয়। আমাদের দেশেও সম্প্রতি ইহার প্রচলন শুরু হইয়াছে। ফিকাহর কিতাবে বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে ইহা পায়ে দিলে মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত্র এবং মুকীমের জন্য একদিন একরাত্র মাসাহ করিবার অনুমতি রহিয়াছে। অর্থাৎ ঐ সময়ের মধ্যে অযু করিলে তাহাকে মোজা খুলিয়া পা ধুইতে হইবে না। মোজার উপর মাসাহ করিলেই চলিবে। তবে গোসল ফরয হইলে মোজা খুলিয়া পায়ে পানি পৌঁছাইতে হইবে। মাসাহ চলিবে না।

মোজা সংক্রান্ত মাসায়েল প্রয়োজনে ফিকাহর কিতাবে দেখিয়া লওয়া কিংবা আলিমের নিকট হইতে জানিয়া লওয়া উচিত।

(ডানা বিছাইয়া দেন।) এখানে তালিবে ইলমের অত্যুচ্চ মর্যাদা ও ফযীলত প্রকাশ পাইতেছে। এই মর্যাদার কারণ এই যে, ইলম হইল শরীয়তের প্রাণ। ইলম ছাড়া আল্লাহর মারিফাত লাভ করা সম্ভব হয় না। তদ্রূপ ইলম ছাড়া শরীয়তের আহকামের উপর আমল করাও সম্ভব হয় না।

ফিরিশতাগণের ডানা বিছাইয়া দেওয়াকে প্রকৃত অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে। যদিও আমরা দেখিতে পাই না। কেননা শরীয়তের সর্বস্বীকৃত মূলনীতি এই যে, যে সকল অতীন্দ্রিয় বিষয় বর্ণিত হইয়াছে সেইগুলিকে বাহ্যিক ও প্রকৃত অর্থে গ্রহণ করা সম্ভব হইলে বাহ্যিক অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে। যতক্ষণ না বাস্তব অর্থের বিপরীত কোন কথা শরীয়তের পক্ষ হইতে বর্ণিত হয়। আর এই বিষয়ে শরীয়তে বিপরীত কিছু বর্ণিত হয় নাই।

অবশ্য কেহ কেহ ইহাকে রূপক অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ ফিরিশতাগণ তালিবে ইলমের সামনে বিনয় প্রকাশ করেন এবং তাহাকে সম্মান করেন কিংবা তাহাকে ইলম হাছিলের মেহনতে সাহায্য করেন।

এখানে ফিরিশতা দ্বারা রহমতের ফিরিশতা উদ্দেশ্য হইতে পারে। আবার সকল ফিরিশতাও হইতে পারে।

(হে মুহম্মদ বলিয়া ডাক দিল) অথচ এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا *

তোমরা একে অন্যকে যেমন নাম ধরিয়া ডাক রাসূলকেও সেইভাবে ডাকিও না। অর্থাৎ হে মুহম্মদ বলিয়া ডাকিও না। বরং ইয়া রাসূলাল্লাহ বা এই জাতীয় কোন গুণবাচক নামে ডাকিও।

সম্ভবতঃ ইহা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নাম ধরিয়া ডাকা নিষিদ্ধ হইবার পূর্বের ঘটনা। কিংবা তিনি দূর পল্লীর বাসিন্দা হইবার কারণে নিষেধের কথা জানিতে পারেন নাই।

এখান হইতে বোঝা যায় যে, নবীর ওয়ারিছ হিসাবে ওলামায়ে কেরাম ও বুজুর্গানে দ্বীনেরও নাম ধরিয়া ডাকা উচিত নহে। কোন গুণবাচক শব্দে ডাকা উচিত। (কুরতুবী)

(তোমাকে নিষেধ করা হইয়াছে) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান ও আদব রক্ষা করিবার জন্য মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ পাক কতিপয় আদেশ জারি করিয়াছেন। যেমন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ *

হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উচ্চ করিও না এবং তাঁহার সহিত উচ্চস্বরে কথা বলিও না, যেমন পরস্পরের সহিত উচ্চস্বরে তোমরা কথা বল। এই আশংকায় যে, তোমাদের আমল বরবাদ হইয়া যাইবে। অথচ তোমরা টেরও পাইবে না।

বর্ণিত আছে যে, এই আয়াত অবতরণের পর হযরত ওমর (রাঃ) এত আস্তে কথা বলিতেন যে, প্রায়শঃ পুনরায় কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইত। অন্যান্য ছাহাবা কেরামের অবস্থাও আমূল পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল।

কাজী আবু বকর ইবনুল আরাবী (রহঃ) বলেন, জীবদ্দশায় যেমন তেমনি ওয়াফাতের পরও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্মান ও আদব প্রদর্শন ওয়াজিব। সুতরাং তাঁহার রওযা'মুবারকের সামনে বেশী উচ্চস্বরে সালাম কালাম করা, তদ্রূপ হাদীছ আলোচনার মজলিসে হৈ চৈ করা আদবের খেলাফ। এমনকি নবীর ওয়ারিছ হিসাবে আলিমগণের মজলিসেও উচ্চস্বরে কথা বলা উচিত নহে।

(মানুষ যাহাকে ভালবাসে তাহার সংগেই থাকিবে) কেননা যে যাহাকে ভালবাসে সে তাহার ছূরত-ছীরত, আমল-আখলাক ও জীবনাদর্শ গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাই মানুষের ফিতরত ও স্বভাব। সুতরাং অভিন্ন আমলের কারণে তাহার সহিত তাহার হাশর হওয়াই স্বাভাবিক।

ইহাতে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি মুহব্বতের ফযীলত ও মর্যাদা প্রমাণিত হইতেছে। কেননা দুনিয়াতে যে ব্যক্তি (আল্লাহ ও তাঁহার) রাসূলকে ভালবাসিবে সে পরকালে (আল্লাহ ও তাঁহার) রাসূলের সান্নিধ্যে থাকিবার সৌভাগ্য লাভ করিবে। আর অনন্ত কালের জন্য আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের সান্নিধ্যসৌভাগ্যের চাইতে বড় সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে! এই কারণেই

মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে তিনি বলেন–

ما فرحنا بعد الاسلام فرحا اشد مما فرحنا بقول النبى صلى الله عليه و سلم المرء مع من احب *

ইসলাম গ্রহণের পর আর কখনও আমরা এত বেশী আনন্দিত হই নাই যত আনন্দিত হইয়াছি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী শ্রবণের পর যে, মানুষ তাহার সংগেই থাকিবে যাহাকে সে ভালবাসে।

আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) বলেন, সারা জীবনের সকল নেক আমলের মুকাবেলায় এই কথা শ্রবণের আনন্দ ছাহাবা কেরামের অধিক হইবার কারণ এই যে, আর কোন আমল সম্পর্কেই এই কথা বলা হয় নাই যে, উহা কেয়ামতে ও জান্নাতে তাঁহাদিগকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিরসান্নিধ্য আনিয়া দিবে। শুধু মুহব্বত সম্পর্কেই এই মহাসুসংবাদ দান করা হইয়াছে। আর নিজেদের অন্তর সম্পর্কে ছাহাবা কেরামের নিশ্চিত জানা ছিল যে, উহাতে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের মুহব্বত ছাড়া অন্য কিছু নাই। কেননা তাঁহাকে তাঁহারা আপন জান-মাল ও সন্তান-সন্ততির চাইতেও অধিক ভালবাসিতেন, যাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ সীরাতের কিতাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। ফলে তাঁহাদের অন্তরে এই আশা হইয়াছিল যে, দুনিয়ার জীবনের মত আখিরাতেও তাঁহারা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যেই থাকিতে পারিবেন।

তাই উপরোক্ত বর্ণনায় হযরত আনাস (রাঃ) আরও বলিয়াছিলেন–

انا احب الله و رسوله صلى الله عليه و سلم و ابا بكر و عمر، فارجو ان اكون معهم و ان لم اعمل بعملهم *

আমি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে ভালবাসি এবং আবু বকর ও ওমরকে ভালবাসি। সুতরাং আশা করি যে, আমি তাঁহাদের সংগেই থাকিব। যদিও তাঁহাদের ন্যায় আমল করিতে পারি নাই।

হযরত আনাস (রাঃ) المرء مع من احب এর যেই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন উহা নবীজীর প্রতি মুহব্বত পোষণকারী প্রত্যেক মুমিন মুসলমানকেই অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং যত দুর্ভাগা ও বেআমলই হই না কেন এবং যতই অযোগ্যতাই থাকুক না কেন আল্লাহর অসীম রহমতের ভরসায় আমরাও এই মহানেয়ামত-সৌভাগ্য লাভের আশা রাখি। وَمَا ذٰلِكَ عَلَي اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ (আল্লাহর পক্ষে ইহা কঠিন কিছু নহে।)

মনে রাখিতে হইবে যে, মুহব্বত শুধু মুখের দাবীর নাম নহে। আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি মুহব্বতের সর্বোত্তম প্রমাণ এই যে, আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের সুন্নতের উপর পূর্ণ আমল মানুষের জিন্দেগীতে আসিবে। মুহব্বতের দাবী তো এই যে, জান চলিয়া যাওয়া পছন্দ হইবে কিন্তু নবীর সুন্নত ছুটিয়া যাওয়া বরদাশ্‌ত হইবে না। প্রিয় রাসূলের শানে সামান্যতম বেআদবিও সহ্য হইবে না। এমন পরিপূর্ণ মুহব্বত হাছিলের তাওফীক আল্লাহ আমাদিগকে দান করুন। আমীন।

আলোচ্য হাদীছে নেককার মুমিন মুসলমানদের প্রতি মহাসুসংবাদ যেমন রহিয়াছে তেমনি তাহাদের প্রতি রহিয়াছে চরম হুঁশিয়ারি যাহারা নামে মুসলমান হইয়াও কাফির মুশরিকদের

তরয-তরীকা ও জীবনধারা পছন্দ করে এবং তাহাদের মত জীবন-যাপন করিয়া থাকে। কেননা এই হাদীছ মতে তাহাদের হাশর ঐ লোকদের সংগেই হইবার সমূহ আশংকা রহিয়াছে। আল্লাহ আমাদের সকলকে হিফাযত করুন। আমীন।

একটি বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখা কর্তব্য যে, একজন সাধারণ বেদুঈন ছাহাবীও কত নিগূঢ় তত্ত্বপূর্ণ প্রশ্ন করিলেন এবং তাঁহার প্রশ্নের বরকতে উম্মতের জন্য কত বড় সৌভাগ্যের দরওয়াজা খুলিয়া গেল। সুতরাং বোঝা গেল যে, উচ্চ হইতে উচ্চ এবং আদনা হইতে আদনা দরজার সকল ছাহাবীরই ইহসান ও অবদান রহিয়াছে পরবর্তী উম্মতের উপর। সুতরাং তাঁহাদের সকলের প্রতিই অখণ্ড ভক্তি শ্রদ্ধা পোষণ করা আমাদের কর্তব্য।

অবশ্য ইহা সত্য যে, ছাহাবা কেরাম নিষ্পাপ নহেন। মানবীয় দুর্বলতাবশতঃ দুই একটি গোনাহ তাঁহাদের দ্বারাও ঘটিতে পারে এবং দুই একজন ছাহাবীর জীবনে ঘটিয়াছেও। কিন্তু এমন কোন ছাহাবী নাই যিনি তাওবা করিয়া পবিত্র হন নাই। তাই رضى الله عنه و رضوا عنهم বলিয়া সর্বাবস্থায় তাঁহাদের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি ঘোষিত হইয়াছে। আর মাফ করা ব্যতীত সন্তুষ্টি হইতে পারে না।

আল্লামা কাজী আবু ইয়ালা (রহঃ) বলেন, সন্তুষ্টি আল্লাহ পাকের চিরন্তন গুণ। সুতরাং ইহা তিনি তাঁহাদের প্রতিই ঘোষণা করেন যাহাদের সম্পর্কে জানা আছে যে, সন্তুষ্টির কারণাদির উপরই তাঁহাদের ওয়াফাত হইবে।

(মুহব্বত সম্পর্কে) অর্থাৎ প্রেম ভালবাসা ও আকর্ষণ হইল মানব হৃদয়ের একটি বিশেষ অবস্থা। বিভিন্ন জিনিসের সহিত ইহা সম্পৃক্ত। ইহা সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম কি? কোন্ বস্তুর সহিত ভালবাসার সম্পর্ক করা কল্যাণকর আর কোন জিনিসের সহিত অকল্যাণকর। ইহা সম্পর্কে শরীয়তে কোন নির্দেশনা আছে কি না, জানিতে চাওয়া হইয়াছে।

(নীচু করিব না) অর্থাৎ আমি এমন এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লইয়া আসিয়াছি যাহাতে মৃদুস্বরে কথা বলা সম্ভব নহে। ইহা সহজ সরল বেদুঈনের নিজস্ব দৃষ্টিভংগী। তাহাদের স্বভাব শহরের তুলনায় কিছুটা রুক্ষ ও অপরিমার্জিত হইয়া থাকিত। কিন্তু নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের এই সকল আচরণ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতেই দেখিতেন। কেননা মনে তাহাদের কোন অশ্রদ্ধা ছিল না।

(দরওয়াজা) ইহার হাকীকত কি তাহা আল্লাহ পাকই ভাল জানেন। আমাদের কর্তব্য হইল আল্লাহর রাসূলের হাদীছ হিসাবে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া লওয়া।

হাদীছের শিক্ষা ঃ প্রত্যেক মুমিন মুসলমানের কর্তব্য হইল নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মুহব্বত পোষণ করা। আর মুহব্বতের দাবী হইল স্বীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁহার সুন্নত তরীকা অনুসরণ করিয়া চলা। তাহা হইলে আখিরাতে নবীজীর সান্নিধ্য-সৌভাগ্য লাভ হইবে।

২১। তাওবার ফযীলত

وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ : «كَانَ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ نَفْسًا ، فَسَاَلَ عَنْ اَعْلَمِ اَهْلِ الْاَرْضِ ، فَدُلَّ عَلٰى رَاهِبٍ ، فَاَتَاهُ فَقَالَ : اِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ نَفْسًا ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ : لَا ، فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً ، ثُمَّ سَاَلَ عَنْ اَعْلَمِ اَهْلِ الْاَرْضِ ، فَدُلَّ عَلٰى رَجُلٍ عَالِمٍ فَقَالَ : إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، وَمَنْ يَحُوْلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟ انْطَلِقْ اِلٰى اَرْضِ كَذَا وَكَذَا ، فَاِنَّ بِهَا اُنَاسًا يَعْبُدُوْنَ اللهَ تَعَالٰى فَاعْبُدِ اللهَ مَعَهُمْ ، وَلَا تَرْجِعْ اِلٰى اَرْضِكَ فَاِنَّهَا اَرْضُ سَوْءٍ ، فَانْطَلَقَ حَتّٰى اِذَا نَصَفَ الطَّرِيْقَ اَتَاهُ الْمَوْتُ ، فَاخْتَصَمَتْ فِيْهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ . فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ : جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللهِ تَعَالٰى ، وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ : إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ ، فَاَتَاهُمْ مَلَكٌ فِيْ صُوْرَةِ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوْهُ بَيْنَهُمْ ـ أَيْ حَكَمًا ـ فَقَالَ : قِيْسُوا مَا بَيْنَ الْاَرْضَيْنِ فَاِلٰى اَيَّتِهِمَا كَانَ اَدْنٰى فَهُوَ لَهُ ، فَقَاسُوْا فَوَجَدُوْهُ أَدْنٰى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِيْ أَرَادَ ، فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَفِيْ رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيْحِ : «فَكَانَ إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ ، فَجُعِلَ مِنْ أَهْلِهَا» ، وَفِيْ رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيْحِ : «فَأَوْحَى اللهُ تَعَالٰى إِلٰى هٰذِهِ أَنْ تَبَاعَدِيْ ، وَإِلٰى هٰذِهِ أَنْ تَقَرَّبِيْ ، وَقَالَ : قِيْسُوا مَا بَيْنَهُمَا ، فَوَجَدُوْهُ إِلٰى هٰذِهِ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ فَغُفِرَ لَهُ» . وَفِيْ رِوَايَةٍ : «فَنَأَى بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا» .

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের পূর্ববর্তীদের মাঝে একজন লোক ছিলো, যে নিরানব্বই জন মানুষ হত্যা করিয়াছিল। (হঠাৎ তাহার মনে অনুতাপ জাগিল। তাই তাওবার উপায় লাভ করিবার জন্য লোকদিগকে) সে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আলিম (ও ধর্মজ্ঞানী) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। তাহাকে এক সাধু ব্যক্তির ঠিকানা দেওয়া হইল। সে তাহার কাছে গিয়া জানাইল যে, সে নিরানব্বই জন মানুষ হত্যা করিয়াছে। এমতাবস্থায় তাহার জন্য তাওবার কোন পথ আছে কি না। সাধু বলিল, না, নাই। তখন সে ঐ সাধুকেও হত্যা করিয়া একশত পূর্ণ করিল। পুনরায় সে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আলিম ও জ্ঞানী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। তাহাকে এক আলিম ব্যক্তির ঠিকানা দেওয়া হইল। সে ঐ আলিমের কাছে গিয়া বলিল যে, সে একশত মানুষ হত্যা করিয়াছে। এমতাবস্থায় তাহার জন্য তাওবার কোন পথ আছে কি না। তিনি বলিলেন, হাঁ আছে। তাহার ও তাওবার মাঝে কোন্ জিনিস প্রতিবন্ধক হইতে পারে? তুমি অমুক স্থানে যাও। সেখানে কিছু মানুষ আল্লাহর ইবাদত করে। তুমিও তাহাদের সহিত আল্লাহর ইবাদত কর। অতঃপর তুমি তোমার এলাকায় আর ফিরিও না। কেননা উহা (তোমার জন্য) মন্দ স্থান।

সে (ঐ আলিমের উপদেশমত) রওয়ানা হইল। অর্ধেক পথ অতিক্রম করিবার পর

তাহার মৃত্যু উপস্থিত হইল। তখন তাহার ব্যাপারে রহমতের ফিরিশতা ও আযাবের ফিরিশতাগণের মাঝে ঝগড়া হইল। রহমতের ফিরিশতাগণ বলিলেন, সে তাওবা করিয়া এবং তাহার অন্তরকে আল্লাহর অভিমুখী করিয়া আসিয়াছে। আযাবের ফিরিশতাগণ বলিলেন, সে তো কখনো কোন নেক আমল করে নাই। তখন মানুষের বেশে এক ফিরিশতা তাহাদের নিকট আসিলেন। ফিরিশতাগণ তাহাকে নিজেদের মাঝে মীমাংসাকারী সাব্যস্ত করিলেন। তিনি বলিলেন, উভয় দিকের যমিন পরিমাপ কর। সে যেই যমিনের অধিকতর নিকটবর্তী হইবে সেই যমিনের লোক বলিয়া গণ্য হইবে। তখন তাহারা পরিমাপ করিয়া দেখিলেন যে, সে ঐ যমিনের অধিকতর নিকটবর্তী যেখানে যাইবার ইচ্ছা করিয়াছে। তখন রহমতের ফিরিশতাগণ তাহার রূহ কবয করিলেন। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

অন্য এক বর্ণনায় আছে, পরিমাপ করিয়া দেখা গেল যে, সে নেককারদের গ্রামের মাত্র এক বিঘত নিকটবর্তী ছিল। তাই তাহাকে ঐ গ্রামের লোকদের মধ্যে গণ্য করা হইল।

ছহী বুখারী শরীফের অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, আল্লাহ্ পাক এই দিকের যমিনকে হুকুম করিলেন, দূরবর্তী হইয়া যাও এবং ঐ দিকের যমিনকে হুকুম করিলেন নিকটবর্তী হইয়া যাও। অতঃপর মীমাংসাকারী, ফিরিশতাগণকে বলিলেন, উভয় যমিনের দূরত্ব পরিমাপ কর। তাহারা ঐ দিকের যমিনকে এক বিঘত নিকটবর্তী পাইলেন। ফলে তাহাকে ক্ষমা করা হইল।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, লোকটি বুক দ্বারা হামাগুড়ি দিয়া নিজেকে ঐ যমিনের নিকটবর্তী করিয়াছিল।

ফায়দা ঃ

(পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আলিম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল) আল্লাহর এই বান্দার অন্তরে অপরাধবোধ এবং অনুতাপের একটি কাঁটা সর্বদা খচখচ করিয়া বিঁধিতেই ছিল, যাহা তাহাকে অস্থির ও যন্ত্রণাদগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। তাহার দিল একেবারে মুর্দা ছিল না। এই অনুতাপদগ্ধতা এবং তাওবার পথ অনুসন্ধানের চেষ্টাই তাহার মাগফিরাত ও কবুলিয়াতের উপায় করিয়া দিয়াছিল। অন্তরের এই অনুশোচনা ও অস্থিরতা খুবই মুবারক জিনিস। ইহা না থাকিবার কারণে বহু পাপী তাওবা হইতে মাহরূম হইয়াছে। আবার ইহারই কারণে একশত নিরপরাধ মানুষের হত্যাকারী আল্লাহর রহমত লাভ করিয়াছে।

(না, তাওবার কোন পথ নাই) ইহাতে প্রমাণ হয় যে, একজন আলিমই পারেন মানুষকে ধর্মের সঠিক পথ দেখাইতে। মুর্খ ইবাদতগুযার ও সাধুপুরুষ নিজের ও অন্যের ধ্বংসই ডাকিয়া আনে মাত্র। এই জন্য যেকোন দ্বীনী সমস্যায় হক্কানী ওলামায়ে কেরামের শরণাপন্ন হওয়া কর্তব্য।

(অতঃপর তুমি তোমার এলাকায় আর ফিরিও না) যে স্থানে এবং যে পরিবেশে মানুষ পাপাচার করে এবং গাফলতপূর্ণ জীবন কাটায় সাধারণতঃ ঐ পরিবেশে তাহার সংশোধন ও পরিবর্তন খুবই কঠিন হইয়া থাকে। স্থান পরিবর্তন এবং উত্তম পরিবেশ মানুষের উত্তম চরিত্র ও উত্তম জীবন লাভের জন্য খুবই সহায়ক হইয়া থাকে। হিজরত করিবার ইহাও একটি হিকমত ও উপকারিতা। ইহাছাড়া তাওবার কবুলিয়াত ও আছরপূর্ণ হইবার জন্য মৌখিক তাওবার সংগে সংগে হাত-পায়ের কিছু আমল এবং কিছু মেহনত ও আত্মত্যাগ খুবই উপকারী হইয়া থাকে।

(দূরবর্তী হইয়া যাও) যমিনের স্রষ্টা আল্লাহ পাক। তিনি যাহা হুকুম করিবেন তাহাই হইবে। ইহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই। তাঁহার হুকুমে একদিকের ভূমি নিজেকে সম্প্রসারিত করিয়াছিল আবার অন্যদিকের ভূমি নিজেকে সংকোচিত করিয়াছিল। ইহাছাড়া বর্তমান বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রমাণ করিয়াছে যে, পৃথিবী নিরন্তর সম্প্রাসারণ ও সংকোচন প্রক্রিয়ার অধীনে চলিতেছে এবং বিভিন্ন প্লেটে বিভক্ত পৃথিবীর এক মহাদেশ হইতে অন্য মহাদেশের দূরত্ব কম বেশী হইতেছে। আসল কথা হইল, আল্লাহর কুদরত স্বীকার করিয়া লইবার পর আর কোন সমস্যাই থাকে না। সমস্যা বাঁধে তখনই যখন আল্লাহকে আমরা আমাদের অতি সীমাবদ্ধ শক্তি ও ক্ষমতার আলোকে চিন্তা করিতে যাই এবং আমাদের ক্ষুদ্র চিন্তাশক্তির সাহায্যে তাঁহার কাজের হিকমত বুঝিতে যাই।

(হামাগুড়ি দিয়া) ইহা দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহর এই বান্দার নিয়ত ও চেষ্টা কত আন্তরিক ও প্রাণান্ত ছিল যে, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে তাহার চেষ্টা ছাড়ে নাই। ইহাই আল্লাহ পাকের অতিপছন্দনীয়। বস্তুতঃ বান্দা যখন তাহার সাধ্যমত চেষ্টা করে তখন আল্লাহ পাক তাহার সাধ্যের অতিরিক্তটুকু আপন কুদরত দ্বারা সমাধা করিয়া দেন।

এই ঘটনার শিক্ষণীয় বিষয়গুলি হইল–

(ক) দ্বীনী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাধারণ দ্বীনদারদের পরিবর্তে বিজ্ঞ আলিমের পরামর্শ গ্রহণ করা কর্তব্য।

(খ) গোনাহ যত জঘন্যই হউক এবং যত বেশী পরিমাণেই হউক আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ হইতে নাই। কোরআন শরীফে ইরশাদ হইয়াছে–

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ * اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ *

আপনি বলিয়া দিন, হে আমার বান্দারা! যাহারা নিজেদের উপর অবিচার করিয়াছ; তোমরা আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ হইও না। আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করিতে পারেন। নিঃসন্দেহে তিনি ক্ষমাশীল, করুণাময়।

আরও ইরশাদ হইয়াছে –

اِنَّهٗ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ *

তদ্রুপ হাদীছে কুদসীতে আছে, আল্লাহ বলেন, হে বান্দা! তুমি যদি মরুভূমির বালুকণার পরিমাণ গোনাহও কর আর অনুতপ্ত মনে তাওবা কর তবে আমি সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া দিব। কোন পরওয়া করিব না।

অনেকে বলিয়া থাকে যে, আমি তো এত জঘন্য গোনাহ করিয়াছি যে, আমার মাগফিরাতের কোন উপায় নাই। কিংবা আমি এত বারবার তাওবা ভংগ করিয়াছি যে, আমার তাওবা কবুল হইবার আর'আশা নাই। হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, দৃশ্যতঃ ইহা অনুশোচনা ও বিনয় মনে হইলেও মূলতঃ ইহা আল্লাহ পাকের শানে চরম বেয়াদবি ও গোস্তাখি এবং তাঁহার অসীম রহমতের প্রতি অনাস্থার শামিল। এইরূপ ভাবনা দ্বারা নিজের মাহরূমী ও বঞ্চনা ডাকিয়া

আনা উচিত নয়। বরং হাজারবার তাওবা ভংগ করিলেও আবার তাওবা কর। কেননা তোমার পরওয়ারদিগারের রহমত তোমার গোনাহের চাইতে প্রশস্ত।

২২। সত্যবাদিতা এবং অপরাধ স্বীকারের বরকত

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مِنْ بَنِيْهِ حِيْنَ عَمِيَ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ بِحَدِيْثِهِ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوكَ. قَالَ كَعْبٌ: لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ، ﷺ، فِيْ غَزْوَةٍ غَزَاهَا قَطُّ إِلَّا فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ، غَيْرَ أَنِّيْ قَدْ تَخَلَّفْتُ فِيْ غَزْوَةِ بَدْرٍ، وَلَمْ يُعَاتَبْ أَحَدٌ تَخَلَّفَ عَنْهُ، إِنَّمَا خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُوْنَ يُرِيْدُوْنَ عِيْرَ قُرَيْشٍ حَتّٰى جَمَعَ اللّٰهُ تَعَالٰى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلٰى غَيْرِ مِيْعَادٍ. وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِيْنَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِيْ بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ، وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ فِيْ النَّاسِ مِنْهَا.

وَكَانَ مِنْ خَبَرِي حِيْنَ تَخَلَّفْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ، ﷺ، فِيْ غَزْوَةِ تَبُوكَ أَنِّيْ لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْوٰى وَلَا أَيْسَرَ مِنِّيْ حِيْنَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِيْ تِلْكَ الْغَزْوَةِ، وَاللّٰهِ مَا جَمَعْتُ قَبْلَهَا رَاحِلَتَيْنِ قَطُّ حَتّٰى جَمَعْتُهُمَا فِيْ تِلْكَ الْغَزْوَةِ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُرِيْدُ غَزْوَةً إِلَّا وَرّٰى بِغَيْرِهَا حَتّٰى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ، فَغَزَاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي حَرٍّ شَدِيْدٍ، وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيْدًا وَمَفَازًا، وَاسْتَقْبَلَ عَدَدًا كَثِيْرًا، فَجَلّٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ أَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا أُهْبَةَ غَزْوِهِمْ فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِمْ الَّذِيْ يُرِيْدُ، وَالْمُسْلِمُوْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ كَثِيْرٌ وَلَا يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ «يُرِيْدُ بِذٰلِكَ الدِّيْوَانَ»، قَالَ كَعْبٌ: فَقَلَّ رَجُلٌ يُرِيْدُ أَنْ يَّتَغَيَّبَ إِلَّا ظَنَّ أَنَّ ذٰلِكَ سَيَخْفٰى بِهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ فِيْهِ وَحْيٌ مِنَ اللّٰهِ، وَغَزَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تِلْكَ الْغَزْوَةَ حِيْنَ طَابَتِ الثِّمَارُ وَالظِّلَالُ فَأَنَا إِلَيْهَا أَصْعَرُ فَتَجَهَّزَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُوْنَ مَعَهُ، وَطَفِقْتُ أَغْدُوْ لِكَيْ أَتَجَهَّزَ مَعَهُ، فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، وَأَقُوْلُ فِيْ نَفْسِيْ: أَنَا قَادِرٌ عَلٰى ذٰلِكَ إِذَا أَرَدْتُ، فَلَمْ يَزَلْ يَتَمَادٰى بِيْ حَتّٰى اسْتَمَرَّ بِالنَّاسِ الْجِدُّ، فَأَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَادِيًا وَالْمُسْلِمُوْنَ مَعَهُ، وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جِهَازِيْ شَيْئًا، ثُمَّ غَدَوْتُ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، فَلَمْ يَزَلْ يَتَمَادٰى بِيْ حَتّٰى أَسْرَعُوْا وَتَفَارَطَ الْغَزْوُ، فَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأُدْرِكَهُمْ، فَيَا لَيْتَنِيْ فَعَلْتُ، ثُمَّ لَمْ يُقَدَّرْ ذٰلِكَ لِيْ، فَطَفِقْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِيْ النَّاسِ بَعْدَ خُرُوْجِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَحْزُنُنِيْ أَنِّيْ لَا أَرٰى لِيْ أُسْوَةً، إِلَّا رَجُلًا مَغْمُوْصًا عَلَيْهِ فِيْ النِّفَاقِ، أَوْ رَجُلًا مِمَّنْ عَذَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنَ الضُّعَفَاءِ، وَلَمْ يَذْكُرْنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى بَلَغَ تَبُوْكَ، فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِيْ الْقَوْمِ بِتَبُوْكَ: مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ سَلِمَةَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ حَبَسَهُ بُرْدَاهُ، وَالنَّظَرُ فِيْ

عِطْفَيْهِ. فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه: بِئْسَ مَا قُلْتَ! وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. فَبَيْنَا هُوَ عَلٰى ذٰلِكَ رَأَى رَجُلًا مُبَيِّضًا يَزُوْلُ بِهِ السَّرَابُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: كُنْ أَبَا خَيْثَمَةَ، فَإِذَا هُوَ أَبُوْ خَيْثَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ وَهُوَ الَّذِيْ تَصَدَّقَ بِصَاعِ التَّمْرِ حِيْنَ لَمَزَهُ الْمُنَافِقُوْنَ ، قَالَ كَعْبٌ: فَلَمَّا بَلَغَنِيْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَدْ تَوَجَّهَ قَافِلًا مِنْ تَبُوْكَ حَضَرَنِيْ بَثِّيْ، فَطَفِقْتُ أَتَذَكَّرُ الْكَذِبَ وَأَقُوْلُ: بِمَ أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا وَأَسْتَعِيْنُ عَلٰى ذٰلِكَ بِكُلِّ ذِيْ رَأْيٍ مِنْ أَهْلِيْ، فَلَمَّا قِيْلَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَدْ أَظَلَّ قَادِمًا زَاحَ عَنِّيْ الْبَاطِلُ حَتّٰى عَرَفْتُ أَنِّيْ لَمْ أَنْجُ مِنْهُ بِشَيْءٍ أَبَدًا، فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ ، وَأَصْبَحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَادِمًا، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ ، فَلَمَّا فَعَلَ ذٰلِكَ جَاءَهُ الْمُخَلَّفُوْنَ يَعْتَذِرُوْنَ إِلَيْهِ وَيَحْلِفُوْنَ لَهُ، وَكَانُوْا بِضْعًا وَثَمَانِيْنَ رَجُلًا فَقَبِلَ مِنْهُمْ عَلَانِيَتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللهِ تَعَالٰى حَتّٰى جِئْتُ. فَلَمَّا سَلَّمْتُ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ ثُمَّ قَالَ: تَعَالَ، فَجِئْتُ أَمْشِيْ حَتّٰى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لِيْ: مَا خَلَّفَكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ قَدِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ ! قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنِّيْ وَاللهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ اَهْلِ الدُّنْيَا لَرَاَيْتُ اَنِّيْ سَاَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرٍ؛ لَقَدْ أُعْطِيْتُ جَدَلًا، وَلٰكِنَّنِيْ وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيْثَ كَذِبٍ تَرْضٰى بِهِ عَنِّيْ لَيُوْشِكَنَّ اللهُ [أَنْ] يُسْخِطُكَ عَلَيَّ، وَاِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيْثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِيْهِ اِنِّيْ لَاَرْجُوْ فِيْهِ عُقْبَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَاللهِ مَا كَانَ لِيْ مِنْ عُذْرٍ، وَاللهِ مَا كُنْتُ قَطُّ اَقْوٰى وَلَا اَيْسَرَ مِنِّيْ حِيْنَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ.

قَالَ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اَمَّا هٰذَا فَقَدْ صَدَقَ، فَقُمْ حَتّٰى يَقْضِيَ اللهُ فِيْكَ»، وَسَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِيْ سَلِمَةَ فَاتَّبَعُوْنِيْ، فَقَالُوْا لِيْ: وَاللهِ مَا عَلِمْنَاكَ اَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هٰذَا، لَقَدْ عَجَزْتَ فِيْ اَنْ لَا تَكُوْنَ اعْتَذَرْتَ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِمَا اعْتَذَرَ اِلَيْهِ الْمُخَلَّفُوْنَ فَقَدْ كَانَ كَافِيْكَ ذَنْبَكَ اسْتِغْفَارُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَكَ. قَالَ: فَوَاللهِ مَا زَالُوْا يُؤَنِّبُوْنَنِيْ حَتّٰى اَرَدْتُ اَنْ اَرْجِعَ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَاُكَذِّبَ نَفْسِيْ، ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ: هَلْ لَقِيَ هٰذَا مَعِيْ مِنْ اَحَدٍ؟ قَالُوْا: نَعَمْ لَقِيَهُ مَعَكَ رَجُلَانِ قَالَا مِثْلَ مَا قُلْتَ، وَقِيْلَ لَهُمَا مِثْلَ مَا قِيْلَ لَكَ، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هُمَا؟ قَالُوْا: مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيْعِ الْعَمْرِيُّ، وَهِلَالُ بْنُ اُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ؟ قَالَ: فَذَكَرُوْا لِيْ رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا فِيْهِمَا اُسْوَةٌ. قَالَ: فَمَضَيْتُ حِيْنَ ذَكَرُوْهُمَا لِيْ. وَنَهٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ كَلَامِنَا اَيُّهَا الثَّلَاثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ، قَالَ: فَاجْتَنَبَنَا النَّاسُ ـ اَوْ قَالَ: تَغَيَّرُوْا لَنَا ـ حَتّٰى تَنَكَّرَتْ لِيْ فِيْ نَفْسِيْ الْاَرْضُ، فَمَا هِيَ بِالْاَرْضِ الَّتِيْ اَعْرِفُ، فَلَبِثْنَا

عَلٰى ذٰلِكَ خَمْسِيْنَ لَيْلَةً. فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِيْ بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ، وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَأَطُوفُ فِيْ الْأَسْوَاقِ وَلَا يُكَلِّمُنِيْ أَحَدٌ، وَآتِي رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ، وَهُوَ فِيْ مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَأَقُوْلُ فِيْ نَفْسِيْ: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ أَمْ لَا؟ ثُمَّ أُصَلِّيْ قَرِيْبًا مِنْهُ وَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ، فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلٰى صَلَاتِيْ نَظَرَ إِلَيَّ، وَإِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّيْ، حَتّٰى إِذَا طَالَ ذٰلِكَ عَلَيَّ مِنْ جَفْوَةِ الْمُسْلِمِيْنَ مَشَيْتُ حَتّٰى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ أَبِيْ قَتَادَةَ وَهُوَ ابْنُ عَمِّي وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَاللّٰهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا قَتَادَةَ أَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمُنِيْ أُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ﷺ؟ فَسَكَتَ، فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ فَسَكَتَ، فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ فَقَالَ: اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. فَفَاضَتْ عَيْنَايَ، وَتَوَلَّيْتُ حَتّٰى تَسَوَّرْتُ الْجِدَارَ. فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِيْ فِيْ سُوْقِ الْمَدِيْنَةِ إِذَا نَبَطِيٌّ مِنْ نَبَطِ أَهْلِ الشَّامِ مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيْعُهُ بِالْمَدِيْنَةِ يَقُوْلُ: مَنْ يَدُلُّ عَلٰى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ؟ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيْرُوْنَ لَهُ إِلَيَّ حَتّٰى جَاءَنِيْ فَدَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ، وَكُنْتُ كَاتِبًا. فَقَرَأْتُهُ فَإِذَا فِيْهِ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ، وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللّٰهُ بِدَارِ هَوَانٍ وَلَا مَضْيَعَةٍ، فَالْحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ فَقُلْتُ حِيْنَ قَرَأْتُهَا: وَهٰذِهِ أَيْضًا مِنَ الْبَلَاءِ فَتَيَمَّمْتُ بِهَا التَّنُّوْرَ فَسَجَرْتُهَا. حَتّٰى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُوْنَ مِنَ الْخَمْسِيْنَ وَاسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ إِذَا رَسُوْلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَأْتِيْنِيْ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ، فَقُلْتُ: أُطَلِّقُهَا، أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟ قَالَ: لَا بَلِ اعْتَزِلْهَا فَلَا تَقْرَبَنَّهَا، وَأَرْسَلَ إِلٰى صَاحِبَيَّ بِمِثْلِ ذٰلِكَ. فَقُلْتُ لِامْرَأَتِيْ: اِلْحَقِي بِأَهْلِكِ فَكُوْنِيْ عِنْدَهُمْ حَتّٰى يَقْضِيَ اللّٰهُ فِيْ هٰذَا الْأَمْرِ، فَجَاءَتِ امْرَأَةُ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ هِلَالَ ابْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدُمَهُ؟ قَالَ: لَا، وَلٰكِنْ لَا يَقْرَبَنَّكِ. فَقَالَتْ: إِنَّهُ وَاللّٰهِ مَا بِهِ مِن حَرَكَةٍ إِلٰى شَيْءٍ، وَوَاللّٰهِ مَا زَالَ يَبْكِيْ مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلٰى يَوْمِهِ هٰذا. فَقَالَ لِيْ بَعْضُ أَهْلِيْ: لَوِ اسْتَأْذَنْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ امْرَأَتِكَ، فَقَدْ أَذِنَ لِامْرَأَةِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ أَنْ تَخْدُمَهُ؟ فَقُلْتُ: لَا أَسْتَأْذِن فِيْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، وَمَا يُدْرِيْنِيْ مَاذَا يَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنْتُهُ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ! فَلَبِثْتُ بِذٰلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ، فَكَمُلَ لَنَا خَمْسُوْنَ لَيْلَةً مِنْ حِيْنَ نُهِيَ عَنْ كَلَامِنَا.

ثُمَّ صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ صَبَاحَ خَمْسِيْنَ لَيْلَةً عَلٰى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِنَا، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِيْ ذَكَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى منا، قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِيْ وَضَاقَتْ عَلَيَّ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخٍ أَوْفٰى عَلٰى سَلْعٍ يَقُوْلُ بِأَعْلٰى صَوْتِهِ: يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكٍ.

اَبْشِرْ، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا، وَعَرَفْتُ اَنَّهُ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ. فَآذَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّاسَ بِتَوْبَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْنَا حِيْنَ صَلَّى صَلَاةَ الْفَجْرِ فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُوْنَنَا، فَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيَّ مُبَشِّرُوْنَ، وَرَكَضَ رَجُلٌ اِلَيَّ فَرَسًا، وَسَعَى سَاعٍ مِنْ اَسْلَمَ قِبَلِيْ وَاَوْفَى عَلَى الْجَبَلِ، وَكَانَ الصَّوْتُ اَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ، فَلَمَّا جَاءَنِيْ الَّذِيْ سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِيْ نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَّ فَكَسَوْتُهُمَا اِيَّاهُ بِبَشَارَتِهِ، وَاللّٰهِ مَا اَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذٍ، وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ فَلَبِسْتُهُمَا وَانْطَلَقْتُ اَتَامَّمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا يُهَنِّئُوْنَنِيْ بِالتَّوْبَةِ وَيَقُوْلُوْنَ لِيْ: لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ اللّٰهِ عَلَيْكَ، حَتّٰى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ، فَقَامَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يُهَرْوِلُ حَتّٰى صَافَحَنِيْ وَهَنَّأَنِيْ، وَاللّٰهِ مَا قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ غَيْرُهُ، فَكَانَ كَعْبٌ لَا يَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ. قَالَ كَعْبٌ: فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُوْرِ: اَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُذْ وَلَدَتْكَ اُمُّكَ، فَقُلْتُ: اَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمْ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ؟ قَالَ: لَا بَلْ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتّٰى كَاَنَّ وَجْهَهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ، وَكُنَّا نَعْرِفُ ذٰلِكَ مِنْهُ، فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ مِنْ تَوْبَتِيْ اَنْ اَنْخَلِعَ مِنْ مَالِيْ صَدَقَةً اِلَى اللّٰهِ وَاِلٰى رَسُوْلِهِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، فَقُلْتُ: اِنِّيْ اُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِيْ بِخَيْبَرَ. وَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اِنَّمَا اَنْجَانِيْ بِالصِّدْقِ، وَاِنَّ مِنْ تَوْبَتِيْ اَنْ لَا اُحَدِّثَ اِلَّا صِدْقًا مَا بَقِيْتُ، فَوَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ اَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَبْلَاهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ صِدْقِ الْحَدِيْثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَحْسَنَ مِمَّا اَبْلَانِيْ اللّٰهُ تَعَالٰى، وَاللّٰهِ مَا تَعَمَّدْتُ كَذْبَةً مُنْذُ قُلْتُ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى يَوْمِيْ هٰذَا، وَاِنِّيْ لَاَرْجُوْ اَنْ يَحْفَظَنِيْ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْمَا بَقِيَ، قَالَ: فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿ لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ ﴾ حَتّٰى بَلَغَ: ﴿ اِنَّهُ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا حَتّٰى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ﴾ حَتّٰى بَلَغَ: ﴿ اِتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ ﴾ [التوبة: ١١٧، ١١٩]، قَالَ كَعْبٌ: وَاللّٰهِ مَا اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ قَطُّ بَعْدَ اِذْ هَدَانِيْ اللّٰهُ لِلْاِسْلَامِ اَعْظَمَ فِيْ نَفْسِيْ مِنْ صِدْقِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ لَا اَكُوْنَ كَذَبْتُهُ، فَاَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا؛ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ لِلَّذِيْنَ كَذَبُوْا حِيْنَ اَنْزَلَ الْوَحْيَ شَرَّ مَا قَالَ لِاَحَدٍ، فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿ سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ اِنَّهُمْ رِجْسٌ وَّمَاْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ. يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ ﴾ [التوبة: ٩٥،

قَالَ كَعْبٌ: كُنَّا خُلِّفْنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةَ عَنْ أَمْرِ أُولَئِكَ الَّذِيْنَ قَبِلَ مِنْهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ حَلَفُوْا لَهُ، فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ، وَأَرْجَأَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَمْرَنَا حَتَّى قَضَى اللهُ تَعَالَى فِيْهِ بِذٰلِكَ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ﴾ وَلَيْسَ الَّذِيْ ذَكَرَ مِمَّا خُلِّفْنَا تَخَلُّفَنَا عَنِ الْغَزْوِ، وَإِنَّمَا هُوَ تَخْلِيْفُهُ إِيَّانَا وَإِرْجَاؤُهُ أَمْرَنَا عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَبِلَ مِنْهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَّخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ»، وَفِيْ رِوَايَةٍ: «وَكَانَ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الضُّحٰى، فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِ».

হযরত কা'আব বিন মালিক (রাঃ)-এর পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ (রহঃ) বলেন (হযরত কা'আব বিন মালিক অন্ধ হইবার পর তাঁহার এই পুত্রই তাঁহাকে চলাফিরায় সাহায্য করিতেন।)

কা'আব বিন মালিককে আমি তাবুক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে তাঁহার পিছনে থাকিয়া যাইবার ঘটনা বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি। হযরত কা'আব বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যত গাযওয়া বা অভিযান পরিচালনা করিয়াছেন তন্মধ্যে গাযওয়া তাবুক ছাড়া অন্য কোন গাযওয়ায় আমি কখনো অনুপস্থিত ছিলাম না। অবশ্য গাযওয়া বদরেও অনুপস্থিত ছিলাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই অনুপস্থিতির জন্য কাহাকেও তিরস্কার করেন নাই। কেননা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানগণ মূলতঃ কোরায়শের (বাণিজ্য) কাফেলাকে ধাওয়া করিবার জন্য বাহির হইয়াছিলেন। কিন্তু আল্লাহ পাক পূর্বনির্ধারিত কোন সময় ছাড়াই তাঁহাদিগকে ও তাঁহাদের শত্রুদিগকে মুখামুখি করিয়া দিয়াছিলেন।

আর আমি তো 'আকাবার রাত্রে' রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির ছিলাম এবং ইসলামের উপর (অবিচল থাকিবার) প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। আকাবার উপস্থিতির বিনিময়ে বদরের উপস্থিতি আমি পছন্দ করিব না। যদিও মানুষের কাছে আকাবার চাইতে বদর যুদ্ধের প্রসিদ্ধি বেশী।

আমার ঘটনা এই যে, যখন আমি তাবুক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে পিছনে থাকিয়া গিয়াছিলাম তখনকার মত শারীরিক সামর্থ্য ও আর্থিক সচ্ছলতা আমার আর কখনো ছিল না। আল্লাহর কসম! ইহার পূর্বে কখনো একত্রে দুইটি বাহন আমার সংগ্রহে ছিল না। কিন্তু ঐ যুদ্ধে আমার নিকট একটির পরিবর্তে দুইটি সাওয়ারি ছিল।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন (দিকে) অভিযানের ইচ্ছা করিতেন তখন অন্যকোন দিক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়া বিষয়টি গোপন করিতেন। (মানুষ মনে করিত যে, তিনি বুঝি ঐ দিকেই অভিযানের মনস্থ করিতেছেন। কিন্তু অকস্মাৎ তিনি দিক পরিবর্তন করিতেন।) কিন্তু ঐ যুদ্ধে তিনি মনের কথা প্রকাশ করিয়া দিলেন। কেননা তিনি প্রচণ্ড গরমের মধ্যে এই সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মরুভূমির মধ্য

দিয়া বহু দূরের সফরের এবং বিপুল সংখ্যক শত্রুর মুকাবেলার মনস্থ করিয়াছিলেন। তাই তিনি মুসলমানদের সামনে এই অভিযানের বিষয় প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন এবং সঠিক দিক সম্পর্কেও তাঁহাদিগকে অবহিত করিয়াছিলেন যাহাতে তাঁহারা অভিযানের পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে পারে। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে বিপুল সংখ্যক মুসলমান ছিলেন। আর কোন সংরক্ষণকারী বইয়ে [১] তাহাদের নাম সংরক্ষিত থাকিত না। কা'আব বলেন, তাই কেহ অনুপস্থিত থাকিতে চাহিলে সে ইহাই ধারণা করিত যে, তাহার বিষয়টি গোপনই থাকিবে, যতক্ষণ না তাহার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে কোন অহী নাযিল হয়।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই গাযওয়া এমন সময় করিয়াছিলেন যখন খেজুর পাকিয়া গিয়াছিল এবং গাছের ছায়া খুব আরামদায়ক হইয়াছিল। আর আমার নিকট এই (পাকা ফল ও গাছের ঠাণ্ডা ছায়া) খুব পছন্দনীয় ছিল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুসলমানগণ সফরের প্রস্তুতি শুরু করিয়া দিয়াছিলেন। আমি প্রতিদিন সকালে তাঁহার সংগে সফরের প্রস্তুতি গ্রহণের নিয়তে বাহির হইতাম। কিন্তু কিছু না করিয়াই ফিরিয়া আসিতাম। আর মনে মনে বলিতাম, যখন ইচ্ছা করিব তখনই আমি উহা করিতে পারিব। (কেননা সামর্থ্য ও সচ্ছলতা ছিল)

এই অবস্থাই আমার চলিতে লাগিল। এমন কি মানুষের মাঝে সফরের তোড়জোর শুরু হইয়া গেল এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সংগে মুসলমানগণ রওয়ানা হইয়া গেলেন। অথচ আমি আমার সফরের সামান কিছুই তৈয়ার করি নাই। অতঃপর সকালে গেলাম; আবার আয়োজন উদ্যোগ ছাড়াই ফিরিয়া আসিলাম। আমার অবস্থা এমনই চলিতে থাকিল, এমন কি মুসলমানগণ গতি বাড়াইয়া দিলেন এবং আমার জন্য জিহাদের সুযোগ হাতছাড়া হইয়া গেল। তখনও আমি রওয়ানা দিয়া তাঁহাদিগকে ধরিয়া ফেলিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। হায়, যদি আমি তাহা করিতাম! কিন্তু আমার ভাগ্যে তাহা লেখা ছিল না।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চলিয়া যাইবার পর যখন আমি মানুষের মাঝে বাহির হইতাম তখন আমার দুঃখ হইত। কেননা আমার সহগামী রূপে এমন লোককেই শুধু দেখিতে পাইতাম, যে মুনাফিক রূপে চিহ্নিত ছিল কিংবা এমন দুর্বল লোক যাহাকে আল্লাহ মাযুর করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাবুকে পৌঁছিবার পূর্বে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে স্মরণ করেন নাই। তাবুকে লোকদের মাঝে বসা অবস্থায় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কা'আব বিন মালিকের কি খবর? বনু সালিমা গোত্রের এক লোক বলিয়া উঠিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহার মূল্যবান চাদর (ও পোশাক পরিচ্ছদ) এবং আপন উভয় পার্শ্বের প্রতি তাহার মুগ্ধ দৃষ্টি (অর্থাৎ আত্মতুষ্টি) তাহাকে আটকাইয়া রাখিয়াছে। তখন মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) বলিলেন, তুমি খুবই মন্দ কথা বলিয়াছ। ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহার ব্যাপারে আমরা ভাল ছাড়া কিছু জানি না। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিরব হইয়া গেলেন।

তিনি ঐ অবস্থায় থাকিতেই একজন সাদা পোশাকধারী লোককে মরীচিকা তোলপাড়

১। হযরত কা'আব রেজিষ্টারের কথা বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

করিয়া আসিতে দেখিলেন। তিনি বলিলেন, আগন্তুক যেন আবু খায়ছামা হয়। দেখা গেল, তিনি আবু খায়ছামা আনছারীই ছিলেন। ইনি সেই আবু খায়ছামা যিনি এক ছা' পরিমাণ খেজুর ছাদাকা করিয়াছিলেন। আর মুনাফিকরা তাহাকে (পরিমাণ সল্পতার কথা বলিয়া) উপহাস করিয়াছিল।

কা'আব (রাঃ) বলেন, যখন আমার নিকট খবর আসিল যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক হইতে ফেরত রওয়ানা দিয়াছেন তখন আমাকে দুশ্চিন্তা পাইয়া বসিল। তখন আমি মিথ্যা অজুহাত ভাবিতে লাগিলাম এবং মনে মনে বলিলাম, আগামীকাল কি উপায়ে তাঁহার ক্রোধ হইতে রক্ষা পাইব? নাকি আমার পরিবারের সকল বিচক্ষণ লোকদের নিকট এই বিষয়ে সাহায্য চাহিব?

যখন খবর আসিল যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় আসিয়াই পড়িয়াছেন তখন ভ্রান্ত চিন্তা আমার অন্তর হইতে দূর হইয়া গেল এবং আমি বুঝিতে পারিলাম যে, কোন মিথ্যা দ্বারা তাঁহার অসন্তুষ্টি হইতে কখনই আমি বাঁচিতে পারিব না। তখন আমি সত্যভাষণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলাম।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভোরের দিকে আসিয়া পৌঁছিলেন। তিনি যখন কোন সফর হইতে আসিতেন তখন আগে মসজিদে গিয়া দুই রাকাত নামায পড়িতেন। অতঃপর মানুষের (সালাম ও অভিনন্দন গ্রহণের) জন্য বসিতেন। যখন তিনি উহা করিলেন, তখন পিছনে থাকিয়া যাওয়া লোকেরা (একে একে) আসিল এবং কসম করিয়া ওযর পেশ করিতে লাগিল। তাহাদের সংখ্যা আশির কিছু উপরে ছিল। তিনি তাহাদের বাহ্যিক ওযরই গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদের বাই'আত নিলেন এবং তাহাদের জন্য মাগফিরাত প্রার্থনা করিলেন এবং তাহাদের দিলের অবস্থা আল্লাহর হাওয়ালা করিলেন। অতঃপর আমি আসিলাম। যখন সালাম করিলাম তখন তিনি রাগতঃভাবে মৃদু হাসিলেন। অতঃপর বলিলেন, নিকটে আস। আমি হাঁটিয়া নিকটে আসিলাম এবং তাঁহার সামনে বসিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি কারণে তুমি পিছনে পড়িয়া গেলে? তুমি কি সাওয়ারি খরিদ করিয়াছিলে না? (তিনি বলেন) আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম! যদি আমি আপনার পরিবর্তে কোন দুনিয়াদারের মজলিসে বসিতাম তবে ওযর পেশ করিয়া তাহার ক্রোধ হইতে বাঁচিয়া যাওয়াই ভাল মনে করিতাম। কেননা আমাকে যুক্তিতর্কের যোগ্যতা দান করা হইয়াছে। কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি জানি যে, আজ যদি আমি মিথ্যা অযুহাত পেশ করি আর আপনি সন্তুষ্ট হইয়াও যান, তবে আল্লাহ অবশ্যই আমার প্রতি আপনাকে অসন্তুষ্ট করিয়া দিবেন। আর যদি আপনার খিদমতে সত্য কথা বলি এবং আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্টও হন, তবে তাহাতে আমি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে পুরস্কার আশা করি।

আল্লাহর কসম! আমার কোন ওযর ছিল না। আল্লাহর কসম! এতটা সামর্থ্যবান ও সচ্ছল আমি কখনও ছিলাম না যতটা এই সময় ছিলাম। (তিনি বলেন) তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সে কিন্তু সত্য কথা বলিয়া দিয়াছে। আচ্ছা যাও। আল্লাহ তোমার সম্পর্কে কোন ফায়সালা করা পর্যন্ত (অপেক্ষা কর।) আমি উঠিয়া

আসিলাম। বনু সালিমা গোত্রের কিছু লোকও আমার পিছনে পিছনে উঠিয়া চলিল এবং আমাকে বলিল, আল্লাহর কসম! আমরা তো জানি না যে, ইহার পূর্বে তুমি কোন গোনাহ করিয়াছ।

তুমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এমন কোন ওযর পেশ করিতে অক্ষম হইয়া গেলে যেমন অন্যান্য পিছনে পড়িয়া থাকা লোকেরা করিয়াছে! তোমার জন্য তো তোমার সপক্ষে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাগফিরাত প্রার্থনাই যথেষ্ট ছিল। (তিনি বলেন) আল্লাহর কসম! তাহারা আমাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। এমনকি আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে ফিরিয়া গিয়া (পূর্ব বক্তব্য প্রত্যাহারপূর্বক) মিথ্যা বলিবার ইচ্ছা করিলাম। পরে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার সংগী আর কেহ কি এই অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে? তাহারা বলিল, হাঁ, আরও দুইজন তোমার সংগী এই অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে। তাহারা তোমারই মত বক্তব্য পেশ করিয়াছে এবং তাহাদিগকেও তোমার মত আদেশ করা হইয়াছে। (তিনি বলেন) আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা কাহারা? তাহারা বলিল, একজন মুরারাহ বিন রাবীয়া, অন্যজন হিলাল বিন উমাইয়া ওয়াকিফী(তিনি বলেন) তাহারা আমাকে এমন দুইজন সৎ লোকের নাম বলিল যাহারা বদর যুদ্ধে শরীক ছিল। আমি বলিলাম, (তবে তো) তাহাদের মাঝে আমার জন্য উত্তম আদর্শ রহিয়াছে। (তিনি বলেন,) যখন তাহারা আমাকে ঐ দুইজনের কথা বলিল তখন আমি (ঘরে) চলিয়া গেলাম।

যাহারা পিছনে থাকিয়া গিয়াছিল তাহাদের মধ্যে আমাদের তিনজনের সংগে কথা বলিতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করিয়া দিলেন। (তিনি বলেন) তখন লোকেরা আমাদিগকে এড়াইয়া চলিতে লাগিল। (বর্ণনাকারী সন্দেহ করিতেছেন যে, কিংবা তিনি বলিয়াছেন) লোকেরা আমাদের সাথে পরিবর্তিত আচরণ শুরু করিল। এমন কি আমার পরিচিত ভূমি আমার নিকট অপরিচিত হইয়া গেল। ইহা যেন আমার পরিচিত ভূমিই নহে। এই অবস্থায় পঞ্চাশ দিন কাটাইলাম। আমার দুই সাথী হাল ছাড়িয়া দিল এবং ঘরে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু আমি ছিলাম জোয়ান ও শক্ত প্রকৃতির মানুষ। তাই আমি বাহির হইতাম এবং মুসলমানদের সহিত নামাযে শরীক হইতাম এবং বাজারে ঘুরিতাম। কিন্তু কেহ আমার সহিত কথা বলিত না। আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির হইতাম এবং নামাযের পর তাঁহার বসা অবস্থায় তাঁহাকে ছালাম করিতাম এবং মনে মনে বলিতাম, ছালামের উত্তর দিতে গিয়া তিনি ঠোঁট নাড়িয়াছেন নাকি নাড়েন নাই। অতঃপর তাঁহার নিকটে দাঁড়াইয়া নামায পড়িতাম এবং গোপন চাহনিতে তাঁহাকে দেখিতাম। যখন আমি নামাযে রত হইতাম তখন তিনি আমার দিকে তাকাইতেন। আর যখন তাঁহার দিকে ফিরিতাম তখন তিনি আমার দিক হইতে ফিরিয়া যাইতেন।

মুসলমানদের এই উপেক্ষা যখন আমার জন্য দীর্ঘ হইয়া গেল, তখন একদিন আবু কাতাদাহর বাগানের দেওয়াল টপকাইয়া ভিতরে ঢুকিলাম। সে ছিল আমার চাচাত ভাই এবং আমার প্রিয়তম ব্যক্তি। আমি তাহাকে ছালাম করিলাম। কিন্তু আল্লাহর কসম! সে আমার ছালামের জওয়াব দিল না। তখন আমি তাহাকে বলিলাম, আমি তোমাকে

আল্লাহর দোহাই দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি কি জান যে,আমি আল্লাহ এবং তাঁহ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালবাসি! সে নিরব রহিল। আমি দ্বিতীয়ব তাহাকে (আল্লাহর) দোহাই দিলাম। তখনও সে নিরব রহিল। আমি আবার তাহাে (আল্লাহর) দোহাই দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন সে বলিল, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল ভাল জানেন। তখন আমার দুই চক্ষু হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইল এবং আমি দেওয়াঃ টপকাইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

(একদিন) আমি মদীনার বাজারে বিচরণ করিতেছিলাম; এমন সময় দেখি, সিরিয়াঃ এক নিবতী (কৃষক) মদীনায় খাদ্যশস্য বিক্রয় করিতে আসিয়াছে। সে বলিতেছে, কে আমাকে কা'আব বিন মালিকের ঠিকানা বলিতে পারে? তখন লোকেরা আমার দিবে ইংগিত করিয়া তাহাকে দেখাইয়া দিতে লাগিল। তখন সে আমার নিকটে আসিয়া গাসসান অধিপতির একটি পত্র দিল। আমি লেখা-পড়া জানিতাম। পত্রটি পড়িয়া দেখি, তাহাতে লেখা আছে–

পর সমাচার এই যে, আমি জানিতে পারিয়াছি যে, তোমার মনিব তোমার প্রতি রূঢ় আচরণ করিয়াছেন। তোমাকে আল্লাহ অপদস্থতা ও অনাদরের স্থানে থাকিতে বাধ্য করেন নাই। সুতরাং তুমি আমাদের নিকট চলিয়া আস। আমরা তোমার সমব্যথী হইব।

এই চিঠি পড়িয়া আমি বলিলাম, ইহাও পরীক্ষার অংশ। তখন আমি উহা চুলায় ফেলিয়া দিলাম।

যখন পঞ্চাশ দিনের চল্লিশ দিন চলিয়া গেল এবং ওহী বিলম্বিত হইল তখন হঠাৎ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুত আসিয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে তোমার স্ত্রী হইতে পৃথক হইবার আদেশ করিয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাকে তালাক দিয়া দিব? নাকি কি করিব? তিনি বলিলেন, না, শুধু পৃথক থাক। কাছে যাইও না। আমার দুই সংগীর নিকটও একই আদেশ পাঠাইলেন। আমি আমার স্ত্রীকে বলিলাম, তুমি তোমার পিত্রালয়ে চলিয়া যাও এবং এই বিষয়ে আল্লাহর ফায়সালা আসা পর্যন্ত সেইখানেই থাক।

তখন হিলাল বিন উমাইয়ার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির হইয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হিলাল বিন উমাইয়া অসহায় বৃদ্ধ। তাহার সেবা করিবার কেহ নাই। আমি তাহার সেবা করা কি আপনি অপছন্দ করেন? তিনি বলিলেন, না, তবে সে যেন তোমার কাছে না আসে। সে বলিল, আল্লাহর কসম! তাহার মধ্যে কিছুর অনুভূতিই নাই। আল্লাহর কসম! সে তো এই ঘটনার পর হইতে এখন পর্যন্ত শুধুই কাঁদিতেছে।

তখন আমার কোন কোন আত্মীয় স্বজন আমাকে বলিল, তুমি যদি তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনুমতি চাহিতে তবে হয়ত তিনি অনুমতি দিতেন। কেননা হেলাল বিন উমাইয়ার স্ত্রীকে তাহার খিদমত করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। আমি বলিলাম, তাহার ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনুমতি চাহিব না। কে জানে, অনুমতি চাহিতে গেলে

রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেন? কেননা আমি তো শক্ত সমর্থ মানুষ। এই অবস্থায় দশ রাত্র কাটাইলাম এবং আমাদের সহিত কথা বলা নিষেধ করিবার পর হইতে পঞ্চাশ দিন পূর্ণ হইল।

পঞ্চাশতম রাত্রের সকালে আমি আমাদের এক ঘরের ছাদে ফজরের নামায পড়িলাম। আমি ঐ অবস্থায়ই বসা ছিলাম যে অবস্থার কথা আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সম্পর্কে (কোরআনে) উল্লেখ করিয়াছেন। আমার নিজের অস্তিত্ব আমার জন্য অসহনীয় হইয়া গিয়াছিল এবং যমীন প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও আমার জন্য সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এমন সময় হঠাৎ 'সাল'উ' পাহাড়ের উপর হইতে এক চিৎকারকারীর আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। সে উচ্চস্বরে বলিতেছে, হে কা'আব বিন মালিক! সুসংবাদ গ্রহণ কর। ইহা শুনিবা মাত্র আমি সিজদায় পড়িয়া গেলাম এবং বুঝিতে পারিলাম যে, আনন্দের সময় আসিয়া পড়িয়াছে।

ফজরের নামাযের সময় রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে আমাদের তাওবা গ্রহণের ঘোষণা দিলেন। তখন লোকেরা আমাদিগকে খোশখবর দিতে লাগিল। কিছু সুসংবাদদাতা আমার দুই সংগীর নিকটেও গেল। এক লোক আমার নিকট ঘোড়া দৌড়াইয়া আসিল। আর আসলাম গোত্রের এক লোক হাঁটিয়া আসিল এবং পাহাড়ের উপর আরোহণ করিল। তাহার আওয়াজ ঘোড়ার চাইতে দ্রুত ছিল। যাহার আওয়াজ শুনিয়াছিলাম সে যখন আমাকে আসিয়া সংবাদ শুনাইল তখন সুসংবাদের বিনিময়ে তাহাকে আমি আমার উভয় কাপড় পরাইয়া দিলাম। আল্লাহর কসম! সেই দিন ঐ দুই কাপড় ছাড়া আর কিছু আমার ছিল না। তাই দুইটি কাপড় ধার করিয়া পরিলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্যে চলিলাম। তখন লোকেরা দলে দলে আমাদিগকে তাওবার অভিনন্দন জানাইতে লাগিল এবং আমাকে বলিতে লাগিল, তোমার প্রতি আল্লাহর পক্ষ হইতে তাওবার কবুলিয়াত মোবারক হউক।

শেষে আমি মসজিদে প্রবেশ করিলাম। দেখি, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকজন পরিবেষ্টিত অবস্থায় বসা আছেন। তখন তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ্ উঠিয়া দৌড়াইয়া আমার নিকট আসিলেন এবং মুছাফাহা করিয়া আমাকে অভিনন্দন জানাইলেন। আল্লাহর কসম! মুহাজিরদের মধ্যে তিনি ছাড়া আর কেহ উঠিয়া আসেন নাই। (বর্ণনাকারী বলেন) হযরত কা'আব হযরত তালহার এই সদাচার কখনও ভুলিতেন না। (কা'আব বলেন) যখন আমি রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিলাম তখন তিনি আনন্দে উদ্ভাসিত মুখে বলিলেন, তোমার মা তোমাকে জন্ম দিবার পর হইতে তোমার জীবনের সর্বোত্তম দিনের সুসংবাদ গ্রহণ কর। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহা আপনার পক্ষ হইতে নাকি আল্লাহর পক্ষ হইতে? তিনি বলিলেন, না বরং আল্লাহর তা'আলার পক্ষ হইতে।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আনন্দিত হইতেন তখন তাঁহার পবিত্র চেহারা ঝলমল করিয়া উঠিত, যেন এক খণ্ড চাঁদ। আমরা উহা দেখিয়া বুঝিতাম। আমি তাঁহার সামনে বসিয়া বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার তাওবার একটি অংশ এই যে, আমি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের নামে ছাদাকারূপে আমার (সমস্ত) মাল ছাড়িয়া

দিতেছি। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কিছু মাল নিজের জন্য রাখিয়া দাও। ইহা তোমার জন্য ভাল হইবে। আমি বলিলাম, খাইবারের হিসসা আমি নিজের জন্য রাখিলাম। আমি আরো বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা আমাকে সত্যবাদিতার বদৌলতে নাজাত দিয়াছেন। সুতরাং ইহাও আমার তাওবার একটি অংশ যে, যতদিন বাঁচিয়া থাকিব সত্য ছাড়া কিছু বলিব না। আর আমার জানা মতে সত্য বলিবার প্রতিদানে আর কাহাকেও আল্লাহ তা'আলা এত নেয়ামত দেন নাই যত আমাকে দিয়াছেন। আর আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে ঐ ওয়াদা করিবার পর আজ পর্যন্ত মিথ্যা বলিবার ইচ্ছাও করি নাই। আর আমি আশা করি যে, যতদিন বাঁচিয়া থাকিব আল্লাহ তা'আলা আমাকে (মিথ্যা হইতে) হিফাযত করিবেন।

(কা'আব বলেন) আমাদের সম্পর্কে আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করিয়াছিলেন–

لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَ الاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِىْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ * اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَحِيْمٌ * وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوا حَتّٰى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَ ظَنُّوْاۤ اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّاۤ اِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ * يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ كُوْنُوا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ *

আল্লাহ অনুগ্রহ করিলেন, নবীর উপর এবং মুহাজির ও আনছারগণের উপর এবং ঐ লোকদের উপর যাহারা সংকটের সময় তাঁহার অনুসরণ করিয়াছে, এমন অবস্থার পরে যে, তাহাদের এক দলের অন্তর ফিরিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। অতঃপর তিনি তাহাদের উপর অনুগ্রহ করিলেন। নিঃসন্দেহে তিনি তাহাদের প্রতি দয়াবান, করুণাময়। (এবং অনুগ্রহ করিয়াছেন) ঐ তিন ব্যক্তির উপর যাহাদের বিষয়টি বিলম্বিত করা হইয়াছিল। এমন কি যখন যমীন প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের প্রতি সংকীর্ণ হইয়া গেল এবং তাহারা বুঝিতে পারিল যে, আল্লাহর (ক্রোধ) হইতে কোন আশ্রয়স্থল নাই আল্লাহরই দিকে (প্রত্যাবর্তন) ছাড়া। অতঃপর তিনি তাহাদের প্রতি করুণা করিলেন, যেন তাহারা তাওবা করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাওবা কবুলকারী, করুণাশীল। হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করিতে থাক এবং সত্যবাদীদের সংগ অবলম্বন কর।

হযরত কা'আব (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম! ইসলাম গ্রহণের পর আমার দৃষ্টিতে আল্লাহ তা'আলা আমার উপর সর্বোত্তম নেয়ামত ইহাই দান করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আমি সত্য বলিয়াছি। মিথ্যা বলি নাই। তাহা হইলে ধ্বংস হইয়া যাইতাম, যেমন মিথ্যাবাদীরা ধ্বংস হইয়াছে। কেননা যাহারা মিথ্যা বলিয়াছে তাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক অহী নাযিল করিয়া নিকৃষ্টতম হুঁশিয়ারি দিয়াছেন–

سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ فَاَعْرِضُوا عَنْهُمْ، اِنَّهُمْ رِجْسٌ وَّ مَاْوٰهُمْ

جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ * يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَسِقِيْنَ *

যখন তোমরা তাহাদের নিকট ফিরিয়া যাইবে তখন অবশ্যই তাহারা তোমাদের সামনে আল্লাহর নামে কসম করিবে, যেন তোমরা তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দাও। সুতরাং তাহাদিগকে তোমরা এড়াইয়া যাইও। কেননা তাহারা অপবিত্র। আর তাহাদের ঠিকানা হইল জাহান্নাম, ঐ বদ আমলের কারণে যাহা তাহারা করিয়াছে। তাহারা তোমাদের সামনে কসম করিবে যেন তোমরা তাহাদের প্রতি খুশী হইয়া যাও। যাহাই হউক, যদি তোমরা তাহাদের প্রতি খুশী হইয়া যাও তবে আল্লাহ কিন্তু ফাসিক লোকদের প্রতি খুশী হইবেন না।

হযরত কা'আব (রাঃ) বলেন, আমাদের তিন জনের বিষয়টি বিলম্বিত করিবার অর্থ এই যে, আমাদের তাওবা কবুল করিবার বিষয়টি ঐ লোকদের তুলনায় মুলতবী করিয়া রাখা হইয়াছিল যাহারা কসম করিবার পর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের পক্ষ হইতে (ওযর) গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে বাই'আত করিয়াছিলেন এবং তাহাদের জন্য মাগফিরাত প্রার্থনা করিয়াছিলেন পক্ষান্তরে আমাদের বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুলতবী রাখিয়াছিলেন। এমন কি অবশেষে আল্লাহ তা'আলা وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا আয়াত নাযিল করিয়া ঐ সম্পর্কে ফায়সালা করিলেন।

اَلَّذِيْنَ خُلِّفُوْا (বা যাহাদিগকে পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে) দ্বারা যুদ্ধ হইতে আমাদের পিছাইয়া থাকিবার কথা বলা হয় নাই। বরং যাহারা তাঁহার সামনে কসম করিয়াছিল এবং ওযর পেশ করিয়াছিল আর তিনি তাহাদের ওযর গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের তুলনায় আমাদের তাওবা কবুলের বিষয়টি বিলম্বিত হইবার কথা বলা হইয়াছে।

(বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

এক বর্ণনায় আছে যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃহস্পতিবার দিনে তাবুক অভিযানে বাহির হইলেন। আর তিনি বৃহস্পতিবার দিনে রওয়ানা করাই পছন্দ করিতেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি দিনের প্রথম ভাগে পূর্বাহ্নকালেই সফর হইতে ফিরিতেন। ফিরিয়া প্রথমে মসজিদে যাইতেন এবং দুই রাকাত নামায পড়িয়া সেখানে বসিতেন।

ফায়দা ঃ

(যত গাযওয়া পরিচালনা করিয়াছেন) গাযওয়া অর্থ ঐ সকল অভিযান যাহাতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। উহাদের সংখ্যা সাতাশটি। তন্মধ্যে নয়টিতে লড়াই হইয়াছে। যথা, বদর, অহুদ, মারীসী-এর যুদ্ধ, খন্দক যুদ্ধ, বনু কোরায়যার যুদ্ধ (মদীনার ইহুদী গোত্রবিশেষ) মক্কা বিজয়, হোনায়ন যুদ্ধ ও তায়েফ যুদ্ধ।

ইহাছাড়া মোট সাতচল্লিশটি ছোট বাহিনী বিভিন্ন ছাহাবীর নেতৃত্বে প্রেরণ করা হইয়াছিল। এইগুলিকে সারিয়্যা বলে।

(কোরায়শের বাণিজ্য কাফেলা) ত্রিশজন যাত্রীর বাণিজ্য কাফেলা লইয়া আবু সুফিয়ান সিরিয়া হইতে মক্কা রওয়ানা হইয়াছিলেন। তাহাদের সংগে কোরায়শের বিপুল পরিমাণ বাণিজ্য-সম্ভার ছিল। যখন তাহারা মদীনা হইতে আশি মাইল দূরে বদর নামক স্থানে পৌঁছিল তখন নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেলার খবর পাইলেন এবং সল্প লোকসংখ্যা ও বিপুল পরিমাণ দ্রব্যসম্ভারের কথা জানিতে পারিলেন। এই বাণিজ্য কাফেলাকে ঘায়েল করিবার নিয়তে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবা কেরামের জামা'আত লইয়া বাহির হইয়াছিলেন। নিয়মিত বাহিনীর সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইবার কোন পরিকল্পনা তাঁহার ছিল না। কিন্তু রাওহা নামক স্থানে আসিবার পর তিনি বাণিজ্য কাফেলাকে রক্ষার জন্য কোরায়শ বাহিনীর আগমন সংবাদ পাইলেন। ফলে পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়া আকস্মিকভাবে যুদ্ধ হইয়া গেল।

(আকাবার রাত্রে) অর্থাৎ যেই রাত্রে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মর্মে মদীনার আনছারগণের বাই'আত গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, যদি তিনি মদীনায় হিজরত করিয়া চলিয়া আসেন। তবে তাহারা জান-মাল দিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিবেন এবং জীবন দিয়াও শত্রুর হাত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবেন। আকাবা হইল মিনার সন্নিকটে একটি পাহাড়ী উপত্যকা। এই স্থানে পর পর দুই বৎসর হজ্জ মওসুমে মদীনাবাসীরা রাত্রের অন্ধকারে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে মদীনায় চলিয়া আসিবার দাওয়াত দিয়াছিলেন। প্রথম বৎসর বাই'আত গ্রহণকারীদের সংখ্যা ছিল বারজন। আর পরবর্তী বৎসর হল সত্তর জন। শুধু লাইলাতুল আকাবা বলিলে দ্বিতীয়টিকেই বোঝায়।

বাই'আত গ্রহণের পূর্বে মদীনাবাসীগণ একবার শুধু জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আমরা আপনাকে রক্ষা করিবার ওয়াদা পালন করি তবে বিনিময়ে কি পাইব? তিনি বলিলেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত। তখন তাঁহারা সানন্দে বলিলেন, আমরা রাজি। আপনি হস্ত প্রসারিত করুন; আমরা বাই'আত গ্রহণ করি।

প্রকৃতপক্ষে এই বাই'আতের অর্থ ছিল গোটা আরব-আজমের বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয় মদীনাবাসীর যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার এই নুতন অনুসারীগণের 'প্রাণোৎসর্গী মনোভাব দেখিয়া খুব প্রীত ও সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। আনসারগণ যেমন নবীজীর ওয়াফাত পর্যন্ত জান-মাল কোরবান করিয়া তাঁহাদের কৃত ওয়াদা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন তদ্রূপ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আনছারদের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন। তাঁহাদের তিন পুরুষের জন্য এই বলিয়া তিনি দু'আ করিয়াছিলেন—

اللهم ارحم الانصار و ابناء الانصار و ابناء ابناء الانصار *

হে আল্লাহ! আনছারদের প্রতি রহম করুন। আনছার-সন্তানদের প্রতি রহম করুন এবং আনছার সন্তানদের সন্তানদের প্রতি রহম করুন।

হযরত কা'আব বিন মালিক (রাঃ) দ্বিতীয় আকাবায় শরীক সৌভাগ্যবান লোকদের একজন ছিলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে ইহা এতই সৌভাগ্যের বিষয় ছিল যে, বদর যুদ্ধে শরীক হইতে না পারিবার শোক দ্বিতীয় আকাবার কথা স্মরণ করিয়া ভুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করিতেন।

(বিপুল সংখ্যক মুসলমান ছিলেন) তাবুক যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা এক বর্ণনা মতে ৩০ হাজার। অন্য বর্ণনা মতে চল্লিশ হাজার। আবার তৃতীয় এক বর্ণনা মতে সত্তর হাজার ছিল। এই সংখ্যাগত পার্থক্যের সমাধান এই যে, মদীনা হইতে ত্রিশ হাজার মুজাহিদ বাহির হইয়াছিলেন। পথিমধ্যে সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। আল্লামা মুহম্মদ বিন আল্লান (রহঃ) বলেন, হয়ত মূল যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজার।

লাইলাতুল আকাবাকে তিনি বদরের চাইতে ফযীলতপূর্ণ মনে করিতেন এই কারণে যে, উহা হিজরতের পূর্বের ঘটনা, যখন মুসলমানদের সংখ্যা ছিল একেবারেই নগণ্য এবং ইসলাম ছিল খুবই দুর্বল অবস্থায়। ইহাছাড়া লাইলাতুল আকাবা ছিল হিজরত এবং হিজরতপরবর্তী ইসলামের যাবতীয় জিহাদ ও বিজয়যাত্রার ভিত্তি।

(তাবুক) তাবুক অভিযান সংক্রান্ত আলোচনা পিছনে গিয়াছে।

(অন্য কোন দিক জিজ্ঞাসা করিয়া বিষয়টি গোপন করিতেন।) আধুনিক সমরবিদ্যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল, পরিকল্পনা ও গতিবিধি শত্রুর নিকট হইতে গোপন রাখা এবং শত্রুকে ভুল ধারণায় ফেলিয়া রাখা। আরবদের যুদ্ধ-ইতিহাসে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই সর্বপ্রথম এই রণকৌশল প্রয়োগ করিয়াছিলেন। এইভাবে যুদ্ধের মাঠেও তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ সেনাপতি الحرب خدعة। (যুদ্ধ অর্থ ধোকা) এই দুইটি মাত্র শব্দে তিনি তাঁহার রণকৌশলের এই দিকটি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

কিন্তু ইহার অর্থ নীতি ও নৈতিকতা বিসর্জন দিয়া ছলেবলে কৌশলে কার্যোদ্ধার করা নহে, যেমন বর্তমান যুগের যুদ্ধগুলিতে হইয়া থাকে। বরং যুদ্ধক্ষেত্রেও তাঁহার সত্যবাদিতা ও নীতিনিষ্ঠা এই পর্যায়ে ছিল যে, বদরের যুদ্ধ শুরু হইবার পূর্ব মুহূর্তে দুইজন ছাহাবী আসিয়া হাযির হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে যুদ্ধে শরীক হইবার অনুমতি দান করেন নাই। কেননা তাঁহারা পথিমধ্যে একদল মুশরিকের হাতে আটকা পড়িয়া এই প্রতিশ্রুতির উপর ছাড়া পাইয়াছিলেন যে, তাঁহারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিবেন না। অথচ ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনীর জন্য তখন দুইজন সৈনিকের মূল্য ছিল অনেক। বস্তুতঃ এই নীতিনিষ্ঠা ও আদর্শবাদিতা বর্তমান যুগের নামধারী মুসলমানগণ সামান্য পরিমাণে হইলেও বজায় রাখিয়াছে। তাই দেখা যায়, শত্রু বাহিনীর হাতে ভয়ংকরভাবে নির্যাতিত হওয়া সত্ত্বেও যখন মুসলিম বাহিনীর হাতে সুযোগ আসে। তখন তাহারা উহার পাল্টা প্রতিশোধ গ্রহণ করে না। করিতে পারে না। মুসলিম যোদ্ধাদের এই মানিবক বৈশিষ্ট্যের কথা অন্যরাও যুগে যুগে নিঃসংকোচে স্বীকার করিয়াছে।

(হায় যদি আমি তাহা করিতাম) ইহা হইতে বুঝা গেল যে, কোন নেক কাজে গড়িমসি করা বা আজকাল করিতে থাকা ক্ষতিকর ও বঞ্চিত হইবার কারণ। আরও বুঝা গেল যে, নেক কাজের সুযোগ হাতছাড়া হইবার উপর আফসোস করা জায়েয আছে। বিগত কিছুর ব্যাপারে আফসোস করিবার নিষেধ যেখানে আসিয়াছে সেইখানে দুনিয়াবী বিষয় উদ্দেশ্য।

(বনু সালিমা গোত্রের এক লোক) কুরতুবী (রহঃ) মন্তব্য করিয়াছেন যে, তাহার নাম ছিল আব্দুল্লাহ বিন আনীস। লোকটি সম্ভবতঃ মুনাফিক ছিল এবং হযরত কা'আবের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিত। তাই সে তাঁহার মর্যাদা খাটো করিবার এই সুযোগটি লুফিয়া লইয়াছিল। কিন্তু বিশুদ্ধ মত ইহাই যে, তিনি খাঁটি মুসলমান ও ছাহাবী ছিলেন। তবে কথার গুরুত্ব চিন্তা না করিয়াই ইহা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন।

(মিথ্যা অজুহাত আনিতে লাগিলাম) ইহা দ্বারা ছাহাবা কেরামের আদালত বা ন্যায়পরতার আকীদা ক্ষুণ্ণ হয় না। কেননা এই ক্ষেত্রে তিনি মিথ্যা বলা জায়েয মনে করিয়াছিলেন। কেননা তাঁহার দৃষ্টিতে ইহা ছিল বড় ক্ষতি হইতে (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্রোধ হইতে) রক্ষা পাইবার জন্য কম ক্ষতিকর বিষয় গ্রহণ করা (অর্থাৎ মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা।) তদুপরি আল্লাহ পাক তাঁহাকে ইহা হইতে রক্ষা করিয়া উত্তম পথের পথিক করিয়াছিলেন।

(মিথ্যা দ্বারা তাঁহার অসন্তুষ্টি হইতে বাঁচিতে পারিব না) অর্থাৎ সাময়িকভাবে বাঁচিয়া গেলেও চিরস্থায়ী নাজাত হাছিল হইবে না। কেননা আল্লাহ পাকের নিকট তো কোন কিছু লুকায়িত নাই। আল্লাহর নবীর সহিত মিথ্যা বলিলে আল্লাহ নারায হইবেন। ফলে অপরাধের উপর নূতন অপরাধ হইয়া যাইবে। তদুপরি আল্লাহ যদি অহীর মাধ্যমে তাঁহার নবীকে প্রকৃত বিষয় জানাইয়া দেন, যেমন মুনাফিকদের বেলায় ঘটিয়াছিল তবে তো সবই বরবাদ হইল। বস্তুতঃ আল্লাহ পাক যাহাকে রক্ষা করিবার ইচ্ছা করেন তাহাকে এইভাবে বিশুদ্ধ চিন্তা ও ছহী সমঝ দান করেন।

(চুলায় ফেলিয়া দিলাম) ইহা বড়ই কঠিন পরীক্ষার বিষয় ছিল। প্রত্যেকেই নিজের বুকে হাত রাখিয়া ভাবনা করিয়া দেখুন; যখন মদীনায় তাঁহার সহিত কথা বলিবারও কোন লোক নাই তখন এক বাদশাহ তাঁহার দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়াইতেছে। কিন্তু হযরত কা'আব আপন প্রিয়তম মনিবের অসন্তুষ্টি ও শাস্তি বরদাশ্‌ত করিতে রাজী আছেন। দুনিয়ার কোন বাদশাহের পুরস্কার বা মর্যাদা গ্রহণের কথা কল্পনাও করিতে রাজী নহেন। তাই ঘৃণার সহিত তাহার পত্র চুলায় ফেলিয়া দিলেন। বাস্তবিক এমন ঈমানী দৃঢ়তা ছাহাবা কেরামের পক্ষেই সম্ভব। হযরত কা'আব (রাঃ)-এর ঘটনায় বড় শিক্ষা এই যে, যত কঠিন পরিস্থিতিই হউক এবং যত বিরাট ক্ষতির সম্ভাবনাই থাকুক মুমিনের ঈমানী কর্তব্য হইল সর্বাবস্থায় সত্যবাদিতা অবলম্বন করা। কেননা সত্যবাদিতার সাময়িক ফল যত তিক্তই হউক উহার শেষ পরিণাম উত্তম। পক্ষান্তরে মিথ্যার সাময়িক লাভ যতই লোভনীয় হউক উহার পরিণতি মন্দ।

ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, এই হাদীছ হইতে চল্লিশেরও অধিক মাসআলা জানা যায়। তন্মধ্যে কয়েকটি এই—১। বাই'আত গ্রহণের বৈধতা। ২। কসম করিতে না বলা সত্ত্বেও নিজে উদ্যোগী হইয়া কসম করিবার বৈধতা। ৩। প্রয়োজনে উদ্দেশ্য গোপন রাখিবার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের বৈধতা। ৪। বিদ'আতীদের সহিত উঠা-বসা, সালাম-কালাম ও যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করা। ৫। ইমাম তাহার অধীনস্থকে কথা বলা বন্ধ করিয়া শাস্তি দেওয়া। ৬। তাওবার জন্য স্ত্রী হইতে পৃথক হওয়া। সফর হইতে ফিরিয়া আগে মসজিদে যাওয়া এবং নামায পড়া মুস্তাহাব হওয়া। ৭। সফর হইতে প্রত্যাগত ব্যক্তির সহিত দেখা সাক্ষাৎ করা। ৮। বাহ্যিক অবস্থার উপর ফায়সালা করা এবং অন্তরের বিষয় আল্লাহর হাওয়ালা করা। ৯। স্ত্রীলোকের স্বামীর সেবা করা। ১০। সুসংবাদদান মুস্তাহাব হওয়া। ১১। বিপদ মুছীবত দূর হওয়া বা সুসংবাদ লাভ উপলক্ষে দান করা। ১২। অধৈর্যের আশংকা থাকিলে সমস্ত মাল ছাদাকা করা নিষেধ হওয়া। ১৩। সুসংবাদদাতাকে পুরস্কৃত করা। ১৪। কাহারও আনন্দে পরিচিতদের পক্ষ হইতে অভিনন্দন জানানো। ১৫। আগত ব্যক্তির সহিত মুসাফাহা করা এবং দাঁড়াইয়া স্বাগত জানানো। ১৬।

সিজদায়ে শোকর মুস্তাহাব হওয়া। ১৭। নামাযের মধ্যে চোরা চাহনি দ্বারা নামায নষ্ট না হওয়া, ইত্যাদি।

(দিনের প্রথম ভাগে সফর হইতে ফিরিতেন) মুসলমানদিগকে তিনি সফর হইতে ফিরিয়া রাত্রে আকস্মিকভাবে বাড়ীতে উঠিতে নিষেধ করিয়াছেন। সুবহানাল্লাহ, উম্মতের জিন্দেগীর সকল বিষয়ের উপর কত সূক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল তাঁহার! বস্তুতঃ মানব জীবনের এমন কোন দিক নাই যাহার সম্পর্কে পেয়ারা হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে শিক্ষা দিয়া যান নাই। প্রথমতঃ রাত্রে আসিবার কারণে ঘরওয়ালাদের আরামে ব্যাঘাত হইবে।

দ্বিতীয়তঃ হঠাৎ উপস্থিত হইলে ঘরওয়ালাদিগকে এমন কোন অবস্থায় দেখিবার সম্ভাবনা থাকে যাহা তাহার পছন্দ নহে। ফলে অযথা মনোকষ্টের কারণ হইবে। এমন কি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টিরও সম্ভাবনা থাকে। এমন কি দাম্পত্য জীবনের মূল ভিত্তি যে পারস্পরিক বিশ্বাস, তাহাতেই চিড় ধরিতে পারে। অথচ আল্লাহ পাক চাহেন বান্দার দোষ ত্রুটি ঢাকা থাকুক।

আরেকটি কারণ এই যে, স্ত্রী মাত্রই চাহে যে, তাহার স্বামীর সফর হইতে প্রত্যাবর্তনের মুহূর্তটি আনন্দময় হউক। সুতরাং তাহাকে পর্যাপ্ত সময় দেওয়া উচিত, যাহাতে সে সাজসজ্জা করিয়া স্বামীকে বরণ করিবার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে পারে। এই ধরণের আরও বিভিন্ন হিকমতের কারণে হাদীছ শরীফে উপরোক্ত নিষেধবাণী আসিয়াছে। অবশ্য ঘরওয়ালারা যদি তাহার আগমনের খবর পূর্ব হইতেই জানিয়া থাকে তবে রাত্রে আগমন করাতে কোন বাধা নাই।

(প্রথমে মসজিদে যাইতেন) ইহার উদ্দেশ্য হইল নিজের বাড়ী ঘরের উপর আল্লাহর ঘর মসজিদকে অগ্রাধিকার দান করা এবং মসজিদের তা'যীম প্রকাশ করা এবং নিজের ও পরিবার পরিজনের হকের উপর আল্লাহর হককে অগ্রবর্তী করা এবং সফর হইতে ছহী সালামতে ফিরিয়া আসায় শোকর আদায় করা।

ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানের জীবন মূলতঃ মসজিদকেন্দ্রিক। আল্লাহর ঘর মসজিদের সংগেই তাহার আসল সম্পর্ক। মসজিদের সহিত যাহাদের এই রকম সম্পর্ক থাকিবে কিয়ামতের দিন তাহাদিগকে আল্লাহর পরিবারভুক্ত বলিয়া ডাকা হইবে।

২৩। তাওবার ফযীলত ও কবুলিয়ত

وَعَنْ اَبِيْ نُجَيْدٍ - بِضَمِّ النُّوْنِ وَفَتْحِ الْجِيْمِ - عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ الْخُزَاعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ امْرَاَةً مِنْ جُهَيْنَةَ اَتَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَهِيَ حُبْلٰى مِنَ الزِّنَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اَصَبْتُ حَدًّا فَاَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَلِيَّهَا فَقَالَ: اَحْسِنْ اِلَيْهَا، فَاِذَا وَضَعَتْ فَائْتِنِي، فَفَعَلَ فَامَرَ بِهَا نَبِيُّ اللهِ ﷺ، فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ اَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلّٰى عَلَيْهَا. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَقَدْ زَنَتْ؟ قَالَ: لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِيْنَ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ اَفْضَلَ مِنْ اَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ؟!» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবু নোজায়দ ঈমরান বিন হোছায়ন (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, জোহায়না গোত্রের জনৈকা স্ত্রীলোক যিনার দ্বারা গর্ভবতী অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির হইয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি 'হদ' ওয়াজিব হইবার মত অপরাধ করিয়াছি। সুতরাং আপনি আমার উপর 'হদ' কায়েম করুন। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাহার অভিভাবককে ডাকিয়া বলিলেন, তাহার সহিত উত্তম আচরণ করিও এবং সন্তান প্রসবের পর তাহাকে আমার নিকট লইয়া আসিও। অভিভাবক তাহাই করিল। তখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে 'রজমের' জন্য প্রস্তুত করিবার আদেশ দিলেন। তখন তাহার কাপড়চোপড় ভালোভাবে বাঁধিয়া দেওয়া হইল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে তাহাকে 'রজম' করা হইল। অতঃপর (গোসল ও কাফনের পর) তিনি তাহার জানাযা পড়াইলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে তো যিনা করিয়াছিল। এমতাবস্থায় আপনি তাহার জানাযা পড়াইলেন? তিনি বলিলেন, সে এমন (বিশুদ্ধ) তাওবা করিয়াছে যে, যদি উহা মদীনার সত্তর জন (পাপীর) মাঝে বন্টন করিয়া দেওয়া হয় তবে সকলের (মাগফিরাতের) জন্য যথেষ্ট হইয়া যাইবে। আর তুমি কি ইহার চাইতে উত্তম কিছু দেখিয়াছ যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য সে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করিয়া দিল? (মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

(সুতরাং আপনি আমার উপর হদ কায়েম করুন) হদ হইল নির্দিষ্ট কয়েকটি অপরাধের জন্য শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি। যেমন চুরির শাস্তি হাত কাটা। যিনার শাস্তি (অবিবাহিত হইলে) একশ দোররা এবং (বিবাহিত হইলে) রজম বা পাথর মারিয়া হত্যা করা। মদ্যপানের শাস্তি আশি দোররা। মানুষ হত্যার শাস্তি কেছাছ। ইত্যাদি। অবশ্য প্রতিটি অপরাধ প্রমাণিত হইবার জন্য নির্দিষ্ট কিছু শর্ত রহিয়াছে। যেমন যিনার ক্ষেত্রে নিজে স্বীকার করিতে হইবে কিংবা চারিজন ন্যায়পরায়ণ চাক্ষুষ সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রয়োজন হইবে।

ইমাম রাগিব (রহঃ) তাহার مفردات কিতাবে বলিয়াছেন, 'হদ' অর্থ দুই জিনিসের মাঝে বিদ্যমান অন্তরায় যাহা একটিকে অপরটির সহিত যুক্ত হইতে বাধা দেয়। যেহেতু এই সকল শাস্তি মানুষকে উল্লেখিত পাপসমূহের নিকটবর্তী হইতে বাধা দেয় সেহেতু এই গুলিকে হদ বলে।

তথাকথিত প্রগতিবাদীরা ইসলামী শাস্তি ব্যবস্থাকে মধ্যযুগীয় বর্বরতা বলিয়া ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে। অথচ তাহারা একবারও ভাবিয়া দেখে না যে, ইহা স্বয়ং আমাদের স্রষ্টা আল্লাহর বিধান। সুতরাং ইহার সমালোচনার অর্থ ঈমান হারাইয়া কাফির হইয়া যাওয়া।

ইসলামের উপরোক্ত শাস্তি ব্যবস্থা অতি কঠোর সন্দেহ নাই। কিন্তু এই শাস্তি ব্যবস্থার অনুপস্থিতির ফলে পৃথিবীর মানব সমাজ আজ কোথায় গিয়া পৌঁছিয়াছে, ইহা তাহারা মোটেই ভাবিয়া দেখিতে চাহে না।

অপরাধে তাহাদের তেমন কোন আপত্তি নাই। অহরহ সংঘটিত নৃশংস হত্যা ও পাশবিক ধর্ষণে তাহাদের বিবেকের দংশন নাই। তাহাদের যত আপত্তি এবং বিবেকের যত বাড়াবাড়ি তাহা হইল অপরাধের শাস্তিবিধানের ক্ষেত্রে। অথচ ইতিহাস সাক্ষী যে, শত আইন করিয়াও

যেখানে সমাজকে অপরাধমুক্ত করা সম্ভব হয় না সেইখানে একটি মাত্র ইসলামী হদ কায়েম করিলেই সমাজে অপরাধপ্রবণতা দূর হইয়া যাইতে পারে।

তাই ইরশাদ হইয়াছে:

وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ *

কিছাছের মাঝে তোমাদের জন্য রহিয়াছে জীবন।

অবশ্য মূল অপরাধটাই যাহাতে সংঘটিত হইতে না পারে সেইজন্য শরীয়ত সমাজকে পবিত্র রাখিবার এবং অর্থনৈতিক সচ্ছলতা নিশ্চিত করিবার এবং শান্তি শৃংখলা ও নিরাপত্তা বিধানের যাবতীয় ব্যবস্থা রাখিয়াছে। তাই ইতিহাস সাক্ষী যে, ইসলামী সমাজ কায়েম হইবার পর হদ কায়েম করিবার তেমন কোন প্রয়োজন দেখা দেয় না।

পক্ষান্তরে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় একদিকে অপরাধ সংঘটনের যাবতীয় আয়োজন করিয়া রাখা হইয়াছে। অপরদিকে অপরাধীকে শাস্তি প্রদানেরও ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। যৌন উত্তেজক সকল বিষয় সমাজের সর্বত্র ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। অথচ ধর্ষণের অপরাধে শাস্তিরও ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। তদুপরি শাস্তিটিকে তাহাদের ভাষায় যথেষ্ট 'মানবিক' করিতে যত্ন লওয়া হইয়াছে। ফল যাহা হইবার তাহাই হইতেছে।

যেহেতু আল্লাহ পাক জানেন যে, শরীয়তের আপাত কঠোর শাস্তি ব্যবস্থা অতিদরদীদের অন্তরে খটকা সৃষ্টি করিবে, তাই যিনার শাস্তিবিধান নাযিল করিবার সংগে সংগে এই বলিয়া তিনি সতর্ক করিয়া দিয়াছেন–

وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِيْنِ اللّٰهِ *

আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদিগকে যেন তাহাদের প্রতি দরদ পাইয়া না বসে।

(আমার উপর হদ কায়েম করুন) মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় স্ত্রীলোকটি এই রূপ বলিয়াছেন طَهِّرْنِى (আমাকে পবিত্র করুন।)

এক বর্ণনায় আছে যে, গামেদ গোত্রীয়া স্ত্রীলোকটি যখন আসিয়া যিনার কথা স্বীকার করিলেন এবং হদ কায়েম করিবার আবেদন জানাইলেন তখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে সস্নেহ তিরস্কার করিয়া বলিলেন, যাও ফিরিয়া যাও। তাওবা ইস্তিগফার কর। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে মা'ইযের মত ফিরাইয়া দিতে চাহিতেছেন। অথচ আমি তো যিনার কারণে গর্ভবতী হইয়া পড়িয়াছি।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, স্ত্রীলোকটি (এবং অপর ঘটনায় হযরত মা'ইয) যদি গোপনে তাওবা করিয়া লইতেন তবেই তো তাহাদের গোনাহ মাফ হইয়া যাইত। বিশেষতঃ যখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাদিগকে ফিরিয়া গিয়া তাওবা ইস্তিগফার করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা না করিয়া কেন তাঁহারা নিজেদের গোনাহ এইভাবে প্রকাশ করিয়া দিলেন? উত্তর এই যে, আখিরাতের ভয়ে তাঁহারা এমনই অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, শাস্তি যতই কঠিন হউক দুনিয়াতেই তাঁহারা নিশ্চিতভাবে গোনাহ হইতে পবিত্র হইয়া আল্লাহর দরবারে হাযির হইতে চাহিয়াছিলেন। আর হদ কায়েম হওয়া দ্বারা গোনাহ হইতে পাক হওয়া সুনিশ্চিত ছিল। কেননা হাদীছে আসিয়াছে–

* من فعل شيئا من ذلك فعوقب به فى الدنيا فهو كفارته

কেহ যদি এই ধরণের কিছু করিয়া বসে এবং উহার কারণে দুনিয়াতেই শাস্তি লাভ করে তবে ঐ শাস্তি তাহার জন্য কাফফারা হইয়া যাইবে।

বিশেষতঃ যখন স্বয়ং আল্লাহর রাসূলের আদেশে হদ কায়েম হইবে তখন উহা পাপ মোচনকারী হইবার ব্যাপারে কোনই সন্দেহ থাকে না। পক্ষান্তরে তাওবার ব্যাপারে সন্দেহ থাকে যে, হয়ত উহা কোন কারণে তাওবাতুন-নাছূহ হইল না। কিংবা তাওবা কবুলের যে সকল শর্ত রহিয়াছে উহার কোনটিতে কোন ত্রুটি থাকিয়া গেল। এই জন্য তাহারা সম্ভাবনাদুষ্ট পথ ছাড়িয়া নিশ্চয়তাপূর্ণ পথ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা অবশ্য আলাদা মাসআলা যে, তাওবাহীন হদ গোনাহের কাফফারা হয় না। আল্লাহই উত্তম জানেন।

(উত্তম আচরণ করিও) রহমতের নবী আশংকা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার অভিভাবক আত্মসম্মানবোধের কারণে তাঁহাকে কষ্ট দিতে পারে। অথচ সে তো তাওবা করিয়া নিষ্পাপ হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ ইহা উম্মতের প্রতি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তহীন রহমতেরই বহিঃপ্রকাশ।

(প্রাণ উৎসর্গ করিয়া দিল) অন্য এক বর্ণনায় আছে, গর্ভের কারণে যখন তাঁহাকে ফেরত পাঠানো হইল তখন তিনি প্রসবের পরপর পনুরায় হদ কায়েম করিবার আবেদন করিলেন। কিন্তু এইবারও যখন তাহাকে এই বলিয়া ফেরত পাঠানো হইল যে, বাচ্চার দুগ্ধপান শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। তখন তিনি দুগ্ধপান শেষ হইবার প্রমাণ রূপে বাচ্চার হাতে একটুকরা রুটি সহ আসিয়া হাযির হইলেন এবং বলিলেন, এই দেখুন, বাচ্চা রুটি খাইতেছে। তাহার জন্য আমার আর বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই।

বস্তুতঃ এই ধরনের ঘটনা দুই একজন ছাহাবীর জীবনে ঘটাইয়া উম্মতে মুহম্মদীকে আল্লাহ পাক শিক্ষা দিয়াছেন যে, দেখ; মানবীয় দুর্বলতাবশতঃ গোনাহ হইয়া গেলে আল্লাহর এমনই ভয় অন্তরে জাগ্রত হওয়া উচিত এবং এমন তাওবাই করা উচিত যেমন ছাহাবা কেরাম করিয়াছেন।

(হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন,) এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য আপত্তি উত্থাপন করা নহে বরং হিকমত জানিতে চাওয়া। উত্তরে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে ঐ বিষয়টি ধরাইয়া দিলেন, যাহা তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছিল। কেননা তিনি স্ত্রীলোকটির মন্দ কাজটি তো দেখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বিশুদ্ধ তাওবার বিষয়টি বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

যাহারা ছাহাবা কেরামের জামা'আতে দুই একজনের সারা জীবনের এমনই দুই একটি ঘটনা লইয়া আস্পর্ধামূলক আলোচনা করে তাহাদিগকে আমরা লম্বাচওড়া যুক্তিতর্কের পরিবর্তে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই উত্তরই স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। বস্তুতঃ এই ধরণের তাওবার মনোভাবের কারণেই সকল ছাহাবীর প্রতি আল্লাহ সমভাবেই সন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে—

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

আল্লাহ তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন আর তাহারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

১৪। মানুষের অন্তহীন লোভ লালসা এবং তাওবার সম্ভাবনা

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ اَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ اَحَبَّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهُ وَادِيَانِ، وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ اِلَّا التُّرَابُ ، وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَابَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আদমসন্তান যদি স্বর্ণ বোঝাই একটি উপত্যকাও লাভ করে তবে সে দুইটি উপত্যকার অধিকারী হইতে চাহিবে। মাটি ছাড়া অন্য কিছু তাহার উদর পূর্ণ করিতে পারিবে না। তবে যে ব্যক্তি তাওবা করে আল্লাহ তাহার তাওবা কবুল করেন। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

(মাটি ছাড়া অন্য কিছু) অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত দুনিয়ার প্রতি লোভ তাহার থাকিয়া যায়। কবরের মাটিতে মিশিয়া যাওয়া পর্যন্ত তাহার লোভ লালসা শেষ হয় না। এই সম্পদলিপ্সাই যে মানুষের ধ্বংসের কারণ ইহা কোরআন শরীফের ছূরা তাকাছুরে এইভাবে ইরশাদ হইয়াছে–

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ *

প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদিগকে মোহাচ্ছন্ন রাখে যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও।

এখানে মানুষের স্বভাবগত অবস্থার কথা আলোচনা করা হইয়াছে এবং মানব সম্প্রদায়ের অধিকাংশের অবস্থা তুলিয়া ধরা হইয়াছে। পক্ষান্তরে যাহারা জন্মগতভাবে কিংবা রিয়াযত মোজাহাদা তথা আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে লোভ লালসা ও দুনিয়ার মুহব্বত হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন তাহাদের সৌভাগ্যের কথা আলাদা। দুনিয়ার সহিত তাহাদের সম্পর্ক তো শুধু এতটুকু যে, এক ক্লান্ত সওয়ার পথিমধ্যে গাছের ছায়ায় কিছুক্ষণ বসিয়া বিশ্রাম করিল। অতঃপর আসল মনযিলের দিকে রওয়ানা দিল। দুনিয়াতে তাহারা মুসাফির বা পথিকের মত জীবন যাপন করেন। তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য থাকে কখন এই পথটুকু শেষ করিয়া আখিরাতের অনন্ত সুখের মনযিলে মকসুদে পৌঁছিবেন।

হাদীছে এই দিকে ইংগিত রহিয়াছে যে, দুনিয়ার মুহব্বত ও লোভ লালসা অন্তরে লইয়া যে ব্যক্তি কবরে প্রবেশ করিবে তাহার জন্য ধ্বংস ও বরবাদি ছাড়া আর কিছুই নাই। তবে কেহ যদি তাওবা করিয়া দুনিয়ার লোভ লালসার খাবাছাত ও নাপাকি হইতে নিজেকে পবিত্র করিয়া লয় তবে আল্লাহ পাক তাহার পিছনের গোনাহ্ মাফ করিয়া দিবেন।

হাদীছের শিক্ষা ঃ লোভ লালসাই মানুষের ধ্বংসের মূল। সুতরাং লোভ লালসা হইতে নিজেকে দূরে রাখিতে হইবে এবং জরুরতের সীমায় থাকিয়া জীবন যাপন করিতে হইবে। অবশ্য লোভ লালসার কারণে কোন গোনাহ হইয়া গেলে সংগে সংগে তাওবা করিতে হইবে।

২৫। হত্যা করিবার পর তাওবা ও শাহাদাত

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَضْحَكُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ، يُقَاتِلُ هٰذَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْلِمُ فَيُسْتَشْهَدُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা এমন দুই ব্যক্তি সম্পর্কে হাস্য করেন যাহাদের একজন অপরজনকে হত্যা করে। অতঃপর উভয়ে জান্নাতে প্রবেশ করে। একজন তো আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করিয়া নিহত হয়। অতঃপর হত্যাকারীকে আল্লাহ্ পাক তাওবার তাওফিক দান করেন। ফলে সে মুসলমান হইয়া শাহাদাত বরণ করে।

(বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

আলোচ্য হাদীছের শিক্ষা এই যে, গোনাহের আধিক্য বা জঘন্যতা চিন্তা করিয়া আল্লাহ পাকের অশেষ রহমত হইতে কাহারো নিরাশ হওয়া উচিত নহে। কেননা তিনি তো এমন তাওবা কবুলকারী যে, শহীদের হত্যাকারীকে পর্যন্ত শহীদের পাশাপাশি জান্নাতে স্থান দিতে পারেন।

(হাস্য করেন) আল্লামা কাযী ইয়ায (রহঃ) বলেন, ইহা প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্ পাকের যাতের সহিত যুক্ত হইতে পারে না। কেননা ইহা মাখলূকের গুণ। বরং রূপকভাবে উভয়ের আমলের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশের অর্থে ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে। কেননা মানুষের হাসি তাহার সন্তুষ্টির পরিচায়ক। সুতরাং– অর্থ হইল আল্লাহ্ এমন দুই ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

কাযী ইয়ায (রহঃ) আরও বলেন, ইহা দ্বারা ফিরিশতাগণের হাস্য করাও উদ্দেশ্য হইতে পারে। অর্থাৎ হত্যাকারী ও নিহত উভয়কে যখন জান্নাতে দাখেল করিবার জন্য আল্লাহ্ পাক আদেশ করেন তখন ফিরিশতাগণ আশ্চর্য হইয়া হাস্য করিয়া উঠেন। যেহেতু আল্লাহর আদেশের কারণে ফিরিশতাগণের এই হাস্য সেহেতু ইহাকে আল্লাহর যাতের সহিত সম্পৃক্ত করা হইয়াছে। যেমন বলা হয় বাদশাহ হত্যা করিয়াছেন। অথচ তিনি নিজে হত্যা করেন নাই। বরং তাহার আদেশে হত্যা করা হইয়াছে।

এই প্রসংগে অধিকতর বিস্তারিত আলোচনা পিছনে গিয়াছে।

فيستشهد এখানে ف অব্যয়টি দুইয়ের মাঝে সময়ের অবিলম্বতা জ্ঞাপন করে। অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের পরপরই সে শাহাদাত বরণ করিয়াছিল। এতটা সময় সে বাঁচিয়াই ছিল না, যাহাতে কোন গোনাহ করিতে পারে। (কিংবা নেক আমল করিতে পারে।) শুধু কলবের এক পরিবর্তনের কারণেই সে মহাসৌভাগ্যের অধিকারী হইয়া গেল। ذَالِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَّشَاءُ (ইহা আল্লাহর দান, যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই তিনি ইহা দান করেন।

তবে জান্নাতে দাখেল হইবার ব্যাপারে উভয়ের সমতা মর্তবার ক্ষেত্রেও সমতা প্রমাণ করে না। বরং আমলের তারতম্যের কারণে জা... ...াও তারতম্য হইবে।

৩ অধ্যায়

ছবর ও ধৈর্য

ইমাম রাগিব (রহঃ) তাঁহার مفردات কিতাবে লিখিয়াছেন, صبر শব্দের অর্থ আকল বা শরীয়ত যেই অবস্থার উপর বিদ্যমান থাকা দাবী করে সেই অবস্থার উপর নিজের নফসকে আবদ্ধ রাখা। তদ্রূপ ঐ অবস্থা হইতে নফসকে দূরে রাখা যাহা হইতে দূরে থাকা আকল ও শরীয়ত দাবী করে। সুতরাং যাবতীয় ইবাদতের উপর অবিচল থাকাকেও ছবর বলে এবং যাবতীয় নাফরমানী হইতে বিরত থাকাকেও ছবর বলে। জিহ্বা ও অংগ প্রত্যংগকে অপছন্দনীয় কথা ও কাজ হইতে বিরত রাখাকেও ছবর বলে এবং বিভিন্ন বিপদাপদ ও দুর্যোগের মুখে ধৈর্যধারণ করাকেও ছবর বলে। এই সকল অবস্থাকেই আল্লাহ পাক ছবর আখ্যায়িত করিয়াছেন।

হযরত যুন্নুন (রহঃ) صبر এর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, ছবর অর্থ অবাধ্যতা হইতে দূরে থাকা এবং বিপদের মুখে সংযত থাকা এবং অনটনের মুখে সন্তুষ্টি প্রকাশ করা।

আয়াতসমূহ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوا وَ صَابِرُوا وَ رَابِطُوْا * (وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ)

হে ঈমানদারগণ! (বিপদ মুছীবত ও দুর্যোগের মুখে) ধৈর্য ধারণ কর এবং (কাফিরদের মুকাবেলায়) অবিচল থাক এবং ইবাদতে মনোসংযোগ করিয়া রাখ (অথবা জিহাদে অবস্থান কর।) এবং আল্লাহকে ভয় কর তবেই সফলকাম হইবে।)

আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন—

وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوْعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَ الْاَنْفُسِ وَ الثَّمَرٰتِ وَ بَشِّرِ الصبرين *

অবশ্যই আমি তোমাদিগকে সামান্য ভয় দ্বারা এবং অনাহার দ্বারা এবং জানের ও মালের ও ফল-ফসলের ক্ষতি দ্বারা পরীক্ষা করিব। তবে (এই সকল বিপদাপদের মুখে) ধৈর্যধারণকারীদিগকে সুসংবাদ দান করুন।

আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন—

اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ *

ধৈর্যধারণকারীদিগকে তাহাদের প্রতিদান পূর্ণরূপে হিসাব ছাড়া (অশেষ পরিমাণে) দান করা হইবে।

আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন—

وَ لَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ *

নিঃসন্দেহে যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করিয়াছে (অর্থাৎ জুলুমের শিকার হইবার পর ক্ষমতা পাওয়া সত্ত্বেও প্রতিশোধ গ্রহণ করে নাই) এবং (জুলুমকারীকে) ক্ষমা করিয়া দিয়াছে, নিঃসন্দেহে ইহা বড় উচ্চ মনোবলের কাজ।

আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন–

وَ اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ *

ধৈর্যধারণ ও ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ধৈর্যধারণকারীদের সংগে রহিয়াছেন।

আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন–

وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَ الصّٰبِرِيْنَ *

অবশ্যই তোমাদিগকে আমি পরীক্ষা করিব, যেন জানিয়া লই তোমাদের মধ্য হইতে জিহাদকারী (এবং মেহনতকারী)দিগকে এবং ধৈর্যধারণকারীদিগকে এবং পরীক্ষা করিয়া লই তোমাদের অবস্থা সমূহ।

ধৈর্যধারণের আদেশ এবং ধৈর্যধারণের ফযীলত সংক্রান্ত আয়াত সমূহ সুপ্রচুর এবং সুপরিচিত।

ফায়দা ঃ

প্রথম আয়াতে আল্লাহ পাক চারিটি বিষয়ে নির্দেশ দান করিয়াছেন ১। ছবর ২। মুছাবারাহ ৩। মুরাবাতাহ ৪। তাকওয়া।

ছবর সংক্রান্ত আলোচনা অত্র অধ্যায়ের শুরুতে রহিয়াছে। ইবাদতের ক্ষেত্রে ছবর, নাফরমানীর ক্ষেত্রে ছবর, বিপদাপদের ক্ষেত্রে ছবর, এক কথায় সর্ব প্রকার ছবরই ইহার অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় আদেশ হইল মুছাবারাহ। ইহার ধাতুমূল হইল صبر ইহার অর্থ শত্রুর মুকাবেলায় সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় দান করা। শত্রুর সম্মুখ হইতে পলায়ন না করা। জিহাদের ময়দানে শত্রুর মুকাবেলায় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বাধিক সাহসী ও দৃঢ়। হোনায়নের যুদ্ধে শত্রুদের অপ্রত্যাশিত হামলায় মুসলমানগণ যখন দিশাহারা অবস্থায় ছুটাছুটি করিতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই কঠিন মুহূর্তেও পাহাড়সম দৃঢ়তায় অবিচল ছিলেন। তিনি তখন উচ্চস্বরে বলিতেছিলেন–

انا النبى لا كذب + انا ابن عبد المطلب

আমি সত্য নবী। মিথ্যা নবী নই। আমি আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র মুহম্মদ।

অতঃপর এই উম্মতের মাঝে শত্রুর মুকাবেলায় সাহস, বীরত্ব ও অবিচলতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ছাহাবা কেরাম ছিলেন শ্রেষ্ঠ। তাহাদের তুলনা না বিগতকালে কেহ পেশ করিতে পারিয়াছে না ভবিষ্যতে কেহ পারিবে। তবে মুমিনদের কর্তব্য হইল ছাহাবা কেরামের আদর্শকে সামনে রাখিয়া যথাসম্ভব ইহার উপর আমল করিতে সচেষ্ট থাকা। শত্রুর মুকাবেলায় ভীরুতা

প্রদর্শন বা পলায়ন কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত।

কেহ কেহ صَابِرُوْا -এর এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, তোমরা কাফিরদের সহিত ধৈর্যের মুকাবিলায় অবতীর্ণ হও এবং এই ক্ষেত্রে তাহাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত কর। তাহারা যেন তোমাদের চাইতে ধৈর্যশীল প্রমাণিত না হয়।

তৃতীয় আদেশ হইল মুরাবাতাহ। কোরআন হাদীছের পরিভাষায় رباط বা মুরাবাতাহ দুইটি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

১। ইসলামী ভূখণ্ডের সীমান্তের হিফাযত ও প্রহরায় নিয়োজিত থাকা।

২। নামায ও জামা'আতের এমন ইহতিমাম করা যে, এক নামাযের পর দ্বিতীয় নামাযের অপেক্ষায় বসিয়া থাকা। উভয় প্রকার রিবাতেরই অসংখ্য ফযীলত হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন—

رباط يوم فى سبيل الله خير من الدنيا و ما عليها *

আল্লাহর রাস্তায় এক রাত্রের প্রহরা দুনিয়া এবং দুনিয়ার সমুদয় জিনিস হইতে উত্তম।

পক্ষান্তরে রিবাতের দ্বিতীয় প্রকারের ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে অত্র কিতাবের প্রথম অধ্যায়ের ১১ নং হাদীছে।

চতুর্থ আদেশ হইল তাকওয়া বা আল্লাহভীতি অবলম্বন করা। সর্বশেষে اتقوا الله বলিয়া এই দিকে ইংগীত করা হইয়াছে যে, সকল কাজের উৎস হওয়া উচিত তাকওয়া বা আল্লাহভীতি। তবেই এই সকল আমল দ্বারা সফলতা আসিবে। পক্ষান্তরে তাকওয়া ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য যদি এইগুলির পিছনে ক্রিয়াশীল থাকে তবে এইগুলি উল্টা বরবাদির কারণ হইবে।

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহপাক বান্দাদিগকে বিভিন্ন বিষয় দ্বারা পরীক্ষা করিবার কথা বলিয়াছেন। বান্দাকে এই সকল বিপদাপদে লিপ্ত করিবার উদ্দেশ্য শাস্তি প্রদান করা নহে। বরং রব ও প্রতিপালক হিসাবে বিশেষ প্রতিপালনের মাধ্যমে বান্দাকে আধ্যাত্মিক যোগ্যতার ক্ষেত্রে পূর্ণতা ও উচ্চ মর্যাদা দান করা।

আর যেহেতু আল্লাহ পাক চাহেন যে, বান্দা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হউক এবং কামিয়াবি লাভ করুক সেহেতু বিষয়টি তিনি বান্দাকে আগেই জানাইয়া দিয়াছেন। কেননা বিপদ মুছীবতের কথা আগে হইতে জানিতে পারিলে, তদুপরি যিনি বিপদাপদ পাঠাইতেছেন তাঁহার পক্ষ হইতে আগাম সান্ত্বনা প্রদান করা হইলে ধৈর্য ধারণ করা সহজ হয়।

আমরা অতি বড় নাফরমান। কিন্তু আমাদের মাওলা কত বড় মেহেরবান। আমাদেরই দুনিয়া আখিরাতের উন্নতি এবং আধ্যাত্মিক তরক্কীর জন্য পরীক্ষার ইন্তিজাম করিতেছেন। আবার পূর্ব হইতে সংবাদ দিয়া সান্ত্বনা দান করিতেছেন। সর্বোপরি পূর্ববর্তী আয়াতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পন্থাও বাতলাইয়া দিতেছেন যে, ছবর ও ছালাতের মাধ্যমে আমার নিকট সাহায্য চাহিও; আমি সাহায্য করিব। কিভাবে হইতে পারে এমন মেহেরবান মাওলার নাফরমানী!

মনে রাখিতে হইবে যে, এই পরীক্ষা সমষ্টি পর্যায়ে আসিতে পারে আবার ব্যক্তি পর্যায়েও

আসিতে পারে। তদ্রূপ যদি সমগ্র উম্মত সমষ্টিগতভাবে পরীক্ষায় কামিয়াব হয় তবে সমষ্টিগতভাবেই পুরস্কার লাভ করিবে। পক্ষান্তরে ব্যক্তিগত পর্যায়েও যে যেই পরিমান কামিয়াব হইবে সে সেই পরিমাণ উন্নতি লাভ করিবে।

(بشئ من) অর্থাৎ সামান্য পরিমাণ বিপদাপদ দ্বারা পরীক্ষা করা হইবে।। কেননা আমাদের আমলের কারণে যত বিপদ মুছীবত ও দুর্যোগ আসিবার কথা ছিল সেইগুলির অধিকাংশ হইতে আমাদের অজান্তেই আপন রহমতগুণে আল্লাহ আমাদিগকে হিফাযত করিয়াছেন। সেইগুলির কথা আমরা জানিতেও পারি নাই। সুতরাং সেই তুলনায় এই সকল বিপদ অবশ্যই অতি নগণ্য। ভয় দ্বারা শত্রুর ভয় উদ্দেশ্য। যেমন গাযওয়াতুল আহযাবের সময় শত্রুভীতি দ্বারা পরীক্ষা করা হইয়াছে–

اِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا * هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا *

যখন তাহারা তোমাদের উপর চড়াও হইয়াছিল তোমাদের উচ্চ ভূমি হইতে এবং তোমাদের নিম্নভূমি হইতে আর যখন (ভয়ে) তোমাদের চক্ষু উল্টাইয়া গিয়াছিল এবং প্রাণ কণ্ঠনালী পর্যন্ত আসিয়া পড়িয়াছিল এবং তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে বিভিন্ন বিরূপ ধারণা (করিতে শুরু) করিয়াছিলে। সেই সময় মুমিনগণ পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছিল এবং ভীষণভাবে প্রকম্পিত হইয়াছিল।

এই তো গেল ভয় দ্বারা পরীক্ষার অবস্থা। অপরদিকে ক্ষুধা দ্বারা পরীক্ষার অবস্থা ছিল এই যে, উক্ত আহযাব যুদ্ধের সময় ছাহাবা কেরাম ক্ষুধায় অস্থির হইয়া রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির হইলেন। এমন কি ক্ষুধার যন্ত্রণায় তাঁহাদের পেটে পাথর বাঁধা ছিল।

সম্পদ ও ফলফলাদির ক্ষতির পরীক্ষা হইয়াছিল তাবুক যুদ্ধে। সারা বৎসরের ফল তখন সবে মাত্র পাকিয়াছে। সেই মুহূর্তে আদেশ হইল, বাগানের ফল বাগানে রাখিয়া জিহাদে রওয়ানা হও। তদ্রূপ মুহাজির ছাহাবা কেরামকে ঘর বাড়ী ফেলিয়া হিজরত করিতে হইয়াছিল।

জানের পরীক্ষা আসিয়াছিল সিরিয়ায় যখন মুসলিম বাহিনী প্লেগ রোগে আক্রান্ত হইল এবং বহু ছাহাবা মৃত্যু বরণ করিলেন।

তদ্রূপ কথিত আছে যে, একই দিনে হযরত আনাস (রাঃ)-এর আশিজন সন্তান মৃত্যু বরণ করিয়াছিল আর তিনি সর্বোচ্চ ছবর ও ধৈর্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

এইভাবে যুগে যুগে যাহারা আল্লাহর যত প্রিয় ছিলেন তাহাদের জীবনে এই জাতীয় পরীক্ষা সেই অনুপাতে বেশী আসিয়াছে।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) আরেকটি ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। উহাও বড় সুন্দর ব্যাখ্যা। তিনি বলেন, ভয় দ্বারা আল্লাহর ভয় উদ্দেশ্য এবং ক্ষুধা দ্বারা রমযানের রোযা উদ্দেশ্য এবং সম্পদের হানি দ্বারা যাকাত ও ছাদাকা উদ্দেশ্য এবং নফস বা জান-এর ক্ষতি দ্বারা রোগ ব্যাধি উদ্দেশ্য এবং ছামারা বা ফল দ্বারা সন্তান-সন্ততির মৃত্যু উদ্দেশ্য।

ছামারাত (বা ফল) দ্বারা নিম্নোক্ত হাদীছেও সন্তান বুঝানো হইয়াছে–

عن النبى صلى الله عليه و سلم اذا مات ولد العبد قال الله للملائكة: اقبضتم ولد عبدى، فيقولون نعم فيقول: اقبضتم ثمرة قلبه؟ فيقولون نعم، فيقول الله تعالى ماذا قال عبدى فيقولون: حمدك و استرجع فيقول الله تعالى، ابنو لعبدى بيتا فى الجنة و سموه بيت الحمد *

যখন বান্দার কোন সন্তান মারা যায় তখন আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশতাগণকে জিজ্ঞাসা করেন (অথচ আল্লাহ্ সকল বিষয় জানেন) তোমরা কি আমার বান্দার সন্তান (এর রূহ) কবয করিয়াছ? তাহারা বলেন, হাঁ, তিনি (আবার) জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কি তাহার হৃদয়ের 'ফলটুকু' কবয করিয়াছ? তাহারা বলেন, হাঁ, আল্লাহ্ তায়ালা জিজ্ঞাসা করেন, আমার বান্দা কি বলিয়াছে? তাহারা বলেন, সে প্রশংসা করিয়াছে এবং ইন্নালিল্লাহ পড়িয়াছে। তখন আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈয়ার কর এবং উহার নাম দাও بيت الحمد (বা প্রশংসার ঘর।) (তিরমিযী)

(ছবরকারীদিগকে সুসংবাদ দাও) এই সম্বোধন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে করা হইয়াছে। কিংবা সুসংবাদ দিতে পারে এমন সকল ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হইয়াছে। সেই হিসাবে আমাদের সকলের কর্তব্য হইবে ছবরের আজর ছাওয়াব ও ফাযায়েল শুনাইয়া মানুষকে ছবরের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা।

সামনে ছবরকারীদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তাহারা বিপদগ্রস্ত হইলে اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ (আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তাঁহারই নিকট ফিরিয়া যাইব।) এই দু'আ পড়ে।

বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়া সুন্নত। ইহা এই উম্মতের বৈশিষ্ট্য। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اعطيت امتى شيئا لم يعطه احد من الامم ان تقول عند المصيبة انا لله و انا اليه راجعون *

আমার উম্মতকে এমন একটি জিনিস দান করা হইয়াছে যাহা (পূর্ববর্তী) কোন উম্মতকে দান করা হয় নাই। উহা হইল মুছীবতের সময় ইন্না লিল্লাহি .... বলা।

মুখে ইন্না লিল্লাহ বলিবার সংগে সংগে ইহার ভাব ও মর্মও চিন্তা করিবে যে, এই সকল মুছীবত আমাদের দ্বীন ও দুনিয়ার তরক্কী লাভের জন্যই রবের পক্ষ হইতে পাঠানো হইয়াছে। এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার কিছুই স্থায়ী নহে। আমরা সকলেই আল্লাহর গোলাম। তিনি আমাদের মালিক। যাহা ইচ্ছা দান করেন। যাহা ইচ্ছা ফেরত লন। আমরাও চিরদিন থাকিব না। অনন্ত জীবন লাভের জন্য তাঁহার সান্নিধ্যে ফিরিয়া যাইব এবং ছবর করিলে তাঁহার নিকট উহার বিরাট আজর পাইব। তখন আর কোন বিপদ মুছীবত আসিবে না। সেই সংগে নিজের উপর আল্লাহ পাকের যে অসংখ্য নেয়ামত রহিয়াছে সেইগুলি চিন্তা করিবে। তখন বিদ্যমান মুছীবত খুবই হালকা মনে হইবে এবং ছবর করা সহজ হইবে। অবশ্য মানবীয় দুর্বলতাবশতঃ হায় হুতাশ করা কিংবা দুঃখের বোঝা লাঘবের জন্য কাহারও নিকট বলা ছবরের বিপরীত নহে। (ইবনে কাছীর)

তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ্ পাক ছবরের জাযা বা পুরস্কার ঘোষণা করিয়া বলেন, তাহাদিগকে মাপিয়া মাপিয়া প্রতিদান দেওয়া হইবে না। বরং হিসাব ছাড়া দেওয়া হইবে। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, প্রত্যেক ফরমাবরদার মানুষকে মাপিয়া মাপিয়া (নির্দিষ্ট পরিমাণে) দান করা হইবে। কিন্তু ছবরকারীকে (না মাপিয়া) ভরিয়া ভরিয়া দান করা হইবে।

চতুর্থ আয়াতে মাফ করাকে উচ্চ মনোবলের কাজ বলা হইয়াছে। ইবরাহীম নাখয়ী (রহঃ) বলেন, যদি দেখা যায় যে, মাফ করিলে তাহার আস্পর্ধা ও অত্যাচার আরও বাড়িয়া যাইবে তখন মাফ না করিয়া প্রতিশোধ লওয়া উত্তম। পক্ষান্তরে অত্যাচারী যদি অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয় তবে তাহাকে ক্ষমা করাই উত্তম। (কুরতুবী)

কেননা এক আয়াতে মুমিন বান্দার দুইটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হইয়াছে। যথা – إِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُوْنَ (ক্রুদ্ধ হইলে ক্ষমা করে) আবার إِذَا اَصَابَهُمُ الْبَغْىُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ (যখন তাহারা অত্যাচারিত হয় তখন (সমান সমান) প্রতিশোধ গ্রহণ করে। ক্ষেত্রবিশেষে উভয় পন্থাই উত্তম হইতে পারে। তবে সাধারণতঃ ক্ষমা করাই উত্তম।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেন, ছবর করা ও মাফ করিয়া দেওয়া উচ্চ মনোবলের কাজ। কেননা ইহা আম্বিয়ায়ে কেরামের বৈশিষ্ট্য।

পঞ্চম আয়াতের সারমর্ম এই যে, মানব জাতির যে কোন সংকট ও সমস্যার সমাধানের নিশ্চিত পথ দুইটি। একটি ছবর। অপরটি নামায।

নামায একটি ইবাদত হিসাবে ছবরের অন্তর্ভুক্ত। তুব ইহাকে আলাদা উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য ইহার আলাদা গুরুত্ব প্রকাশ করা। কেননা নামায এমনই একটি ইবাদত যাহাতে 'ছবর'-এর সামগ্রিক প্রকাশ ঘটে। কেননা নামাযের অবস্থায় তো যাবতীয় হালাল ও বৈধ জিনিস হইতেও ছবর করিতে হয়।

বস্তুতঃ নামাযের মধ্যে যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করিবার এবং মুছীবত দূর করিবার একটা বিশেষ উর্ধ্বজাগতিক প্রভাব রহিয়াছে। হাদীছ শরীফে আসিয়াছে–

اذا حزبه امر فزغ الى الصلوة

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কোন বিষয়ে চিন্তাগ্রস্ত হইতেন নামাযের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন।

(আল্লাহ ছবরকারীদের সাথে রহিয়াছেন) ইহা হইল ছবরের সর্বোচ্চ পুরস্কার। ছবরকারী আল্লাহর সান্নিধ্যসৌভাগ্য লাভ করে। আর সর্বশক্তিমান আল্লাহ যাহার সংগে আছেন দুনিয়ার কোন শক্তি তাহার কি ক্ষতি করিতে পারে? কিংবা কোন বিপদ মুছীবত তাহার সামনে কিভাবে টিকিতে পারে?

ষষ্ঠ আয়াতের সারমর্ম এই যে, আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করিব। অর্থাৎ জিহাদের আদেশ করিব এবং দ্বীনের কষ্টকর বিভিন্ন কাজের আদেশ করিব যাহাতে আমি জানিতে পারি, কাহারা জিহাদের আদেশ এবং অন্যান্য দ্বীনী আহকাম ছবরের সহিত পালন করে আর কাহারা অবাধ্যতা প্রকাশ করে।

আল্লাহ তো আদিকাল হইতেই সকল বিষয়ে সর্বব্যাপী ইলম রাখেন। সুতরাং এইখানে জানিবার অর্থ হইল আল্লাহর ইলমে যাহা আছে তাহা ঘটনার মাধ্যমে প্রকাশ পাওয়া।

হাদীছ সমূহ

২৬। নামায হইল নূর, ছবর হইল উজ্জ্বলতা

وَعَنْ اَبِيْ مَالِكٍ الْحَارِثِ بْنِ عَاصِمٍ الْاَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ(٧)، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَأُ الْمِيْزَانَ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَآنِ - اَوْ تَمْلَأُ - مَا بَيْنَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُوْرٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ(١)، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْاٰنُ حُجَّةٌ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ. كُلُّ النَّاسِ يَغْدُوْ، فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا، اَوْ مُوْبِقُهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবু মালিক হারিছ বিন 'আছিম আশ'আরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তাহারাত (বা পবিত্রতা) ঈমানের অর্ধেক এবং আলহামদুলিল্লাহ (এই প্রশংসা বাক্য আমল পরিমাপের) দাঁড়িপাল্লাকে পূর্ণ করিয়া ফেলে এবং সুবহানাল্লাহ ও আলহামদুলিল্লাহ আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী অংশকে পূর্ণ করিয়া ফেলে। আর নামায হইল নূর এবং ছাদাকা হইল (দাতার ঈমানের কিংবা তাহার মুনাফিক না হইবার) প্রমাণ এবং ছবর হইল উজ্জ্বলতা এবং কোরআন হয় তোমার স্বপক্ষে প্রমাণ কিংবা তোমার বিপক্ষে প্রমাণ। প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতিদিন সকালে বাহির হয় এবং (আল্লাহর সংগে) নিজের নফসের সওদা করে। অতঃপর হয় সে উহাকে (জাহান্নামের আযাব হইতে) মুক্ত করে কিংবা (শয়তান ও স্বীয় প্রবৃত্তির সংগে নফসের সওদা করে এবং) উহাকে ধ্বংস করে। (মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

(তাহারাত ঈমানের অর্ধেক) অর্থাৎ অযু গোছল ও তায়াম্মুম দ্বারা যে পবিত্রতা লাভ করা হয় তাহার আজর ও ছাওয়াব বাড়িতে বাড়িতে ঈমানের আজর ও ছাওয়াবের অর্ধেক পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়। কিংবা অর্থ এই যে, হৃদয়ের পবিত্রতা তথা ইখলাছ হইল ঈমানের অর্ধেক। কেননা হৃদয়ের বিশ্বাস, মুখের স্বীকৃতি এবং অংগ প্রত্যংগের আমলের সমন্বয়ই হইল (পূর্ণাংগ) ঈমান। এই ক্ষেত্রে ঈমান শব্দটি সাধারণ অর্থে, অর্থাৎ তাওহীদ ও রিসালাতের বিশ্বাস অর্থে ব্যবহৃত হইল। তবে ইহা দ্বারা নামাযও উদ্দেশ্য হইতে পারে। যেমন কোরআনে ইরশাদ হইয়াছে–

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ *

আল্লাহ তোমাদের নামায নষ্ট করিতে চাহেন না।

আর নামায যেহেতু পবিত্রতা ছাড়া শুদ্ধ হয় না সেহেতু ইহা নামাযের অর্ধেকতুল্য হইল। ইমাম নববী (রহঃ) এই অর্থকেই অগ্রাধিকার দিয়াছেন।

(এবং আলহামদুলিল্লাহ্) অর্থাৎ বিশেষভাবে এই প্রশংসা-বাক্যটি। কেননা ইহা সর্বোত্তম প্রশংসা-বাক্য। এই কারণেই ইহা দ্বারা কালামুল্লাহ শুরু করা হইয়াছে। অবশ্য আল্লাহর যাত ও ছিফাতের যাবতীয় হামদ ও প্রশংসাই এখানে উদ্দেশ্য হইতে পারে।

(দাঁড়িপাল্লা পূর্ণ করে।) প্রশ্ন হইতে পারে যে, আমল তো পদার্থ নহে; গুণ, যাহার আলাদা অস্তিত্ব নাই এবং স্থায়িত্ব নাই এবং নিজস্ব ভর বা ওজন নাই। সুতরাং ইহা মাপা যাইবে কিভাবে? উত্তর এই যে, সেই দাঁড়িপাল্লার রূপ ও হাকীকত কি হইবে এবং আমল পরিমাপেরই হাকীকত ও প্রকৃতি কি হইবে উহা আল্লাহ পাকই উত্তম জানেন। তাঁহার কুদরতে সকল কিছুই সম্ভব। শরীয়তের অকাট্য বাণী দ্বারা যেহেতু ইহা সুপ্রমাণিত সেহেতু বিনা বাক্যব্যয়ে উহা ঐ ভাবেই বিশ্বাস করা ওয়াজিব যেইভাবে উহা আল্লাহর ইলম ও কুদরতে রহিয়াছে। আমাদের ক্ষুদ্র ও সীমাবদ্ধ আকল দ্বারা উহা চিন্তা করা উচিত নহে।

বিশেষতঃ আধুনিক যুগে তো আমরা এমন প্রযুক্তিও দেখিতেছি যাহা স্বর ও শব্দকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেছে। সুতরাং আমলের আলাদা অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব অসম্ভব হইবে কেন? তদ্রূপ আমাদের স্থুল জগতেও আমরা ওজনপূর্ণ বস্তু এবং ওজনহীন বস্তু-গুণের পরিমাপক যন্ত্র দেখিতে পাই। সুতরাং ওজনহীন আমলের উপযুক্ত পরিমাপক থাকা অসম্ভব কি? তাহাছাড়া এমনও হইতে পারে যে, আমলকে শরীরী রূপ দান করা হইবে। সুতরাং কথাটির অর্থ হইবে এই যে, হামদ ও প্রশংসা-বাক্যের যে ভাব ও মর্মগত মর্যাদা উহা যদি শরীরী রূপ ধারণ করে তবে উহা দ্বারাই দাঁড়িপাল্লা পূর্ণ হইয়া যাইবে। তবে হামদের বাণী ও মর্ম উপলব্ধি করিয়া উহা উচ্চারণ করিতে হইবে। حمد শব্দের অর্থ প্রশংসা। অর্থাৎ আল্লাহর যাত ও সত্তার যাবতীয় গুণ ও ছিফাতের স্বীকৃতি এবং তাঁহার প্রদত্ত নেয়ামত সমূহের কৃতজ্ঞতা স্বীকার এবং তাঁহার প্রতি আনুগত্যের ঘোষণা। الحمد -এর ال অব্যয়টি যেহেতু ব্যাপকতাজ্ঞাপক সুতরাং অর্থ হইল যত প্রকার প্রশংসা হইতে পারে সকল প্রশংসার অধিকারী আল্লাহ পাক। কেননা এই বিশাল বিশ্বজগতের সকল বস্তুর এবং উহাদের যাবতীয় গুণ ও সৌন্দর্যের স্রষ্টা আল্লাহ পাক। সুতরাং সৃষ্টির প্রশংসা মূলতঃ স্রষ্টারই প্রশংসা। তদ্রূপ সৃষ্টিজগত এই পর্যন্ত আল্লাহ পাকের যত প্রশংসা করিয়াছে এবং ভবিষ্যতে করিবে আল্লাহ পাক সেই সমস্ত প্রশংসার চাইতে অধিক প্রশংসার উপযুক্ত। বরং انا لا نحصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك (আমরা আপনার প্রশংসা আয়ত্তে আনিতে পারিব না। আপনি স্বয়ং আপনার যে প্রশংসা করিয়াছেন আপনি উহারই উপযুক্ত) অন্তরের এই ভাব ও উপলব্ধিসহ الحمد لله বলিতে হইবে। যাহার অন্তরের ভাব ও উপলব্ধি যত ব্যাপক ও গভীর হইবে তাহার উচ্চারিত الحمد الله দাঁড়িপাল্লার জন্য ততই ভারী হইবে।

(সুবহানাল্লাহ্) অর্থাৎ যাবতীয় দোষ দুর্বলতা হইতে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করা।

হামদ ও তাসবীহের ছাওয়াব এত বিশাল হইবার কারণ এই যে, বিশ্বজগত সর্বক্ষণ আল্লাহ তা'আলার হামদ ও তাসবীহ করিতেছে।

আল কোরআনে ইরশাদ হইয়াছে—

وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ *

সকল বস্তু আল্লাহর প্রশংসাসহ তাসবীহ্ পড়িতেছে। কিন্তু তোমরা তাহাদের (প্রশংসা ও) তাসবীহ বুঝ না।

সুতরাং মানুষ হামদ ও তাসবীহের মাধ্যমে গোটা বিশ্বজগতের নিরন্তর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনাকে যেন সমর্থন করিল এবং ঐ সমগ্র প্রসংশা ও তাসবীহের ছাওয়াবের অধিকারী হইয়া গেল।

(নামায হইল নূর) অর্থাৎ নামায নিজস্ব সত্তায় একটি নূর। বস্তুতঃ সকল নেক আমলই কলবে নূর পয়দা করে কিন্তু নামায ছাড়া বান্দার আর কোন আমলকে নিজস্ব সত্তায় নূর বলা হয় নাই। কোন কোন মতে নামাযের কারণে কিয়ামতের দিন মুমিনের চেহারায় নূর প্রকাশ পাইবে। অন্য মতে নামাযকে নূর বা আলো এই জন্য বলা হইয়াছে যে, উহা অশ্লীলতা ও অন্যায় কাজ হইতে বিরত রাখে এবং ধ্বংস ও বরবাদি হইতে রক্ষা করিয়া সফলতার দিকে পথ প্রদর্শন করে; যেমন আলো মানুষকে পথ চিনিয়া মঞ্জিলে মাকছুদের দিকে চলিতে সাহায্য করে।

(ছাদাকা হইল প্রমাণ) অর্থাৎ ছাদাকা উহার দাতার মুমিন হওয়া এবং মুনাফিক না হওয়া প্রমাণ করে কিংবা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি মুহব্বত থাকা প্রমাণ করে। কেননা সে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মালের প্রতি স্বভাবগত ভালবাসা বিসর্জন দিয়া আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিয়াছে। কোন কোন মতে কেয়ামতের দিন যখন প্রশ্ন করা হইবে যে, মাল কোথায় কোন পথে খরচ করিয়াছ? তখন সে ছাদাকাকে প্রমাণরূপে পেশ করিয়া বলিবে যে, তোমার রাস্তায় খরচ করিয়াছি। এমন অর্থও হইতে পারে যে, কিয়ামতের দিন ছাদাকাকারীর সংগে বিশেষ নিদর্শন থাকিবে। উহাই প্রমাণ করিবে যে, মাল সে কোন পথে খরচ করিয়াছে। ফলে তাহাকে মাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদই করা হইবে না। যেমন আবু দাউদ শরীফে আছে–

كل امرئ فى ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس *

প্রত্যেক মানুষ কেয়ামতের দিন বিচার হওয়া পর্যন্ত তাহার ছাদাকার ছায়াতলে অবস্থান করিবে। সুতরাং এই ছায়াই তাহার ঈমান ও ইখলাছ–এর স্বপক্ষে এবং মাল সঠিক পথে খরচ হইবার স্বপক্ষে প্রমাণরূপে কাজ করিবে।

(ছবর হইল উজ্জ্বলতা) ছবর শব্দটি ব্যাপক অর্থে ধৈর্যের সহিত আল্লাহর ইতা'আত ও আনুগত্য করা এবং নাফরমানি হইতে বাঁচিয়া থাকা এবং অপ্রিয় বিষয়সমূহ বরদাশ্ত করিয়া লওয়া বুঝায়। যেহেতু ছবর দ্বারা মানুষের ভিতরের পাশবিকতা অবদমিত হইয়া রূহানিয়াত শক্তিশালী হয় এবং তাহার মাঝে ফিরিশতা-স্বভাব জাগ্রত হয় সেহেতু ছবরকে ضياء বা নূর বলা হইয়াছে। তবে কোন কোন মতে এখানে ছবর দ্বারা বিশেষ ছবর অর্থাৎ রোযাকে বুঝানো হইয়াছে।

কেননা রোযা শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত ছবর ছাড়া আর কিছু নহে। তাই রোযাকে ছবর শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, صلوة বা নামাযের ক্ষেত্রে نور এবং সাধারণ অর্থে কিংবা রোযা অর্থে صبر-এর ক্ষেত্রে ضياء বলা হইয়াছে। উভয়ের অর্থই আলো। তবে ضياء

হইল আলোর সর্বোচ্চ স্তর। এই জন্যই কোরআন শরীফে সূর্যের সহিত ضياء এবং চন্দ্রের সহিত نور শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে।

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَّ الْقَمَرَ نُوْرًا *

তিনি ঐ সত্তা যিনি সূর্যকে তীক্ষ্ণ আলোকময় এবং চন্দ্রকে স্নিগ্ধ আলোকময় করিয়াছেন।

এখন প্রশ্ন হইল যে, ছালাতের সহিত نور আর ছবরের সহিত ضياء ব্যবহার করিবার হিকমত কি?

যদি ছবর দ্বারা ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করা হয় তবে ত বিষয়টি পরিষ্কার। কেননা তখন শরীয়তের যাবতীয় আমল ছবরের অন্তর্ভুক্ত হইবে। আর সম্মিলিতভাবে সকল আমল নামাযের চাইতে উত্তম। সুতরাং– এই অর্থে صبر-এর সহিত ضياء-এর ব্যবহারই যুক্তিযুক্ত। যাহারা ছবরের অর্থ রোযা করিয়া থাকেন, তাহাদের একদল বলেন, রোযা নামায হইতে উত্তম। কেননা রোযা দ্বারা মানবীয় প্রয়োজন বর্জন করা হয়। ফলে আল্লাহর সহিত তাহার 'মুনাছাবাত' পয়দা হয়। পক্ষান্তরে নামায দ্বারা বিনয় ও দীনতা প্রকাশ করা হয়। এইগুলি হইল বান্দার গুণ। সুতরাং রোযার সহিত ضياء এবং নামাযের সহিত نور ব্যবহার করাই সংগত। যাহরা নামাযকে উত্তম বলেন, তাহাদের বক্তব্য এই যে, এখানে ضياء শব্দের ব্যবহার শ্রেষ্ঠত্বের কারণে নহে। বরং রোযার সম্পর্ক দিবসের সহিত হইবার কারণে ضياء ব্যবহার করা হইয়াছে। (আল্লাহই সর্বোত্তম জানেন।)

(এবং কোরআন) অর্থাৎ তুমি যদি কোরআন তিলাওয়াত করিয়া থাক এবং উহার যাবতীয় আদেশ নিষেধ পালন করিয়া থাক তবে কবরে ফিরিশতাগণের প্রশ্নের সময়, আমল পরিমাপের সময় এবং পোলছিরাতের সময় ইত্যাদি কঠিন সময়গুলিতে কোরআন তোমার পক্ষে দাঁড়াইবে। আর যদি তাহা না কর তবে তোমার বিপক্ষে দাঁড়াইবে।

এক হাদীছ শরীফে আসিয়াছে

من جعله امامه ساقه الى الجنة و من جعله خلفه ساقه الى النار *

যে কোরআনকে তাহার সম্মুখে রাখিবে উহা তাহাকে জান্নাতের দিকে টানিয়া নিবে। আর যে, উহাকে নিজের পশ্চাতে রাখিবে উহা তাহাকে জাহান্নামের দিকে টানিয়া নিবে।

২৭। ছবর হইতে উত্তম কিছু নাই

وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا: اَنَّ نَاسًا مِنَ الْاَنْصَارِ سَاَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَاَلُوْهُ فَاَعْطَاهُمْ، حَتّٰى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُمْ حِيْنَ اَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ بِيَدِهِ: «مَا يَكُنْ عِنْدِيْ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ اَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ. وَمَا اُعْطِيَ اَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَاَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আবু সাঈদ সা'আদ বিন মালক খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, কতিপয় আনছারী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু চাহিল। তিনি

তাহাদিগকে দান করিলেন। তাহারা আবার চাহিল। তিনি আবার দিলেন। এমন কি তাঁহার হাতে যাহা কিছু ছিল শেষ হইয়া গেল। অতঃপর তিনি বলিলেন, আমার কাছে যাহা কিছু থাকে উহা তোমাদিগকে না দিয়া আমি উঠাইয়া রাখিব না। অবশ্য যে (হাত পাতিবার কলংক হইতে) নিজেকে রক্ষা করিতে চাহে আল্লাহ্ তাহাকে কলংকমুক্ত রাখিবেন। আর যে (মানুষের কাছে না চাহিয়া) সচ্ছলতা প্রকাশ করিবে আল্লাহ্ তাহাকে সচ্ছল করিয়া দিবেন। আর যে (অভাব অনটন ও দুনিয়ার অন্যান্য কষ্টের মুখেও) ধৈর্যের ভাব ধরিয়া থাকিবে, (কাহারও নিকট কষ্ট প্রকাশ করিবে না) আল্লাহ্ তাহাকে প্রকৃত ছবরকারী বানাইয়া দিবেন। আর কাহাকেও ছবরের চাইতে উত্তম ও প্রশস্ত কিছু দান করা হয় নাই।

(বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দাঃ

(আনছারদের কিছু লোক) হাফিজ ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন, তাঁহাদের নাম পরিচয় আমি উদ্ধার করিতে পারি নাই। তবে নাসাঈ শরীফের বর্ণনা হইতে বোঝা যায় যে, হযরত আবু সাঈদ নিজেও তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অর্থাৎ তাঁহার আম্মা এক ভীষণ প্রয়োজনে মজবুর হইয়া তাঁহাকে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে কিছু চাহিয়া আনিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। তিনি দরবারে নববীতে হাযির হইয়া বসিয়া পড়িলেন। কিন্তু কিছু বলিবার পূর্বেই নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার অভিমুখী হইয়া বলিলেন–

من استغنى اغناه الله *

যে নিজেকে সচ্ছল গণ্য করিবে আল্লাহ্ তাহাকে সচ্ছল রাখিবেন।

তখন তিনি কিছু না চাহিয়াই ফিরিয়া গেলেন।

(যাহা কিছু ছিল শেষ হইয়া গেল) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বভাব দানশীলতা এমনই ছিল যে, কোন প্রার্থীকে কখনো তিনি না বলিতে পারিতেন না।

কবি বড় সুন্দর বলিয়াছেন–

لو لا التهشد لكانت لاؤه نعم

অর্থাৎ তাঁহার দানশীলতা এমনই সীমাহীন ছিল যে, তাশাহ্হুদের لا না থাকিলে তাঁহার মুখে কখনো لا (না) আসিত না।

(সচ্ছল করিয়া রাখিবেন) সচ্ছলতার সংজ্ঞা হাদীছ শরীফে এইভাবে করা হইয়াছে–

ليس الغنى غنى المال انما الغنى غنى النفس *

সম্পদ-সচ্ছলতা আসল সচ্ছলতা নহে। হৃদয়ের সচ্ছলতাই আসল সচ্ছলতা। কেননা অন্তর সচ্ছল না হইলে সম্পদের পাহাড় জমিয়া গেলেও অন্তর হইতে অভাববোধ দূর হয় না। এমনকি (কবরের) মাটি দ্বারা তাহার পেট না ভরা পর্যন্ত অভাব দূর হইবে না। সুতরাং সচ্ছল করিয়া রাখিবার অর্থ এই যে, সম্পদ তাহার ভাগ্যে যে পরিমাণ লেখা আছে তাহা তো তাহার কাছে আসিবেই। কম হউক বা বেশী হউক। কিন্তু সে যদি লোভ ও চাহিদা বর্জন করে এবং অন্যের নিকট যাহা কিছু আছে উহার প্রতি নিজেকে মুখাপেক্ষী না করে তবে আল্লাহ্ পাক তাহাকে

হৃদয়ের সচ্ছলতা দান করিবেন।

আলোচ্য হাদীছের শিক্ষা এই যে, অন্যের কাছে হাত পাতিয়া নিজেকে ছোট করা উচিত নহে। আর সর্বাবস্থায় ছবর করা কর্তব্য। কেননা ছবর হইল শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

২৮। ছবর ও শোকরের ফযীলত

وَعَنْ أَبِيْ يَحْيٰى صُهَيْبِ بْنِ سِنَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذٰلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ: إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবু ইয়াহয়া ছোহায়ব বিন সিনান (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, মুমিনের বিষয় বড়ই আশ্চর্যজনক। তাহার সবকিছুই তাহার জন্য কল্যাণকর। মুমিন ছাড়া আর কাহারও এই বৈশিষ্ট্য নাই। যদি সে আনন্দদায়ক কিছু লাভ করে তখন সে (আল্লাহর নেয়ামত মনে করিয়া) শোকর করে। ফলে তাহার শোকর তাহার জন্য (ঐ আনন্দদায়ক বিষয় হইতেও) উত্তম হয়। (কেননা উহা আখিরাতে ছাওয়াব লাভের কারণ) আর যদি কষ্টদায়ক কোন কিছুর সম্মুখীন হয় তবে (আখিরাতের ছাওয়াবের আশায়) সে ছবর করে। ফলে তাহার ছবর তাহার জন্য কল্যাণকর হইয়া যায়।

ফায়দাঃ নেয়ামতের শোকর করিলে নেয়ামত আরও বাড়িয়া যায়। যেমন ইরশাদ হইয়াছে–

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيْدَنَّكُمْ *

যদি তোমরা শোকর কর তবে আমি তোমাদিগকে আরও বাড়াইয়া দিব।

এই হাদীছে ছবর ও শোকর উভয় গুণের একত্র সমাবেশ করা হইয়াছে। ইহাই পূর্ণ মুমিনের বৈশিষ্ট্য। পক্ষান্তরে যাহাদের ঈমান দুর্বল তাহারা আল্লাহর নেয়ামতের মর্যাদা বুঝিতে পারে না। তাই শোকরও আদায় করে না। ফলে তাহার নেয়ামত তাহার জন্য আযাব হইয়া যায়। তদ্রূপ বিপদাপদে সে অধৈর্য হইয়া পড়ে এবং অশোভনীয় কথা বলিয়া বসে। ফলে দুনিয়ার কষ্টের সহিত আখিরাতের আযাবও যোগ হয়। আল্লাহ আমাদের অনুগ্রহপূর্বক পূর্ণ ছবর শোকরের তাওফিক দান করুন। আমীন।

শোকর অর্থ কি? এই সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তব্য পাওয়া যায়। যেমন অংগ প্রত্যংগ ও যাবতীয় ধন দৌলতকে আল্লাহর ফরমাবরদারিতে নিয়োজিত করা। আল্লাহর নাফরমানিতে ব্যবহার না করা। এক হাদীছে কুদসিতে আছে, শোকার হিসাবে এতটুকুই যথেষ্ট যে, বান্দা মনে করে যে, নিজের যোগ্যতা বলে সে কিছুই লাভ করে নাই। বরং আমার দান ও অনুগ্রহ রূপেই লাভ করিয়াছে।

২৯। মৃত্যুযন্ত্রণার মুখে ধৈর্য

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ الْكَرْبُ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: وَاكَرْبَ أَبَتَاهُ. فَقَالَ: «لَيْسَ عَلٰى أَبِيْكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ»

فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ : يَا أَبَتَاهُ أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ، يَا أَبَتَاهُ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ، يَا أَبَتَاهُ إِلَى جِبْرِيْلَ نَنْعَاهُ؛ فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا: أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ التُّرَابَ؟ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঠিন অসুস্থ হইলেন। তখন মৃত্যুযন্ত্রণা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। (এই করুণ অবস্থা দেখিয়া) হযরত ফাতিমা (রাঃ) বলিয়া উঠিলেন, হায়! আমার আব্বার কি কষ্ট! তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া) বলিলেন, আজিকার পরে তোমার আব্বার কোন কষ্ট নাই। যখন তাঁহার ওয়াফাত হইল তখন হযরত ফাতিমা (রাঃ) (শোক প্রকাশ করিয়া) বলিলেন, হায়! আমার আব্বা প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দিয়াছেন। আহ! জান্নাতুল ফিরদাউস হইল আমার আব্বার ঠিকানা। আমরা হযরত জিবরীলকে তাঁহার মৃত্যুর শোকসংবাদ দিব।

যখন তাঁহাকে দাফন করা হইল তখন হযরত ফাতিমা (রাঃ) বলিলেন, হে আনাস! রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মাটি নিক্ষেপ করিতে তোমাদের মন চাহিল কিভাবে? (বুখারী শরীফ)

ফায়দাঃ

(মৃত্যুযন্ত্রণা আচ্ছন্ন করিল।) القول الاجل فى حكمة كرب المصطفى عند حلول الاجل

(রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুযন্ত্রণার হিকমত) নামক কিতাবে আছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অত্যুচ্চ মর্যাদার কারণেই তাঁহার মৃত্যুযন্ত্রণা আরও তীব্র হইয়াছিল। কেননা হাদীছ শরীফে আছে—

اشد الناس بلاء الانبياء ثم الاولياء ثم الامثل فالامثل *

নবীগণই হইলেন কঠিনতম বিপদাপদের সম্মুখীন। অতঃপর আল্লাহর ওলীগণ। অতঃপর পর্যায়ক্রমে পরবর্তীগণ (তবে আল্লাহর মুহব্বতের লজ্জতে ঐ কষ্টকে তাঁহারা কষ্টই মনে করেন না।)

বস্তুতঃ এই মৃত্যুযন্ত্রণাদানের মাধ্যমে তাঁহাকে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত উর্ধ্বজাগতিক উন্নতি দান করা হইয়াছিল। প্রশ্ন হইতে পারে যে, আল্লাহর কোন কোন ওলীর মৃত্যুকালীন অবস্থা তো এমনও বর্ণিত হইয়াছে যাহা দ্বারা বোঝা যায় যে, কোন কষ্টই তাঁহাদের হয় নাই। বরং আরাম ও আসানির সংগেই তাঁহাদের মৃত্যু হইয়াছে। উত্তর এই যে, ইহা দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না। কেননা এমন হইতে পারে যে, মৃত্যুযন্ত্রণা দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতিদানের এই প্রক্রিয়া তিনি বরদাশ্‌ত করিতে পারিবেন না বলিয়া আল্লাহ্ পাক তাঁহাকে অনুগ্রহপূর্বক উহা হইতে রক্ষা করিয়াছেন। অথবা মৃত্যুযন্ত্রণা সকলেরই হয় কিন্তু সেই যন্ত্রণার মাঝেও আল্লাহর সকল নেক বান্দার রূহ এমনভাবে টানিয়া লওয়া হয় যেমন চুলকে আটার ভিতর হইতে টানিয়া লওয়া হয়। আর তাঁহাকে এমন সকল দৃশ্য অবলোকন করানো হয় যাহাতে এত কষ্টের মাঝেও সে আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়ে। তবে কাহারো ক্ষেত্রে কষ্টের আবরণে লজ্জত ঢাকিয়া রাখা হয়। আবার কাহারও ক্ষেত্রে লজ্জতের আবরণে কষ্ট ঢাকিয়া রাখা হয়। জনৈক তত্ত্বজ্ঞানী আরও সুন্দর

বলিয়াছেন, আল্লাহওয়ালাদের যে সমস্ত কারামাত প্রকাশ পায় উহা মূলতঃ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই রূহানী ফয়যের কিঞ্চিত প্রকাশ মাত্র। উম্মতের নেককারদের উপর তাঁহার এই রূহানী ফয়য কেয়ামত পর্যন্ত চলিতে থাকিবে।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুযন্ত্রণার ইহাও একটি হিকমত ছিল যে, উম্মত যেন ইহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং স্মরণ রাখে যে, তাহাদের মৃত্যুর সময় কি কঠিন অবস্থা হইতে পারে! এই জন্য নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারবার বলিতেছিলেন ألا ان للموت سكرات (তোমরা সাবধান হও, মৃত্যুর কঠিন যন্ত্রণা রহিয়াছে।)

(হায় আমার আব্বার কষ্ট) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুযন্ত্রণা ও কষ্ট দেখিয়া তাঁহার মনে বড় ব্যথা লাগিয়াছিল এবং আল্লাহর ফায়সালার প্রতি পূর্ণ সন্তুষ্টি এবং পূর্ণ ছবর সত্ত্বেও তাঁহার মুখ হইতে এই ধরনের শোকপূর্ণ কথা বাহির হইয়াছিল। ইহা কামালিয়াতের পরিপন্থী নহে। প্রশ্ন হইতে পারে যে, হাদীছে তো আছে–

العين تدمع و القلب يجزع و لا نقول الا ما يرضى الرب *

চোখ অশ্রুসিক্ত হইবে এবং হৃদয় অস্থির হইবে কিন্তু রব যাহাতে সন্তুষ্ট হন তাহা ছাড়া অন্য কোন কথা বলিব না।

ইহার জওয়াব এই যে, হযরত ফাতেমা (রাঃ) (অধৈর্যমূলক) উচ্চস্বরে উহা বলেন নাই। নচেৎ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই তাঁহাকে নিষেধ করিতেন।

(আজিকার পরে তোমার আব্বার কোন কষ্ট নাই।) অর্থাৎ মৃত্যুর কষ্টের পর আর কোন কষ্ট হইবে না। কেননা কষ্টের ঘর দুনিয়া ছাড়িয়া তিনি আখিরাতে চলিয়া যাইবেন। আর সেখানে আল্লাহ পাক তাঁহার জন্য যে মহামর্যাদা ও পুরস্কার রাখিয়াছেন উহার সর্বোচ্চগুলি সম্পর্কে জানা তো দূরের কথা সর্বনিম্নগুলি সম্পর্কেও তো জানা নাই। তাহাছাড়া হাদীছ শরীফে আছে–

لا راحة للمؤمن دون لقاء ربه *

আপন প্রতিপালকের দীদার ছাড়া মুমিনের শান্তি নাই। (সুতরাং সাইয়েদুল মুরসালীন-এর কথা তো বলাই বাহুল্য।)

(জান্নাতুল ফিরদাউস) ইহা সর্বোচ্চ স্তরের জান্নাত। যেমন হাদীছ শরীফে আসিয়াছে–

اذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فانه سر الجنة

আল্লাহর নিকট যখন তোমরা চাহিবে তখন ফিরদাউস চাহিও। কেননা ইহা জান্নাতের শ্রেষ্ঠ অংশ।

অন্য হাদীছে আছে–

انه وسط الجنة و انه اعلى الجنة و ان سقفه عرش الرحمن *

ইহা জান্নাতের মধ্যমণি। ইহা জান্নাতের উচ্চতম স্তর। ইহার ছাদ হইল রহমানের আরশ।

(হে আনাস! রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মাটি নিক্ষেপ করিতে

তোমাদের মন চাহিল কিভাবে?) অর্থাৎ জীবদ্দশায় তো তোমরা তাঁহার প্রতি এত ভালবাসার পরিচয় দিয়াছ। সেই প্রেমাস্পদের সহিত এমন নির্দয় আচরণ তোমরা করিতে পারিলে কিভাবে? হযরত আনাস (রাঃ) তাঁহার সম্মানার্থে নিরব থাকিলেও অবস্থা যেন বলিতেছিল, আমাদের পক্ষে এইরূপ করা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। আমরা তো তাহাকে ফুলের আঘাতও করিতে পারিতাম না। নিজেদের জীবন এবং স্ত্রী-পুত্র ও কন্যাদের জীবনের বিনিময়ে হইলেও তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে চাহিতাম। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছার সামনে আমাদের ইচ্ছার কি মূল্য! তাই আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বুকে পাথর চাপা দিয়া ইহা করিতে হইয়াছিল। কেননা তিনি আমাদিগকে এইরূপ আদেশ করিয়া গিয়াছিলেন।

বস্তুতঃ হযরত ফাতিমা (রাঃ) যে বুঝিতেছিলেন না তাহা নহে বরং এই সবই ছিলো তাঁহার অন্তরে উথালাইয়া উঠা মহাশোকের কিঞ্চিৎ বহিঃপ্রকাশ। পিতা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুতে তাঁহার কি পরিমাণ মর্মব্যথা হইয়াছিল তাহা কিঞ্চিৎ বোঝা যায় তাঁহার নিম্নোক্ত কবিতা পংক্তি হইতে

ماذا على من شم تربة احمد + الا يشم مدى الزمان الغوالى

আহমদ (সাঃ)-এর রওযার মাটির সুঘ্রাণ একবার যে লইয়াছে সে যদি সারা জীবনও দামী দামী আতরের সুঘ্রাণ না লয় তাহাতে কিই বা আসে যায়।

صبت على مصائب لو انها + صبت على الايام صرن ليالي

আমার উপর এত এত মহাবিপদ ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, দিনের মাথার উপর ঢালিয়া দিলে অন্ধকারে উহা রাত্র হইয়া যাইত।

এই হাদীছ দ্বারা বোঝা যায় যে, প্রিয়জনের মৃত্যুর সময় এই ধরনের শোক প্রকাশ করা জায়েয আছে। কেননা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতিমা (রাঃ)-কে নিষেধ করেন নাই।

আলোচ্য হাদীছের শিক্ষা এই যে, প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হইল অধিক মাত্রায় মৃত্যুকে স্মরণ করা। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং আল্লাহ নিকট মৃত্যুযন্ত্রণা হইতে নাজাত প্রার্থনা করা।

অধ্যায়ের শিরোনামের সহিত আলোচ্য হাদীছের সংযোগ এই দিক হইতে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর কঠিন যন্ত্রণার উপর নিজে পূর্ণ ছবর করিয়াছেন। আবার প্রিয়তমা কন্যা হযরত ফাতিমা (রাঃ)-কেও সান্ত্বনা দান করিয়াছেন।

৩০। সন্তান-শোকে ধৈর্যধারণ

وَعَنْ اَبِيْ زَيْدٍ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَحِبِّهٖ وَابْنِ حِبِّهٖ،

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: اَرْسَلَتْ بِنْتُ النَّبِيِّ ﷺ: اَنَّ ابْنِيْ قَدِ احْتُضِرَ فَاشْهَدْنَا، فَاَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلَامَ وَيَقُوْلُ: «اِنَّ لِلّٰهِ مَا اَخَذَ، وَلَهٗ مَا اَعْطٰى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِاَجَلٍ مُسَمًّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ» فَاَرْسَلَتْ اِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَاْتِيَنَّهَا. فَقَامَ وَمَعَهٗ سَعْدُ بْنُ

عُبَادَةَ، ومَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَرِجَالٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ، فَرُفِعَ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الصَّبِيُّ، فَأَقْعَدَهُ فِيْ حِجْرِهِ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا هٰذَا؟ فَقَالَ: «هٰذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ قُلُوْبِ عِبَادِهِ»، وَفِيْ رِوَايَةٍ: «فِيْ قُلُوْبِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وَمَعْنٰى «تَقَعْقَعُ»: تَتَحَرَّكُ وَتَضْطَرِبُ.

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত খাদেম হযরত যায়দ বিন হারিছা (রাঃ)-এর পুত্র এবং তাঁহার প্রিয়পাত্রের পুত্র প্রিয়পাত্র হযরত উসামা (রাঃ) বলেন,

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক কন্যা তাঁহার খিদমতে খবর পাঠাইলেন যে, আমার পুত্র মৃত্যুযন্ত্রণায় উপনীত হইয়াছে। সুতরাং আপনি তাশরীফ আনুন। তখন তিনি সালামসহ বলিয়া পাঠাইলেন যে, আল্লাহ্ যাহা নিয়াছেন এবং যাহা দান করিয়াছেন সবই তাঁহার এবং তাঁহার নিকট সব কিছুরই একটি নির্ধারিত সময় রহিয়াছে। সুতরাং ছবর করা এবং (আল্লাহর নিকট) প্রতিদানের আশা রাখাই কর্তব্য। তখন তিনি আল্লাহর দোহাই দিয়া খবর পাঠাইলেন যে, আপনি অবশ্যই তাশরীফ আনুন। তখন তিনি তাশরীফ লইয়া গেলেন। তাঁহার সংগে সা'আদ বিন উবাদাহ, মু'আয বিন জাবাল, উবাই ইবনে কা'আব, যায়দ বিন ছাবিত ও আরও বহু লোক ছিলেন। তাঁহার হাতে বাচ্চাকে তুলিয়া দেওয়া হইল। তিনি তাহাকে কোলে বসাইলেন, তখন তাহার শ্বাস উঠা শুরু হইয়াছিল। এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইল। সা'আদ (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহা কি? তিনি বলিলেন, ইহা রহমত (ও মায়া মমতার চিহ্ন) যাহা আল্লাহ্ পাক তাঁহার বান্দাদের অন্তরে দান করিয়াছেন।

অন্য বর্ণনায় আছে, তাঁহার বান্দাদের মধ্যে যাহার অন্তরে ইচ্ছা দান করিয়াছেন। আর আল্লাহ তাঁহার বান্দাদের মধ্যে করুণাশীলদের প্রতিই করুণা করিয়া থাকেন।

(বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা হযরত যায়নাব (রাঃ)-এর। হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন, বিশুদ্ধ মতে হযরত যায়নাবের কন্যা উমামাহ (রাঃ)-এর মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হইয়াছিল। প্রশ্ন হইতে পারে যে, হযরত উমামাহ (রাঃ) তো রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরেও বাঁচিয়া ছিলেন এবং হযরত আলী (রাঃ) তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এমন কি তাঁহার শাহাদাতের সময়ও তিনি স্ত্রীরূপে ছিলেন। ইহার জওয়াব এই যে, হাদীছে তো এমন কোন কথা নাই যাহাতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে বুঝা যায়। সম্ভবতঃ আল্লাহ তাঁহার নবীর সম্মানে এবং নবীকন্যার ছবরের প্রতিদানে তাঁহাকে মৃত্যুদশা হইতে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন।

কোন কোন মতে ইনি পুত্র সন্তান ছিলেন এবং তাহার নাম ছিল আলী।

(ইহা কি?) অন্য রিওয়ায়াতে আছে, সা'আদ বিন ওবাদা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

আপনি কাঁদিতেছেন, অথচ আপনি কাঁদিতে নিষেধ করিয়া থাকেন।

(বান্দাদের অন্তরে দান করিয়া থাকেন।) অর্থাৎ হৃদয়ের শোকসন্তপ্ততার কারণে অনিচ্ছায় যে অশ্রু প্রবাহিত হয় তাহাতে কোন অসুবিধা নাই। বরং ইহা মানুষের অন্তরে আল্লাহ্ প্রদত্ত মায়া মমতারই বহিঃপ্রকাশ। নিষিদ্ধ তো হইল, অস্থিরতা ও অধৈর্য প্রকাশ করা এবং বিলাপ করিয়া কাঁদা।

(আল্লাহর দোহাই দিয়া খবর পাঠাইলেন) হযরত যায়নাব বারংবার অনুরোধ করিয়া পাঠাইতেছিলেন। কেননা তাঁহার বিশ্বাস ছিলো যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতির বরকতে বাচ্চার কষ্ট দূর হইবে। আর শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তাহাই করিয়াছিলেন। তবে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আসিতে না চাহিবার কারণ হইল, প্রথমতঃ আল্লাহর ফায়সালার সামনে আত্মসমর্পণের চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটানো। দ্বিতীয়তঃ ইহা বুঝাইয়া দেওয়া যে, অলীমার দাওয়াতে সাড়া দেওয়া যেমন কর্তব্য এই ক্ষেত্রে উহা তেমন কর্তব্য নহে।

৩১। হকের উপর অবিচল থাকিবার উদাহরণ

وَعَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «كَانَ مَلِكٌ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ، فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لِلْمَلِكِ: إِنِّيْ قَدْ كَبِرْتُ فَابْعَثْ إِلَيَّ غُلَامًا اُعَلِّمْهُ السِّحْرَ؛ فَبَعَثَ إِلَيْهِ غُلَامًا يُعَلِّمُهُ، وَكَانَ فِيْ طَرِيْقِهِ إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ، فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ فَاَعْجَبَه، وَكَانَ إِذَا اَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَيْهِ، فَإِذَا اَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ، فَشَكَا ذٰلِكَ إِلَى الرَّاهِبِ فَقَالَ: إِذَا خَشِيْتَ السَّاحِرَ فَقُلْ: حَبَسَنِيْ اَهْلِيْ، وَإِذَا خَشِيْتَ اَهْلَكَ فَقُلْ: حَبَسَنِيْ السَّاحِرُ.

فَبَيْنَمَا هُوَ عَلٰى ذٰلِكَ إِذْ اَتٰى عَلٰى دَابَّةٍ عَظِيْمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ فَقَالَ: اَلْيَوْمَ اَعْلَمُ آلسَّاحِرُ أَفْضَلُ اَمِ الرَّاهِبُ اَفْضَلُ؟ فَاَخَذَ حَجَرًا فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ اَمْرُ الرَّاهِبِ اَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ اَمْرِ السَّاحِرِ فَاقْتُلْ هٰذِهِ الدَّابَّةَ حَتّٰى يَمْضِيَ النَّاسُ، فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا وَمَضَى النَّاسُ، فَاَتَى الرَّاهِبَ فَاَخْبَرَهُ. فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ: اَيْ بُنَيَّ اَنْتَ الْيَوْمَ اَفْضَلُ مِنِّيْ، قَدْ بَلَغَ مِنْ اَمْرِكَ مَا اَرٰى، وَإِنَّكَ سَتُبْتَلٰى، فَإِنِ ابْتُلِيْتَ فَلَا تَدُلَّ عَلَيَّ؛ وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ، وَيُدَاوِيْ النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الْاَدْوَاءِ. فَسَمِعَ جَلِيْسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ، فَاَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيْرَةٍ فَقَالَ: مَا هٰهُنَا لَكَ اَجْمَعُ إِنْ اَنْتَ شَفَيْتَنِيْ، فَقَالَ: إِنِّيْ لَا اَشْفِيْ اَحَدًا، إِنَّمَا يَشْفِيْ اللّٰهُ تَعَالٰى، فَإِنْ اٰمَنْتَ بِاللّٰهِ تَعَالٰى دَعَوْتُ اللّٰهَ فَشَفَاكَ، فَاٰمَنَ بِاللّٰهِ تَعَالٰى فَشَفَاهُ اللّٰهُ تَعَالٰى، فَاَتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ: رَبِّيْ. قَالَ: وَلَكَ رَبٌّ غَيْرِيْ؟! قَالَ: رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ، فَاَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتّٰى دَلَّ عَلَى الْغُلَامِ، فَجِيْءَ بِالْغُلَامِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: اَيْ بُنَيَّ قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِئُ الْاَكْمَهَ

وَالْاَبْرَصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ فَقَالَ: اِنِّيْ لَا اَشْفِيْ اَحَدًا، اِنَّمَا يَشْفِي اللّٰهُ تَعَالٰى، فَاَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتّٰى دَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ؛ فَجِيءَ بِالرَّاهِبِ فَقِيْلَ لَهُ: اِرْجِعْ عَنْ دِيْنِكَ، فَاَبٰى، فَدَعَا بِالْمِنْشَارِ فَوُضِعَ الْمِنْشَارُ فِيْ مَفْرِقِ رَاْسِهِ، فَشَقَّهُ حَتّٰى وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جِيْءَ بِجَلِيْسِ الْمَلِكِ فَقِيْلَ لَهُ: اِرْجِعْ عَنْ دِيْنِكَ فَاَبٰى، فَوَضَعَ الْمِنْشَارَ فِيْ مَفْرِقِ رَاْسِهِ، فَشَقَّهُ بِهِ حَتّٰى وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جِيْءَ بِالْغُلَامِ فَقِيْلَ لَهُ: اِرْجِعْ عَنْ دِيْنِكَ فَاَبٰى، فَدَفَعَهُ اِلٰى نَفَرٍ مِنْ اَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوْا بِهِ اِلٰى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا فَاصْعَدُوْا بِهِ الْجَبَلَ، فَاِذَا بَلَغْتُمْ ذِرْوَتَهُ فَاِنْ رَجَعَ عَنْ دِيْنِهِ وَاِلَّا فَاطْرَحُوْهُ، فَذَهَبُوْا بِهِ فَصَعَدُوْا بِهِ الْجَبَلَ فَقَالَ: اللّٰهُمَّ اكْفِنِيْهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَرَجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ فَسَقَطُوْا، وَجَاءَ يَمْشِيْ اِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ بِاَصْحَابِكَ؟ فَقَالَ: كَفَانِيْهِمُ اللّٰهُ تَعَالٰى، فَدَفَعَهُ اِلٰى نَفَرٍ مِنْ اَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوْا بِهِ فَاحْمِلُوْهُ فِيْ قُرْقُوْرٍ وَتَوَسَّطُوْا بِهِ الْبَحْرَ، فَاِنْ رَجَعَ عَنْ دِيْنِهِ وَاِلَّا فَاقْذِفُوْهُ، فَذَهَبُوْا بِهِ فَقَالَ: اللّٰهُمَّ اكْفِنِيْهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَانْكَفَاَتْ بِهِمُ السَّفِيْنَةُ فَغَرِقُوْا، وَجَاءَ يَمْشِيْ اِلَى الْمَلِكِ. فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ بِاَصْحَابِكَ؟ فَقَالَ: كَفَانِيْهِمُ اللّٰهُ تَعَالٰى. فَقَالَ لِلْمَلِكِ: اِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِيْ حَتّٰى تَفْعَلَ مَا اٰمُرُكَ بِهِ. قَالَ: مَا هُوَ؟ قَالَ: تَجْمَعُ النَّاسَ فِيْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ، وَتَصْلُبُنِيْ عَلٰى جِذْعٍ، ثُمَّ خُذْ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِيْ، ثُمَّ ضَعِ السَّهْمَ فِيْ كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قُلْ: بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ الْغُلَامِ ثُمَّ ارْمِنِيْ، فَاِنَّكَ اِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ قَتَلْتَنِيْ. فَجَمَعَ النَّاسَ فِيْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ، وَصَلَبَهُ عَلٰى جِذْعٍ، ثُمَّ اَخَذَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ، ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِيْ كَبِدِ الْقَوْسِ، ثُمَّ قَالَ: بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ الْغُلَامِ، ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهْمُ فِيْ صُدْغِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِيْ صُدْغِهِ فَمَاتَ. فَقَالَ النَّاسُ: اٰمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ، فَاُتِيَ الْمَلِكُ فَقِيْلَ لَهُ: اَرَاَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ قَدْ وَاللّٰهِ نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ. قَدْ اٰمَنَ النَّاسُ. فَاَمَرَ بِالْاُخْدُوْدِ بِاَفْوَاهِ السِّكَكِ فَخُدَّتْ وَاُضْرِمَ فِيْهَا النِّيْرَانُ وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِيْنِهِ فَاَقْحِمُوْهُ فِيْهَا اَوْ قِيْلَ لَهُ: اقْتَحِمْ، فَفَعَلُوْا حَتّٰى جَاءَتِ امْرَاَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا، فَتَقَاعَسَتْ اَنْ تَقَعَ فِيْهَا، فَقَالَ لَهَا الْغُلَامُ: يَا اماه اصْبِرِيْ فَاِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

«ذِرْوَةُ الْجَبَلِ»: اَعْلَاهُ، وَهِيَ بِكَسْرِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَضَمِّهَا، وَ«الْقُرْقُوْرُ» بِضَمِّ الْقَافَيْنِ: نَوْعٌ مِنَ السُّفُنِ، وَ«الصَّعِيْدُ» هُنَا: الْاَرْضُ الْبَارِزَةُ، وَ«الْاُخْدُوْدُ»: الشُّقُوْقُ فِي الْاَرْضِ كَالنَّهْرِ الصَّغِيْرِ، وَ«اَضْرَمَ»: اَوْقَدَ، وَ«انْكَفَاَتْ» اَيْ: انْقَلَبَتْ، وَ«تَقَاعَسَتْ»: تَوَقَّفَتْ وَجَبُنَتْ.

হযরত ছোহায়ব (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী যুগে এক বাদশাহ ছিলেন। তাহার এক যাদুকর ছিল। সে

যখন বৃদ্ধ হইল তখন বাদশাহকে বলিল, আমি বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছি। সুতরাং আমার নিকট একটি বালক প্রেরণ করুন। তাহাকে আমি যাদুবিদ্যা শিক্ষা দিব। বাদশাহ তাহার নিকট একটি বালককে যাদুবিদ্যা শিক্ষাদানের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। সে যেই পথ দিয়া (যাদুকরের নিকট) যাওয়া আসা করিত সেই পথে এক সংসারত্যাগী সাধুপুরুষ ছিলেন। বালক ঐ সাধুর নিকট বসিয়া 'ধর্মকথা' শুনিল। যখনই সে যাদুকরের নিকট আসিত তখন সাধুর মজলিসেও (কিছু সময়) বসিত।

(একদিন কিছু বিলম্বে) সে যাদুকরের নিকট আসিল ফলে যাদুকর তাহাকে প্রহার করিল। বালক সাধুর নিকট নালিশ জানাইল। সাধু বলিলেন, যখন তুমি যাদুকরের (প্রহারের) আশংকা করিবে তখন বলিয়া দিও যে, পরিবারের লোকেরা আমাকে ধরিয়া রাখিয়াছিল। আর যদি পরিবারের দিক হইতে আশংকা কর তবে বলিয়া দিও যে, যাদুকর আমাকে ধরিয়া রাখিয়াছিল। এই ভাবেই সে চলিতেছিল। এমন সময় একদিন এক বিরাট প্রাণীর অবির্ভাব হইল এবং মানুষের চলাচল বন্ধ করিয়া দিল। বালকটি তখন বলিল, আজ জানিতে পারিব যে, যাদুকর উত্তম নাকি সাধু উত্তম? সে একটি পাথরখণ্ড লইয়া বলিল, হে আল্লাহ্! যদি সাধুর কাজকর্ম তোমার নিকট যাদুকরের কাজকর্মের চাইতে অধিক পছন্দনীয় হয় তবে এই প্রাণীটি হত্যা কর; যাহাতে মানুষ চলাচল করিতে পারে। এই বলিয়া সে পাথর নিক্ষেপ করিল আর প্রাণীটিও মারা গেল এবং মানুষও চলাচল শুরু করিল। তখন বালক সাধুর নিকট গিয়া তাহাকে ঘটনা জানাইল। সাধু বলিলেন, হে বৎস! আজ হইতে তুমি আমার চাইতে উত্তম। তোমার মর্যাদা কোন্ স্তরে পৌঁছিয়াছে তাহা তো দেখিতেছি। আমার ধারণা, অতি সত্ত্বর তুমি পরীক্ষার সম্মুখীন হইবে। সুতরাং যদি তুমি পরীক্ষার সম্মুখীন হও তবে আমার কথা প্রকাশ করিও না।

(আল্লাহ্ তাহার হাতে এমন আরোগ্য ক্ষমতা দান করিয়াছিলেন যে,) বালকটি জন্মান্ধকে এবং কুষ্ঠরোগীকে ভাল করিয়া দিত এবং মানুষের সমস্ত রোগের চিকিৎসা করিত। বাদশাহর এক সহচর (এই খবর) শুনিতে পাইল। সে ছিল অন্ধ। সে বহু উপঢৌকনসহ বালকটির নিকট আসিয়া বলিল, যদি আমাকে ভাল করিয়া দিতে পার তবে এই সমস্ত কিছু তোমার। সে বলিল, আমি কাহাকেও ভাল করি না। বরং আল্লাহ্ তা'আলা ভাল করেন সুতরাং তুমি যদি আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ঈমান আন তবে আমি আল্লাহর নিকট দু'আ করিব। তিনি তোমাকে আরোগ্য দান করিবেন। লোকটি আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ঈমান আনিল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে শেফা দান করিলেন। অতঃপর সে বাদশাহর দরবারে আসিয়া আগের মতই বসিল। বাদশাহ্ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া দিয়াছে? সে বলিল, আমার প্রতিপালক। বাদশাহ্ বলিলেন, আমি ছাড়া কি তোমার কোন প্রতিপালক আছে? সে বলিল, আমার ও আপনার প্রতিপালক আল্লাহ্। বাদশাহ্ তখন তাহাকে পাকড়াও করিয়া নির্যাতন করিতে লাগিলেন। এমন কি সে বালকটির ঠিকানা বলিয়া দিল। বালককে হাযির করা হইল। তখন বাদশাহ্ তাহাকে বলিলেন, হে বৎস! তোমার যাদু এই স্তরে উপনীত হইয়াছে যে, তুমি জন্মান্ধকে ও কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করিতেছ। ইহা ছাড়াও তুমি এই এই কর। সে বলিল, আমি কাহাকেও সুস্থতা দান করি না। বরং আল্লাহ্ সুস্থতা দান করেন। তখন বাদশাহ্ তাহাকে

পাকড়াও করিয়া নির্যাতন করিতে লাগিলেন। এমন কি সে সাধুর ঠিকানা বলিয়া দিল। তখন সাধুকে আনা হইল এবং বলা হইল যে, তুমি তোমার ধর্ম ত্যাগ কর। তিনি অস্বীকার করিলেন। তখন বাদশাহ্ করাত আনাইলেন এবং তাহার মাথার শিথিতে করাত রাখিয়া দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। এমন কি তাহার দুইভাগ (দুইদিকে) পড়িয়া গেল। অতঃপর বাদশাহ্র সহচরকে হাযির করিয়া বলা হইল, তুমি তোমার ধর্ম ত্যাগ কর। সে অস্বীকার করিল। তখন (বাদশাহ্) তাহার মাথার শিথিতে করাত রাখিয়া তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। এমন কি তাহার দুইভাগ (দুইদিকে) পড়িয়া গেল। অতঃপর বালককে হাযির করিয়া বলা হইল, তুমি তোমার ধর্ম ত্যাগ কর। সে অস্বীকার করিল। তখন বাদশাহ্ তাহাকে তাহার একদল অনুচরের হাতে তুলিয়া দিয়া বলিলেন, তাহাকে অমুক পাহাড়ে নিয়া যাও এবং তাহাকে লইয়া পাহাড়ে আরোহণ কর। যখন তোমরা পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করিবে, তখন যদি সে তাহার ধর্ম ত্যাগ করে (তবে তো ভাল)। নচেৎ তাহাকে (চূড়া হইতে) ফেলিয়া দিও। তাহারা তাহাকে লইয়া পাহাড়ে চড়িল। তখন সে বলিল, হে আল্লাহ্! তুমি যেভাবে ইচ্ছা কর আমার পক্ষ হইতে তাহাদের সহিত বুঝাপড়া কর। তখন তাহাদের সহ পাহাড় কাঁপিয়া উঠিল এবং সকলে পড়িয়া গেল। আর সে হাঁটিয়া বাদশাহ্র নিকট চলিয়া আসিল। বাদশাহ্ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার সাথীদের কি হইল? সে বলিল, আল্লাহ্ তা'আলা আমার পক্ষ হইতে তাহাদিগকে শায়েস্তা করিয়াছেন। তখন তিনি তাহাকে তাহার একদল অনুচরের হাতে দিয়া বলিলেন, তাহাকে এক বড় নৌকায় তুলিয়া নদীর মধ্যস্থানে যাও। তখন যদি সে তাহার ধর্ম ত্যাগ করে (তবে তো ভাল)। নচেৎ তাহাকে নদীতে ফেলিয়া দিও। তাহারা তাহাকে লইয়া গেল। তখন বালক বলিল, হে আল্লাহ্! তুমি যেভাবে ইচ্ছা কর আমার পক্ষ হইতে তাহাদিগকে শায়েস্তা কর। তখন নৌকা তাহাদের সহ উল্টাইয়া গেল এবং তাহারা সকলে ডুবিয়া গেল। আর সে হাঁটিয়া বাদশাহ্র নিকট চলিয়া আসিল। তখন বাদশাহ্ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার সংগীদের কি হইল? সে বলিল, আল্লাহ্ আমার পক্ষ হইতে তাহাদিগকে শায়েস্তা করিয়াছেন। সে বাদশাহ্কে আরও বলিল, যতক্ষণ আপনি আমার কথা মত কাজ না করিবেন ততক্ষণ আমাকে হত্যা করিতে পারিবেন না। বাদশাহ্ জিজ্ঞাসা করিলেন, কি সেই কাজ? সে বলিল, মানুষকে এক স্থানে সমবেত করুন এবং আমাকে শূলে চড়ান। অতঃপর আমার তূণীর হইতে একটি তীর লউন। অতঃপর بسم الله رب الغلام (এই বালকের প্রতিপালক আল্লাহ্র নামে নিক্ষেপ করিতেছি।) বলিয়া নিক্ষেপ করুন। ইহা করিলে আপনি আমাকে হত্যা করিতে সক্ষম হইবেন। তখন বাদশাহ্ লোকদিগকে একস্থানে সমবেত করিয়া তাহাকে শূলে চড়াইলেন। অতঃপর তাহার তূণীর হইতে একটি তীর লইলেন। অতঃপর তীরটি ধনুকের মধ্যস্থলে স্থাপন করিলেন। অতঃপর بسم الله رب الغلام বলিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া তীর ছুঁড়িলেন। তীর তাহার কানের গোড়ায় গিয়া বিঁধিল। বালক তাহার কানের গোড়ায় হাত রাখিল এবং মৃত্যু বরণ করিল। তখন লোকেরা বলিয়া উঠিল, আমরা বালকের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিলাম। তখন বাদশাহ্র সামনে হাযির হইয়া তাহাকে বলা হইল, দেখুন; আপনি যাহা আশংকা করিতেছিলেন তাহাই হইল। মানুষ তো ঈমান আনিয়া ফেলিয়াছে। তখন বাদশাহ্ রাস্তার মুখে একটি গর্ত খনন করিবার আদেশ দিলেন। তাহা খনন করা হইল এবং তাহাতে অগ্নি প্রজ্বলিত

করা হইল। বাদশাহ্ বলিলেন, যে তাহার ধর্ম ত্যাগ করিতে রাজী হইবে না তাহাকে উহাতে ফেলিয়া দাও। তাহাই করা হইল। অবশেষে এক স্ত্রীলোকের পালা আসিল। তাহার সহিত তাহার শিশুপুত্রও ছিল। স্ত্রীলোকটি আগুনে পড়িবার ভয়ে শংকিত হইয়া থামিয়া গেল। তখন (কোলের) শিশু বলিয়া উঠিল, মা। ধৈর্যধারণ করুন! নিঃসন্দেহে আপনি সত্যের উপর আছেন। (মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

(তাহার এক যাদুকর ছিল) সেই যুগে যাদুবিদ্যার খুব প্রচলন ছিল। যাদুকরদিগকে সর্বজ্ঞানী মনে করা হইত। তাই লোকেরা তাহাদের নিকট ভবিষ্যতের শুভ অশুভ জানিতে চাহিত, আর তাহারাও আন্দাজ অনুমানের উপর ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া মানুষকে বোকা বানাইত। রাজদরবারেও যাদুকরকে বিশেষ সম্মানের সহিত স্থান দেওয়া হইত এবং রাজা তাহার পরামর্শক্রমে ও ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে রাজকার্য পরিচালনা করিতেন।

(পরিবারের লোকেরা আমাকে) এই মিথ্যা ভাষণ দুই প্রতিপক্ষের মাঝে সমঝোতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলিবার সমতুল্য। কেননা উভয় ক্ষেত্রেই কল্যাণ সাধন ও নির্যাতন হইতে রক্ষা করা উদ্দেশ্য।

যেহেতু বালকটি যাদুকরের নিকট যাইবার পথে এবং যাদুকরের নিকট হইতে বাড়ীতে ফিরিবার পথে দুইবার সাধুর মজলিসে বসিত সেই জন্য যাদুকরের কাছেও বিলম্বের জন্য প্রশ্নের সম্মুখীন হইত আবার পরিবার পরিজনের কাছেও প্রশ্নের সম্মুখীন হইত।

(এক প্রাণীর আবির্ভাব হইল।) তিরমিযি শরীফের বর্ণনা মতে উহা সিংহ ছিল। এই হাদীছ দ্বারা আওলিয়া কেরামের কারামাতের সত্যতা প্রমাণিত হয়।

(সাধুকে সমস্ত ঘটনা জানাইল) যেহেতু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ঘটনা বর্ণনা করিয়া অসমর্থনসূচক কিছু বলেন নাই সেহেতু প্রমাণিত হয় যে, নিজের প্রশংসার বিষয় অপরের সামনে আলোচনা করা জায়েয আছে, যদি তাহাতে আত্মতুষ্টির আশংকা না থাকে।

(পরীক্ষার সম্মুখীন হইবে) হয়ত কাশফের মাধ্যমে ইহা তাহার সামনে প্রকাশ পাইয়াছিল। কিংবা সাধারণ অবস্থার উপর ভিত্তি করিয়া অভিজ্ঞতার আলোকে বলিয়াছিলেন। কেননা মানুষের প্রচলিত বিশ্বাস ও বদ্ধমূল সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে গেলে মানুষ তাহার বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। বিশেষতঃ তাহার এই প্রতিবাদ যাহাদের কায়েমী স্বার্থে আঘাত করে সমাজের সেই মাথাওয়ালারা তাহার পিছনে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যায় এবং ভয়-ভীতি ও লোভ-লালসার অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া সাধারণ মানুষকে তাহার পিছনে লেলাইয়া দেয়। এইভাবে সত্যপন্থী লোকটি অভাবনীয় পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়া পড়ে।

এখান হইতে ইহাও বোঝা যায় যে, মানুষ যখন আল্লাহর দরবারে বিশেষ মর্যাদা লাভ করিয়া বেলায়েতের (বুজুর্গীর) দরজায় উপনীত হয় তখন তাহার উপর আল্লাহর পক্ষ হইতে বিভিন্ন আযমাইশ ও পরীক্ষা আসিয়া থাকে।

(পাহাড় কাঁপিয়া উঠিল) ইহা দ্বারা বোঝা যায়, যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে এবং শক্তি সামর্থ্যহারা হইয়া সর্বান্তকরণে তাঁহার সাহায্য প্রার্থী হয় আল্লাহ তাহাকে গায়বীভাবে সাহায্য করিয়া থাকেন।

(বাদশাহর নিকট হাঁটিয়া চলিয়া আসিল।) তাহার উদ্দেশ্য ছিল বাদশাহকে আল্লাহর কুদরত দেখানো যে, কিভাবে তিনি আপন প্রিয় বান্দাগণের মদদ করিয়া থাকেন; যাহাতে বাদশাহর অন্তর হইতে গোমরাহির পর্দা সরিয়া যায় এবং ঈমান গ্রহণ করা তাহার জন্য সহজ হয়। ইহা দ্বারা এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে, দা'ঈ ইলাল্লার (আল্লাহর পথে আহ্বানকারীর) কর্তব্য হইল, চরম মুহূর্তেও চরম শত্রুর কল্যাণ কামনা করা এবং তাহার হিদায়াতের চেষ্টা করা। কিন্তু বাদশাহ ছিল ঐ লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলিয়াছেন–

لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَ لَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا وَ لَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا اُولٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَل وَ اُولٰئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ *

তাহাদের অন্তর রহিয়াছে কিন্তু উহা দ্বারা তাহারা উপলব্ধি করে না এবং তাহাদের চক্ষু রহিয়াছে কিন্তু উহা দ্বারা তাহারা (আল্লাহর নিদর্শনাদি) অবলোকন করে না এবং তাহাদের কর্ণ রহিয়াছে কিন্তু উহা দ্বারা তাহারা সত্যের বাণী শ্রবণ করে না। উহারা পশুতুল্য বরং আরও অধিক ভ্রষ্ট। উহারাই গাফেল।

বস্তুতঃ হিদায়াত লাভের জন্য শুধু যুক্তি প্রমাণ ও নিদর্শনাদি বিদ্যমান থাকাই যথেষ্ট নহে। আল্লাহর পক্ষ হইতে তাওফিকও জরুরী। আর আল্লাহ তাহাদিগকেই তাওফিক দান করেন যাহারা সত্যের সন্ধান লাভ করিতে চাহে এবং চক্ষু কর্ণ ও হৃদয় দ্বারা সত্যকে গ্রহণ করিতে সচেষ্ট হয়।

(যতক্ষণ আপনি আমার কথা মত কাজ না করিবেন) বালক বাদশাহর ঈমান আনয়নের বিষয়ে নিরাশ হইয়া সাধারণ মানুষের মাঝে তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছাইবার নিয়ত করিল এবং বাদশাহকে দিয়াই সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করাইল। কিন্তু সত্যের প্রতি শত্রুতা পোষণ মানুষকে এমনই নির্বোধ বানাইয়া দেয় যে, সে বালকের কৌশল কিছুই টের পাইল না।

বাদশাহ সত্যের যে নিদর্শন বারবার তিনবার অবলোকন করিয়াও হিদায়াত পাইল না, সাধারণ মানুষ সেই নিদর্শন একবার অবলোকন করিয়াই ঈমান আনিয়া ফেলিল। আল্লাহ সত্যই বলিয়াছেন وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ কিন্তু আল্লাহ যাহাকে চাহেন তাহাকে হিদায়াত দান করেন।

(শিশু বলিয়া উঠিল) অর্থাৎ শিশুটির কথা বলিবার বয়স ছিল না। কিন্তু আল্লাহর কুদরতে সে কথা বলিয়া উঠিল, যাহাতে ঈমানের উপর তাহার আম্মা অবিচল থাকিতে পারে।

ওলামায়ে কেরামের মতে মোট দশজন শিশু দোলনায় থাকিবার বয়সে আল্লাহর কুদরতে কথা বলিয়াছিল।

এই হাদীছ দ্বারা ছবরের মর্যাদা প্রমাণিত হইল। বস্তুতঃ বিপদ ও পরীক্ষা যতই কঠিন ও ভয়ংকর হউক। আখিরাতের ছাওয়াব ও পুরস্কারের কথা যখন অন্তরে বিদ্যমান থাকে এবং

অন্তর্চক্ষু দ্বারা আল্লাহর কুদরত ও তাজাল্লী অবলোকন করিতে থাকে তখন সকল কিছু হাসিমুখে বরণ করিয়া লওয়া মানুষের জন্য সহজ হইয়া যায়।

শরীয়তের বিধান এই যে, সকল নির্যাতনের মুখে দ্বীনের উপর অবিচল ও অনমনীয় থাকাই উত্তম। তবে এই ধরনের অবস্থায় অন্তরে ঈমান পোষণ করিয়া মৌখিক কুফুরি বাক্য দ্বারা আত্মরক্ষা করিবার অনুমতি শরীয়তে রহিয়াছে। প্রথমটির আদর্শ হইলেন হযরত বিলাল (রাঃ)। শত নির্যাতনের মুখেও তিনি আহাদ! আহাদ! বলা পরিত্যাগ করেন নাই। পক্ষান্তরে দ্বিতীয়টির আদর্শ হইলেন, হযরত আম্মার বিন ইয়াসির। কঠিনতম নির্যাতনের মুখে তিনি কাফিরদের মনঃপুত বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন। তবে হযরত বিলাল (রাঃ)–এর আদর্শই উত্তম। কেননা হাদীছ শরীফে আসিয়াছে, (মিথ্যা নবুওয়তের দাবীদার ভণ্ড) মুসায়লামাতুল কাযযাব দুইজন ছাহাবীকে বন্দী করিয়াছিল। একজনকে সে প্রশ্ন করিল, মুহম্মদ সম্পর্কে তুমি কি বল? ছাহাবী উত্তর দিলেন, তিনি আল্লাহর রাসূল। সে জিজ্ঞাসা করিল, আমার সম্পর্কে কি বল? তিনি বলিলেন, তুমিও। তখন সে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল। অপরজনকে জিজ্ঞাসা করিল, মুহম্মদ সম্পর্কে তুমি কি বল? ছাহাবী বলিলেন, তিনি আল্লাহর রাসূল। সে জিজ্ঞাসা করিল, আমার সম্পর্কে কি বল? তিনি বলিলেন, জানি না। এইভাবে সে জিজ্ঞাসা করিতে থাকিল আর তিনি ঐ উত্তর দিতে থাকিলেন। অবশেষে সে তাঁহাকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই খবর শুনিয়া বলিলেন, তাহাদের একজন তো আল্লাহ্ প্রদত্ত রোখসত ও অবকাশ গ্রহণ করিয়াছে আর অপর জন সত্যের উদাত্ত ঘোষণা দিয়াছে। সুতরাং সে মুবারক হউক।

(ইবনে কাছীর)

৩২। প্রথম শোকাঘাতে ছবর করাই আসল সাহসিকতা

وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ: «اتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِيْ»، فَقَالَتْ: اِلَيْكَ عَنِّيْ؛ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيْبَتِيْ! وَلَمْ تَعْرِفْهُ، فَقِيْلَ لَهَا: اِنَّهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَاَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمْ تجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِيْنَ، فَقَالَتْ: لَمْ اَعْرِفْكَ، فَقَالَ: «اِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الاُوْلٰى» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٤).

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «تَبْكِيْ عَلٰى صَبِيٍّ لَهَا».

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক স্ত্রীলোকের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। সে এক কবরের পাশে বসিয়া কাঁদিতেছিল। তিনি বলিলেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং ছবর কর। সে বলিয়া উঠিল, দূর হও তুমি। আমার মত বিপদ তো তোমার আসে নাই। (আসলে) সে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিনিতে পারে নাই। তাহাকে বলা হইল, ইনি তো নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তখন অনুতাপ প্রকাশ করিবার জন্য সে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরওয়জায় আসিল। কিন্তু সেখানে কোন দারোয়ান দেখিতে পাইল না। সে বলিল, আমি আপনাকে চিনিতে পারি নাই। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আসল ছবর হইল প্রথম শোকাঘাতের সময়।

(বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

মুসলিম শরীফের বর্ণনায় আছে যে, স্ত্রীলোকটি তাহার এক পুত্রের মৃত্যুতে বিলাপ করিতেছিল।

ফায়দা ঃ

হাফেজ ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন, স্ত্রীলোকটির নাম-পরিচয়, তদ্রূপ কবরবাসী লোকটির নাম-পরিচয় উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। তবে এতটুকু বোঝা গিয়াছে যে, কবরবাসী হইল স্ত্রীলোকটির পুত্রসন্তান। স্ত্রীলোকটি মদীনার ঐ সকল পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না, যাহাদের সংগে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আসা যাওয়া ছিল।

(আল্লাহকে ভয় কর।) আবু নাঈমের বর্ণনায় এই রূপ আছে يا امة الله اتقى و اصبرى (হে আল্লাহর বান্দী! আল্লাহকে ভয় কর এবং ছবর কর।) আল্লাহর বান্দী বলিয়া এই দিকে ইংগিত করা হইয়াছে যে, তুমি এবং তোমার সন্তান উভয়ে আল্লাহর মালিকানাধীন। সুতরাং দাসত্ব ও বন্দেগীর দাবী হইল আল্লাহর ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা।

আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) বলেন, আপনজনের মৃত্যুশোকে সাধারণ কান্না এবং অশ্রুবর্ষণ নাজায়েয নহে। সুতরাং বোঝা যায় যে, স্ত্রীলোকটি হয়ত অতিরিক্ত কাঁদিতেছিল এবং উচ্চস্বরে বিলাপ করিতেছিল।

নিম্নোক্ত বর্ণনায় ইহার সমর্থন পাওয়া যায়–

فسمع منها ما يكره فوقف عليها

তিনি তাহার (মুখ) হইতে অপছন্দনীয় কিছু শুনিতে পাইলেন। তাই তাহার নিকটে গিয়া থামিলেন।

আল্লামা তীবী (রহঃ) বলেন, اتقى (আল্লাহকে ভয় কর) কথাটা বলা হইয়াছে ছবরের আদেশদানের পূর্বে প্রথমে তাহাকে ছবরের প্রতি উদ্বুদ্ধ করিয়া লইবার জন্য। কেননা অধ্যায়ের শুরুতে যে তিন প্রকার ছবরের কথা বলা হইয়াছে তাহা ঐ ব্যক্তির পক্ষেই করা সম্ভব যাহার অন্তরে আল্লাহ পাকের ভয় আছে। সুতরাং যেন স্ত্রীলোকটিকে বলা হইল যে, যদি ছবর করিতে না পার তবে আল্লাহর ক্রোধ ও শাস্তির ভয় কর। আর যদি ছাওয়াব ও প্রতিদান পাইবার আশা কর তবে ছবর কর।

(আমার বিপদ তো আর তোমার আসে নাই) আবু ইয়ালার সূত্রে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে স্ত্রীলোকটির মন্তব্য এইভাবে আসিয়াছে–

يا عبد الله انى الحراء الثكلى، و لو كنت مصا بالعذرتنى *

হে আল্লাহর বান্দা! আমি পুত্রহারা মা। তুমিও যদি মুছীবতগ্রস্ত হইতে তবে আমাকে মাযুর মনে করিতে।

(তাহাকে বলা হইল) আবু ইয়ালা ও তাবরানীর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, হযরত ফযল বিন আব্বাস (রাঃ) তাহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি তাঁহাকে চিন? স্ত্রীলোকটি বলিলেন, না। হযরত ফযল (রাঃ) তখন পরিচয় দিয়া বলিলেন, ইনি তো আল্লাহর রাসূল।

মুসলিম শরীফের বর্ণনায় আছে فاخذها مثل الموت অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিচয় পাইয়া ভয়ে, লজ্জায় ও অনুশোচনায় মনে হইল যেন তাহার চেহারায় মৃত্যুর বিবর্ণতা দেখা দিয়াছে।

(দারোয়ান দেখিতে পাইল না) আল্লামা তীবী (রহঃ) বলেন, বর্ণনাকারীর পক্ষ হইতে এই মন্তব্য করিবার কারণ এই যে, স্ত্রীলোকটির ধারণা ছিল যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাজা বাদশাহদের মত হইবেন, যাহার রাজপ্রাসাদ থাকিবে এবং লোকদিগকে তাহার দরবারে যাওয়া হইতে বাধাদান করিবার জন্য দারোয়ান ও প্রহরী থাকিবে। কিন্তু দরবারে রিসালাতে হাযির হইয়া তিনি পরিস্থিতি সর্ম্পূণ বিপরীত দেখিতে পাইলেন।

বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা তো ছিল এই যে, একবার তিনি আসবাবপত্রশূন্য এক ঘরে খালি চাটাইয়ের উপর শয়ন করিয়াছিলেন। ফলে তাঁহার পাক বদনে চাটাইয়ের দাগ পড়িয়া গিয়াছিল। ইহা দেখিয়া হযরত ওমর (রাঃ) কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দু'আ করুন, আপনার উম্মত যেন প্রাচুর্য লাভ করে। রোম ও পারস্যের বে-দ্বীন লোকেরা আল্লাহর ইবাদত না করা সত্ত্বেও প্রাচুর্য লাভ করিতেছে। নহর ও বাগ-বাগিচার ছায়ায় জীবন কাটাইতেছে। অথচ আপনি দো-জাহানের বাদশাহ হওয়া সত্ত্বেও আপনার এই অবস্থা!

এই কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন, খাত্তাবের পুত্র! এখনো তুমি সন্দেহের ভিতরে পড়িয়া আছ! শোন! আখিরাতের প্রাচুর্য দুনিয়ার প্রাচুর্য হইতে অনেক উত্তম। কাফিররা তাহাদের উত্তম ও মজাদার জিনিস দুনিয়াতেই পাইয়া গিয়াছে। আর আমাদের জন্য আখিরাতে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে।

তাহাছাড়া দুনিয়ার রাজা বাদশাহরা তো হইল মানুষের গর্দানের বাদশাহ। তাই তাহাদের প্রহরী দলের প্রয়োজন হইত। পক্ষান্তরে তিনি তো ছিলেন দোজাহানের সরদার। মানুষের হৃদয়জগতের বাদশাহ। ফিরেশতাগণ ছিলেন তাঁহার পাহারাদার। সুতরাং মানব প্রহরীর কোন প্রয়োজন ছিল না তাঁহার।

(আসল ছবর হইল প্রথম শোকাঘাতের সময়) কেননা ঐ সময় ছবর করা খুবই কষ্টকর। পক্ষান্তরে পরবর্তী সময়ে তো স্বাভাবিকভাবেই সান্ত্বনা লাভ হইয়া যায়। সুতরাং শোকাঘাতের প্রথম মুহূর্তে আল্লাহর ভয় এবং ছাওয়াবের আশায় ছবর করাই হইল প্রশংসার যোগ্য।

আল্লামা তীবী (রহঃ) বলেন, 'আমি আপনাকে চিনিতে পারি নাই।' স্ত্রীলোকটির এই মন্তব্যের যে উত্তর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দান করিয়াছেন, উহাকে অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় اسلوب الحكيم (বা প্রাজ্ঞজনের বাচন-ভংগী) বলে। অর্থাৎ মূল প্রশ্নের উত্তর না দিয়া প্রয়োজনীয় প্রসংগের অবতারণা করা। অর্থাৎ যেন স্ত্রী লোকটিকে বলা হইল। আমার সম্পর্কে চিন্তা করা এবং ওযর পেশ করা বাদ দাও। কেননা আমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর জন্য রাগ করি না। তুমি বরং নিজের সম্পর্কে চিন্তা কর যে, ছবর করিতে না পরায় কত বিরাট সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইলে। এখন সামনের জন্য বুঝিয়া লও যে, পূর্ণ ছবর কাহাকে বলে এবং কোন ধরনের ছবরে ছাওয়াব ও ফযীলত লাভ হয়।

৩৩। প্রিয়জনের মৃত্যুশোকে ছবরের প্রতিদান

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى: مَا لِعَبْدِيْ الْمُؤْمِنِ عِنْدِيْ جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلاَّ الْجَنَّةَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٥).

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ পাক বলেন, আমার ঐ মুমিন বান্দার জন্য আমার নিকট জান্নাত ছাড়া অন্য কোন্ প্রতিদান হইতে পারে? যাহার দুনিয়ার প্রিয়জনকে আমি (মৃত্যু দানের মাধ্যমে কবয করিলাম) আর সে আখিরাতের ছাওয়াবের আশায় ছবর করিল।

(বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

(আল্লাহ তা'আলা বলেন,) ইহা হাদীছে কুদসীর অন্তর্ভুক্ত। হাদীছে কুদসীর সংখ্যা এক শতেরও উপরে। কোন কোন আলিম হাদীছে কুদসীগুলি দ্বারা বড় আকারের স্বতন্ত্র সংকলনও তৈয়ার করিয়াছেন। কোরআন ও হাদীছে কুদসীর মাঝে পার্থক্য এই যে, কোরআনের শব্দ ও মর্ম উভয়ই আসমান হইতে নাযিল হইয়াছে এবং ইহার লফযগুলি স্বয়ং আল্লাহর কালাম। সুতরাং তাহা اعجاز পূর্ণ অর্থাৎ মানবীয় ক্ষমতার উর্ধ্বে। পক্ষান্তরে হাদীছে কুদসীর মর্ম ইলহাম, স্বপ্ন কিংবা অহীর অন্যান্য মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাক দান করিয়াছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ভাষায় উহা প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং তাহা কোরআনের মত متواتر নহে এবং اعجاز পূর্ণ নহে তবে ই'যাযের প্রায় সমপর্যায়ের। সুতরাং কোরআনের সহিত সম্পৃক্ত আহকাম হাদীছে কুদসীর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে না। যেমন হাদাছ অবস্থায় স্পর্শ না করা, জানাবাত অবস্থায় তিলাওয়াত না করা, প্রতি হরফে দশ নেকী হওয়া ইত্যাদি।

(দুনিয়ার প্রিয়জনকে) ইহা দ্বারা বোঝা যায় যে, মৃতব্যক্তি নিকটাত্মীয় বা পিতামাতা, ভাই বোন ও স্ত্রী-পুত্র-কন্যা হওয়া জরুরী নহে। বরং এমন ব্যক্তির মৃত্যুতে ছবর করিলেও উক্ত ফযীলত লাভ হইবে যাহার সহিত রক্তের বা আত্মীয়তার বন্ধন তো নাই কিন্তু দ্বীনী মুহব্বত রহিয়াছে।

হাদীছ শরীফে احتسب শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। 'ইহতিসাব'এর মতলব হইল কোন আমল সম্পর্কে এই নিয়ত করা যে, হে আল্লাহ। এই আমলটি আমি তোমার নিকট আমানত ও সঞ্চয় রূপে রাখিলাম। হাশরের মাঠে আমি তোমার নিকট হইতে ইহার প্রতিদান গ্রহণ করিব।

৩৪। প্লেগরোগে ছবরের প্রতিদান

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِ الطَّاعُوْنِ، فَأَخْبَرَهَا

أَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ اللهُ تَعَالَى رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ، فَلَيْسَ مِنْ

عَبْدٍ يَقَعُ فِيْ الطَّاعُوْنِ فَيَمْكُثُ فِيْ بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ اَنَّهُ لاَ يُصِيْبُهُ اِلاَّ مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ اِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِ الشَّهِيْدِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(١).

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্লেগরোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, ইহা ছিল এক প্রকার আযাব যাহা আল্লাহ পাক তাঁহার বান্দাদের মধ্যে যাহার উপর ইচ্ছা নাযিল করিতেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের জন্য ইহাকে রহমত বানাইয়াছেন। সুতরাং কোন বান্দা যখন প্লেগরোগে আক্রান্ত হয় আর সে ছাওয়াব লাভের আশায় ধৈর্যের সহিত নিজ শহরেই অবস্থান করে এবং বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তাহার জন্য যাহা লিখিয়াছেন সেই মুছিবত ছাড়া অন্য কিছু তাহাকে আক্রান্ত করিতে পারে না, তবে সে অবশ্যই শহীদের অনুরূপ প্রতিদান পাইবে। (বুখারী শরীফ)

ফায়দা ঃ

অর্থাৎ কাফিরদের উপর কিংবা কাবীরা গোনাহে লিপ্ত সেই যুগের পাপাচারীদের উপর ইহা আযাব রূপে নাযিল হইত। কেননা কাফির তো প্লেগাক্রান্ত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করিয়া চিরজাহান্নামী হইত। আর ফাসিক মৃত্যু বরণ করিয়া কবর-আযাবে লিপ্ত হইত। (যদিও ঈমানের কারণে এক সময় তাহার নাজাত হইবে। কিন্তু প্লেগরোগের কষ্ট ভোগ করিবার কারণে তাহার কোন ফযীলত লাভ হইবে না।) পক্ষান্তরে মুমিন ইহা দ্বারা শহীদের ফযীলত লাভ করিবে।

হাদীছ দ্বারা বোঝা যায় যে, প্লেগরোগ আযাব হওয়া পূর্ববর্তী উম্মতের সহিত সম্পৃক্ত। কিন্তু এই উম্মতের জন্য ইহা রহমতরূপে আসিয়া থাকে।

সিরিয়াতে ছাহাবা কেরামের বাহিনীতে যখন প্লেগ মহামারী ছড়াইয়া পড়িল এবং প্রতিদিন অসংখ্য মৃত্যু ঘটিতে লাগিল তখনও ছাহাবা কেরাম ইতমিনানের সহিত ঐ স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। স্থান ত্যাগের কথা চিন্তা করেন নাই। এমন কি বাহিনীর পরিচালক প্রসিদ্ধ ছাহাবী মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) নিজেও যখন প্লেগাক্রান্ত হইলেন তখন তিনি প্লেগে মৃত্যুর ফযীলতের কথা স্মরণ করিয়া উৎফুল্ল চিত্তে বলিয়া উঠিলেন—

مرحبا بالموت مرحبا *

স্বাগতম! হে মৃত্যু স্বাগতম!

প্লেগরোগ এবং অন্যান্য মহামারীর ক্ষেত্রে শরীয়তের নির্দেশ এই যে, দুর্গত এলাকায় বিনা কারণে প্রবেশ করা উচিত নহে। তদ্রূপ ব্যাধির ভয়ে ঐ এলাকা ত্যাগ করাও উচিত নহে। ইহাই জমহূরের [১] মাযহাব। এমন কি হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিতেন, দুর্গত এলাকা হইতে মৃত্যুর ভয়ে পলায়ন করিলে জিহাদের মাঠ হইতে পলায়নের গোনাহ হইবে।

সেবা তৎপরতার উদ্দেশ্যে ঐ এলাকায় গমন করা, তদ্রূপ বিশেষ কোন প্রয়োজনবশতঃ ঐ এলাকা হইতে বাহির হওয়া দোষের নহে।

১। জমহূর অর্থ সংখ্যাগরিষ্ঠ ওলামায়ে কেরাম।

হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) বলেন,

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم به بارض فلا تقروا عليه و اذا وقع بارض و انتم بها فلا تخرجوا فرارا *

আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, যখন কোন এলাকায় ইহার খবর পাও তখন সেখানে গমন করিও না। আর যখন তোমার অবস্থান ক্ষেত্রে তাহা দেখা দেয় তখন তাহা হইতে পলায়নের উদ্দেশ্যে সেখান হইতে বাহির হইও না।

প্রবেশ না করিবার কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাকদীরের উপর বিশ্বাস রাখিয়া সকল ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের এবং বিপদের আসবাব সমূহ হইতে দূরে থাকিবার আদেশ করিয়াছেন। আর বাহির হইতে নিষেধ করিবার কারণ এই যে, তাহাতে আল্লাহর ফায়সালা ও তাকদীরের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ পায়।

(শহীদের অনুরূপ প্রতিদান পাইবে) অন্য হাদীছে আছে الطاعون شهادة لكل مسلم প্লেগরোগ প্রত্যেক মুসলমানের জন্য শাহাদাত।

তবে ঐ ব্যক্তির জন্য শাহাদাত হইবে যে আকীদা ঠিক রাখিবে এবং ছবর করিবে। যদিও সে প্লেগের সময় কিংবা প্লেগ শেষ হইবার পর অন্য কারণে মারা গেল।

৩৫। দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া ছবর করিবার মর্তবা

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: «إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِيْ بِحَبِيْبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ» يُرِيْدُ عَيْنَيْهِ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(٢).

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাক বলেন, যখন আমি আমার কোন বান্দাকে তাহার 'প্রিয় বস্তুদ্বয়' দ্বারা পরীক্ষা করি, (অর্থাৎ তাহার দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত করি) আর সে ছবর করে তখন ঐ দুইটির বিনিময়ে তাহাকে আমি জান্নাত দান করি।

প্রিয় বস্তুদ্বয় দ্বারা তাহার চক্ষুদ্বয় বুঝানো হইয়াছে।

ফায়দা ঃ

এই মহামর্তবা শুধু চক্ষুদ্বয়ের সহিত খাছ হইবার কারণ এই যে, মানুষের নিকট তাহার চক্ষুদ্বয়ই হইল প্রিয়তম। ইহা সত্য যে, প্রতিটি অংগপ্রত্যংগই নিজস্ব স্থানে আল্লাহ পাকের অতি বড় নেয়ামত এবং একটির প্রয়োজন অপরটি দ্বারা মিটানো সম্ভব নহে। তাহা সত্ত্বেও মানুষ তাহার চক্ষুদ্বয়কে প্রিয়তম মনে করে। কেননা দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে সকল অংগ ব্যবহার করি সেইগুলি দ্বারা যথাযথ ফায়দা হাছিল করা দৃষ্টিশক্তির উপর নির্ভরশীল। তাহাছাড়া দৃষ্টিশক্তি লোপ পাইলে মানুষ একান্তভাবে পরনির্ভরশীল হইয়া পড়ে এবং প্রতিমুহূর্ত তাহাকে সীমাহীন গ্লানি ভোগ করিতে হয়।

আলিমগণ লিখিয়াছেন, যাহারা নিজেদের দৃষ্টিশক্তি দ্বারা অন্ধকে সাহায্য করিবে তাহারা

যেন চোখের হক আদায় করিল। আলিমগণ আরও বলিয়াছেন, দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইবার উপর ছবর করিবার বিনিময় যদি জান্নাত হয়, তবে যাহারা দৃষ্টিশক্তি বিদ্যমান থাকা অবস্থায় নযরের হিফাযত করিবে এবং আল্লাহ্ পাকের নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ দেখা হইতে বিরত থাকিবে তাহাদের আজর, ছাওয়াব ও প্রতিদান কি হইতে পারে? কেননা অন্ধ ব্যক্তির তো নযরের মুজাহাদা শেষ হইয়া গেল আর তাহাকে তো নযরের হিফাযতের জন্য প্রতিনিয়ত নফস ও শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ করিতে হইতেছে।

৩৬। রোগে ধৈর্যধারণের পুরস্কার

وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِيْ رَبَاحٍ قَالَ: قَالَ لِيْ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: اَلَا اُرِيْكَ امْرَاَةً مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ؟ فَقُلْتُ: بَلٰى، قَالَ: هٰذِهِ الْمَرْاَةُ السَّوْدَاءُ اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: اِنِّيْ اُصْرَعُ، وَاِنِّيْ اَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللهَ تَعَالٰى لِيْ قَالَ: «اِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، وَاِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ تَعَالٰى اَنْ يُعَافِيَكِ»، فَقَالَتْ: اَصْبِرُ، فَقَالَتْ: اِنِّيْ اَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللهَ اَنْ لَا اَتَكَشَّفَ، فَدَعَا لَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(৩).

হযরত 'আতা বিন আবী রাবাহ্ (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) আমাকে বলিলেন, তোমাকে কি আমি এক জান্নাতী স্ত্রীলোক দেখাইব? আমি বলিলাম, অবশ্যই। তিনি বলিলেন, এই যে, কালো স্ত্রীলোকটি। সে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির হইয়া আরয করিল, আমি মৃগীরোগে আক্রান্ত হই এবং (তখন রোগের প্রবণতার কারণে) বিবস্ত্রা হইয়া পড়ি। সুতরাং আপনি আমার জন্য দু'আ করুন। তিনি বলিলেন, তুমি যদি ছবর কর তবে তোমার জন্য জান্নাত হইবে। আর যদি চাহ তবে তোমার আরোগ্যের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করিব। সে বলিল, আমি ছবর করিব। তবে আমি বিবস্ত্রা হইয়া যাই। সুতরাং আমার জন্য দু'আ করুন যেন আমি বিবস্ত্রা না হই। তখন তিনি তাহার জন্য দু'আ করিলেন। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

কোন কোন বর্ণনায় স্ত্রীলোকটির নাম আসিয়াছে হযরত সো'আয়রাহ (রাঃ)। হাদীছের আগাগোড়া বর্ণনা হইতে বোঝা যায় যে, রোগের অবস্থায় বিবস্ত্রা হইবার বিষয়টিই ছিল তাঁহার আসল পেরেশানীর কারণ। কেননা ছতর ঢাকিয়া রাখা আল্লাহর হক। আর রোগের কারণে আল্লাহর হক নষ্ট হইতেছিল। তাহাছাড়া স্বভাবগত হায়া শরমও তাঁহাকে পেরেশান করিতেছিল।

(আমি ছবর করিব) সুবহানাল্লাহ! জান্নাতের মুকাবেলায় দুনিয়ার দুঃখ কষ্ট তাঁহাদের নিকট কত তুচ্ছ ছিল!

(যেন বিবস্ত্রা না হই) অন্যান্য বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে, তাঁহার আংশিক ছতর খুলিয়া যাইত। পূর্ণ ছতর খুলিত না এবং তাহাও পরপুরুষের সামনে হইত না। কিন্তু আল্লাহর বান্দীর ইহাও অসহনীয় ছিল। যে সকল স্ত্রীলোক রোগের অচেতন অবস্থায় নহে বরং স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে এবং স্বানন্দে পরপুরুষের সামনে বে-ছতর ও বে-পরদা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এইভাবে

নিজেরা গোনাহগার হইতেছে এবং অন্যদিগকে গোনাহগার করিতেছে তাহাদের এখান হইতে হায়া শরমের ছবক গ্রহণ করা দরকার।

৩৭। কষ্টদানকারীর জন্য দু'আ

وَعَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَحْكِيْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ، ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهٖ، يَقُوْلُ: «اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِيْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক নবীর কাহিনী বর্ণনা করা অবস্থায় এখনও দেখিতে পাইতেছি। (তাঁহাদের উপর আল্লাহর পক্ষ হইতে দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হউক।) তাঁহার জাতি তাঁহাকে প্রহার করিয়া রক্তাক্ত করিয়া ফেলিত আর তিনি আপন চেহারা হইতে রক্ত মুছিতেন এবং বলিতেন, হে আল্লাহ! আমার কাওমকে ক্ষমা করুন। তাহারা জানে না।

(বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

(যেন আমি দেখিতে পাইতেছি) ইহা দ্বারা এই কথা বুঝানো উদ্দেশ্য যে, বর্ণিত হাদীছটি সুস্পষ্ট রূপে তাঁহার স্মরণে আছে। বর্ণনার বিশুদ্ধতার বিষয়টি তাকীদ করিবার জন্য বিভিন্ন হাদীছের ক্ষেত্রে ছাহাবা কেরাম এই রূপ বলিতেন–

(এক নবীর কাহিনী) হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, এই মজলুম নবী হইলেন হযরত নূহ (আঃ)। কিন্তু হাফিয ইবনে হাজার (রহঃ) যুক্তি পেশ করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহা বনী ইসরাঈলের কোন নবীর ঘটনা। প্রশ্ন হইতে পারে যে, হযরত নূহ (আঃ) তো তাহার কাওমের জন্য বদ দু'আ করিয়াছিলেন। যেমন কোরআন শরীফে আসিয়াছে–

رب لا تذر على الارض من الكفرين ديارا *

ইহার উত্তর এই যে, সম্ভবতঃ কাওমের জন্য তাঁহার নেক দু'আ ছিল ঐ সময় যখন তিনি তাহাদের ঈমান গ্রহণ সম্পর্কে আশাবাদী ছিলেন। কিন্তু দীর্ঘ সাড়ে নয়শত বৎসর দাওয়াত দিবার পর যখন তিনি তাহাদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন তখন কোরআন শরীফে বর্ণিত দু'আ করিয়াছিলেন।

(তাহারা জানে না) এই হাদীছে ছবরের সর্বোত্তম আদর্শ রহিয়াছে। কেননা প্রথমতঃ তিনি রক্ত মুছিয়া ফেলিতেন, যাহাতে নবীর রক্ত মাটিতে পড়িয়া তাহাদের আযাব ও ধ্বংসের কারণ না হয়। দ্বিতীয়তঃ তাহাদের মুর্খতার মুকাবেলায় তিনি মহানুভবতা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তাহাদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ তাহাদের নিষ্ঠুর আচরণকে তাহাদের অজ্ঞতাপ্রসূত বলিয়া ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন এবং ওযর পেশ করিয়াছেন। আল্লাহর পথে দাওয়াত দানকারী প্রত্যেক দা'ঈকে এমনই মহৎ চরিত্রের অধিকারী হইতে হইবে।

যেহেতু নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন শ্রেষ্ঠ রাসূল এবং নবী রাসূলগণের সরদার। তাই আপন কাওমের হাতে কষ্ট ভোগ করিবার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন সকলের উপরে।

তিনি বলিয়াছেন—

اوذيت فى الله ما لم يوذ احد *

আল্লাহার পথে আমাকে এমন কষ্ট দেওয়া হইয়াছে যাহা আর কাহাকেও দেওয়া হয় নাই।

কিন্তু কাফিরদের জন্য কখনো তিনি বদ দু'আ করেন নাই।

তায়েফের সফরে কাফিররা দুষ্ট বালকদিগকে তাঁহার পিছনে লেলাইয়া দিয়াছিল। তাহারা তাঁহাকে পাথর মারিয়া লহুলাহান করিয়া ফেলিয়াছিল। এমন কি রক্ত জমাট বাঁধিয়া তাঁহার মোজা কদম মুবারকের সহিত লাগিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তিনি নিরবে তাহাদের এই পৈশাচিক নির্যাতন সহ্য করিয়াছেন। বদ দু'আর একটি শব্দও মুখে উচ্চারণ করেন নাই। এমন কি পাহাড়ের হিফাযতকারী ফিরিশতা যখন সালাম করিয়া বলিলেন, আল্লাহ পাক আমাকে পাঠাইয়াছেন। আপনি হুকুম করিলে দুই পার্শ্বের পাহাড় একত্র করিয়া তায়েফবাসীকে পিষিয়া ফেলিব। কিন্তু রহমতের নবী বলিলেন, না। বরং আমি আশা করি যে, তাহারা যদি ইসলাম গ্রহণ নাও করে তবে অন্ততঃ তাহাদের সন্তানরা একদিন ইসলাম গ্রহণ করিবে।

অহুদের যুদ্ধে কাফিররা তাঁহার চেহারা মুবারক রক্তাক্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। তিনি সেই মুহূর্তেও তাহাদের জন্য বদদু'আ না করিয়া চেহারা মুবারক হইতে রক্ত মুছিতেছিলেন। আর বলিতেছিলেন—

اللهم اغفر لقومى فانهم لا يعلمون *

হে আল্লাহ! আমার কাওমকে মাফ করিয়া দাও। কেননা তাহারা জানে না।

বস্তুতঃ ছাহাবা কেরাম হইতে শুরু করিয়া যুগে যুগে উম্মতে মুহাম্মাদীয়া ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দা'ঈ ইলাল্লাহগণের ইহাই ছিল জীবনার্দশ।

৩৮। বিপদাপদ হইল গোনাহের কাফফারা ও প্রায়াশ্চিত্ত

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حَزَنٍ وَلَا اَذًى وَلَا غَمٍّ ، حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا اِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَ «الْوَصَبُ»: الْمَرَضُ.

হযরত আবু সাঈদ (খুদরী রাঃ) ও হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, তাঁহারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলিয়াছেন, কোন মুসলমান অসুখ-বিসুখ, দুঃখ-কষ্ট, চিন্তা-পেরেশানী ইত্যাদি যে কোন মুছীবতে আক্রান্ত হউক; এমন কি একটি কাঁটাও যদি তাঁহাকে বিঁধে তবে উহার বিনিময়ে আল্লাহ পাক তাহার পাপ মোচন করিয়া দিবেন। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

(পাপ মোচন করিবেন) এখানে من অব্যয়টি রহিয়াছে, যাহা আংশিকতা বোঝায়। সুতরাং অর্থ এই রূপ হইবে, 'তাহার কিছু পাপ মোচন করা হইবে।' কেননা বান্দার হক পরিশোধ করা ছাড়া মাফ হয় না। তদ্রূপ কবীরা গোনাহ তাওবা ছাড়া মাফ হইবে না। অবশ্য মুছীবতগ্রস্ত

অবস্থায় তাওবা করিলে সহজেই তাওবা কবুল হইবার আশা করা যায়। তাওবা না করিলে মুছীবত দ্বারা শুধু ছাগীরা গোনাহই মাফ হইবে।

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, মুছীবত মুমিনকে গোনাহ হইতে পাক ছাফ করিয়া দেয়। সুতরাং মুমিনের সতর্ক থাকা কর্তব্য যাহাতে সে দুইটি কষ্ট একত্র করিয়া না ফেলে। একটি হইল মুছীবতের কষ্ট, দ্বিতীয়টি হইল ছবর না করিবার কারণে ছাওয়াব হইতে মাহরূম হইবার কষ্ট। যেমন একটি মরফু হাদীছ আসিয়াছে–

المصاب من حرم الثواب *

আসল মুছীবতগ্রস্ত হইল ঐ ব্যক্তি যে ছাওয়াব হইতে বঞ্চিত হইল।

তবে ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, বিপদ মুছীবত মুমিনের পাপ মোচনকারী হিসাবে আল্লাহর নিয়ামত বটে। কিন্তু আল্লাহর নিকট কখনো বিপদ মুছীবতের পরীক্ষা চাওয়া উচিত নহে। কেননা আমরা দুর্বল বান্দা। পরীক্ষায় কামিয়াব হইবার সাধ্য আমাদের নাই। তবে পরীক্ষা আসিয়া গেলে ছবর করিতে হইবে এবং আল্লাহর নিকট ছবরের তাওফীক চাহিতে হইবে। যেমন হাদীছ শরীফে আসিয়াছে–

يا ايها الناس لا تتمنوا لقاء العدو و اسألوا الله العافية فاذا لقيتموه فاصبروا *

হে লোক সকল! তোমরা শত্রুর সাক্ষাৎ কামনা করিও না। বরং আল্লাহর নিকট নিরাপদতা প্রার্থনা কর। কিন্তু যখন শত্রুর মুখামুখি হইয়া যাইবে তখন ছবর ও ধৈর্যের পরিচয় দিও।

৩৯। মুমিনের জন্য বিপদাপদ আল্লাহর অনুগ্রহের প্রমাণ

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُوْعَكُ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ تُوْعَكُ وَعْكًا شَدِيْدًا قَالَ: «اَجَلْ اِنِّي اُوْعَكُ كَمَا يُوْعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ»، قُلْتُ: ذٰلِكَ اَنَّ لَكَ اَجْرَيْنِ؟ قَالَ: «اَجَلْ ذٰلِكَ كَذٰلِكَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبُهُ اَذًى؛ شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا اِلَّا كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا سَيِّئَاتِهِ، وَحُطَّتْ عَنْهُ ذُنُوْبُهُ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَ «الْوَعْكُ»: مَغْثُ الْحُمّٰى، وَقِيْلَ: الْحُمّٰى.

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, একবার আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির হইলাম। তাঁহার জ্বর ছিল। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছেন। তিনি বলিলেন, হাঁ, আমি জ্বরে (ঐ পরিমাণ) আক্রান্ত হই যেমন তোমাদের মধ্য হইতে দুইজন হয়। আমি বলিলাম, ইহা এই জন্য যে, আপনি দ্বিগুণ প্রতিদান পাইবেন। তিনি বলিলেন, হাঁ, রোগ দ্বিগুণ হইবার কারণে প্রতিদানও দ্বিগুণ হইবে। যে কোন মুসলমান যে কোন কষ্ট ভোগ করে– একটি কাঁটা বিঁধা কিংবা উহার চাইতে বেশী– আল্লাহ পাক উহার বিনিময়ে তাহার পাপসমূহ মোচন করিয়া দেন এবং তাহার গোনাহ সমূহ দূর করিয়া দেন। যেমন গাছ তাহার পাতা ঝাড়িয়া ফেলে। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসুস্থতার সময় তাঁহার عيادة (বা খোঁজখবর লইবার) জন্য গিয়াছিলেন। জ্বরের কথা তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন, হয় তাঁহার পবিত্র শরীর স্পর্শ করিয়া কিংবা চেহারা মুবারকে আলামত দেখিয়া।

(আপনি দ্বিগুণ প্রতিদান পাইবেন) ইহা দ্বারা বোঝা গেল যে, রোগীকে বিভিন্ন সান্ত্বনামুলক কথা বলা উত্তম, যাহাতে তাহার চিত্ত প্রসন্ন হয় এবং মনে সাহস আসে এবং ছবর করা সহজ হয়।

(যে কোন মুসলমান) যেহেতু একজন উম্মতী নবীর অসুস্থতার সময় তাঁহার প্রতি মুহব্বত প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহাকে সান্ত্বনার কথা শুনাইয়াছেন সেহেতু প্রতিদান স্বরূপ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁহার মাধ্যমে কেয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা উম্মতকে এই বিরাট খোশখবর শুনাইয়া দিলেন।

(পাপ সমূহ মোচন করিয়া দেন) অর্থাৎ আল্লাহর হক সংক্রান্ত ছগীরা গোনাহ সমূহ। কেননা ছহী হাদীছ দ্বারা সুপ্রমাণিত যে, বান্দার হক পরিশোধ করা কিংবা বান্দার পক্ষ হইতে ছাড়িয়া দেওয়া ছাড়া মাফ হয় না। অবশ্য হাদীছে এই রূপও আছে যে, আল্লাহ যদি হাশরের মাঠে কোন বান্দাকে হক্কুল ইবাদ হইতে মুক্ত করিতে চাহেন তবে হকদার বান্দাকে ডাকিয়া বলিবেন, তুমি তোমার হক ছাড়িয়া দাও। আমি তোমাকে খুশী করিব তখন হকদার বান্দা খুশী হইয়া তাহার হক ছাড়িয়া দিবে। কিন্তু এই ভরসায় বসিয়া থাকা উচিত নহে। বরং বান্দার হক হইতে পাক ছাফ অবস্থায় দুনিয়া হইতে বিদায় লওয়া উচিত। কেননা জানা নাই যে, আমার সহিত কি রূপ আচরণ করা হইবে। বিশেষতঃ যাহারা ভরসা করিয়া বসিয়া থাকে তাহাদের প্রতি আল্লাহ অত্যন্ত নারায হন।

তদ্রূপ বিশুদ্ধ হাদীছ দ্বারা সুপ্রমাণিত যে, আল্লাহর হক্কের ক্ষেত্রে কবীরা গোনাহ তাওবা ছাড়া মাফ হয় না।

(যেমন গাছ তাহার পাতা ঝাড়িয়া ফেলে) গাছের পাতা ঝরিয়া পড়িবার এই উপমা নামায প্রসংগেও হাদীছ শরীফে আসিয়াছে–

হযরত আবু যর (রাঃ) বলেন, একবার শীতকালে নবী আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহিরে তাশরীফ আনিলেন। ঐ সময় গাছের পাতা ঝরিতেছিল। তিনি গাছের একটি ডাল ধরিলে পাতা আরও বেশী পরিমাণে ঝরিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, হে আবু যর! আমি বলিলাম, লাব্বাইক ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বলিলেন, মুসলমান বান্দা যখন ইখলাছের সহিত আল্লাহকে রাজী করিবার উদ্দেশ্যে নামায পড়ে তখন তাহার গোনাহ এমনভাবে ঝরিয়া যায় যেমন এই গাছের পাতা ঝরিয়া পড়ে। (মুসনাদে আহমদ)

এই তুলনা বাহ্যতঃ ইহাই প্রমাণ করে যে, ছগীরা কবীরা সকল প্রকার গোনাহ মাফ হইয়া যায়। কিন্তু বিভিন্ন ছহী হাদীছের কারণে ওলামায়ে কেরাম ইহাকে ছগীরা গোনাহের সহিত খাছ করিয়াছেন।

হাদীছের বিভিন্ন কিতাবে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে এই বর্ণনাটিও আসিয়াছে। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির হইলাম। তিনি জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। আমি কম্বলের উপর দিয়া হাত রাখিলাম। কম্বলের উপর হইতেও জ্বরের তাপ অনুভব করিলাম। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কি ভীষণ আপনার জ্বর! তিনি বলিলেন, আমরা নবী রাসূলগণ দ্বিগুণ কষ্ট ভোগ করি। ফলে আমাদিগকে দ্বিগুণ আজর দান করা হয়।

৪০। মুছীবতের মাঝে ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ নিহিত

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ»، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

وَضَبَطُوا «يُصَبْ»: بِفَتْحِ الصَّادِ وَكَسْرِهَا.

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তাঁহার যে বান্দার (ইহকালীন ও পরকালীন) কল্যাণ চাহেন তাহাকে (কোন না কোনভাবে) মুছীবতে লিপ্ত করেন। (বুখারী শরীফ)

ফায়দা ঃ

(কোন না কোনভাবে) অর্থাৎ তাহার শরীরের দিক হইতে, কিংবা সম্পদের দিক হইতে কিংবা প্রিয়জন বা প্রিয় বস্তু বা প্রিয় বিষয়ের দিক হইতে। হাদীছ শরীফে আসিয়াছে–

المؤمن لا يخلوا من علة او قلة او ذلة *

ইহাতে তাহার ইহকালীন কল্যাণ এই যে, সে মজবুর হইয়া আল্লাহ পাকের আশ্রয় গ্রহণ করে। ফলে আল্লাহর মদদ তাহার সহিত শামিল হয়। আর পরকালীণ কল্যাণ এই যে, ইহা দ্বারা তাহার গোনাহ মাফ হয়। কিংবা ছাওয়াব লেখা হয়। কিংবা উভয়টি এক সংগে হয়।

কথিত আছে যে, পূর্ববর্তী যামানার এক লোক ত্রিশ বৎসর যাবৎ আল্লাহকে ভুলেও ডাকে নাই। কিন্তু আল্লাহ তাহার কল্যাণ চাহিলেন। তাই ফিরিশতাকে হুকুম করিলেন যে, তাহার একটি রগ টানিয়া দাও। ফিরিশতা হুকুম পালন করিলেন। আর লোকটি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া আল্লাহকে ডাকিয়া উঠিল। আল্লাহ তৎক্ষণাৎ সাড়া দিয়া বলিলেন, বান্দা! আমি হাযির। কিন্তু এই ত্রিশ বৎসর যাবৎ তুমি কোথায় ছিলে!

৪১। মৃত্যু কামনা করা উচিত নহে

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ أَصَابَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ: اللّٰهُمَّ أَحْيِنِيْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِيْ وَتَوَفَّنِيْ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِيْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে কেহ যেন কোন কষ্টে লিপ্ত হইবার কারণে মৃত্যু কামনা না করে। তবে

একান্ত অপারগ হইয়া গেলে শুধু এইটুকু যেন বলে, হে আল্লাহ! যতক্ষণ আমার জন্য জীবন কল্যাণকর ততক্ষণ আমাকে জীবিত রাখুন এবং যখন আমার জন্য মৃত্যু কল্যাণকর হইবে তখন আমাকে মৃত্যু দান করুন। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

(তোমাদের কেহ যেন কষ্টে লিপ্ত হইবার কারণে মৃত্যু কামনা না করে।) কষ্ট জানের হইতে পারে, মালের হইতে পারে, পরিবার পরিজন ও সন্তানসন্ততির ক্ষেত্রে হইতে পারে, কিংবা এই ধরনের অন্য কোন ক্ষেত্রে হইতে পারে। এই সকল অবস্থায় মৃত্যু কামনা করা মাকরূহ। কেননা ইহাতে বিপদের মুখে বে-ছবরি ও অধৈর্য এবং আল্লাহর ফায়সালা ও তাকদীরের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ পায় তবে আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত লাভের আকাঙক্ষা, আল্লাহ পাকের দীদার লাভের শাওক, পবিত্রস্থানে দাফন হইবার আকাঙক্ষা কিংবা দ্বীনের বিষয়ে ফিতনায় পড়িবার আশংকার কারণে মৃত্যু কামনা করিলে উহা মাকরূহ নহে। ছাহাবা, তাবেঈন ও পরবর্তী যুগের বহু আল্লাহওয়ালা সম্পর্কে এই সকল কারণে মৃত্যু কামনা করিবার প্রমাণ পাওয়া যায়।

(যতক্ষণ আমার জন্য জীবন কল্যাণকর) অর্থাৎ যতক্ষণ দ্বীনী ফিতনা হইতে দূরে থাকা এবং শরীয়তের উপর জীবন যাপন করা এবং আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে সন্তুষ্ট করিবার তাওফীক আমার হয় ততক্ষণ আমাকে জীবন দান কর। অন্যথায় আমাকে মৃত্যু দান করিয়া তোমার সান্নিধ্যে লইয়া যাও। কেননা দুনিয়ার জিন্দেগীর মাকছূদই হইল আল্লাহর রিযা ও সন্তুষ্টি হাছিল করা। ইহা সম্ভব না হইলে যমীনের পিঠের চাইতে যমীনের পেটই উত্তম।

যেমন হাদীছ শরীফে আসিয়াছে–

فبطن الارض خير لكم من ظهرها *

তবে ভূগর্ভ তোমাদের জন্য ভূপৃষ্ঠ হইতে উত্তম।

বস্তুতঃ মানুষ যদি দুনিয়ার কষ্ট মুছীবতের হাকীকত বুঝিত এবং ইহার মাধ্যমে তাহার প্রতি আল্লাহর দান ও অনুগ্রহের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিত তবে কিছুতেই সে মৃত্যু কামনা করিত না। দুনিয়ার কষ্ট মুছীবতের ফযীলতের জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, আল্লাহকে ভুলিয়া যাওয়া গাফেল বান্দা আল্লাহর আশ্রয়ে ফিরিয়া আসে। তাহাকে স্মরণ করিয়া অশ্রু বর্ষণ করে। অথচ এতটকুই নহে। বরং ইহা তাহার পাপ মোচন ও মর্তবা বৃদ্ধিরও কারণ।

মৃত্যু কামনা করা উত্তম নাকি দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করা উত্তম। এই বিষযে ছুফিয়ানে কিরামের দ্বিমত রহিয়াছে। কেহ বলেন দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করাই উত্তম। কেননা নেক আমলের সুযোগ লাভ হইবে এবং গোনাহ হইতে তাওবা করিবার অবকাশ থাকিবে। এই কারণেই হাদীছ শরীফে আসিয়াছে–

طوبى لمن طال عمره و حسن عمله *

খোশ নছীব ঐ ব্যক্তি যাহার হায়াত দীর্ঘ হইয়াছে এবং আমল উত্তম হইয়াছে।

অন্য হাদীছে আছে, জনৈক ছাহাবী স্বপ্নে দেখিলেন যে, শহীদের এক বৎসর পরে স্বাভাবিক

অবস্থায় মৃত্যু বরণকারী ব্যক্তি শহীদের পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, হিসাব করিয়া দেখ যে, এক বৎসরে সে কত আমল করিয়াছে।

কেহ বলেন, মৃত্যু কামনা করাই উত্তম। কেননা প্রতি মুহূর্তে পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া এবং বিভিন্ন ফিতনায় পড়িয়া ঈমান হারা হইবার আশংকা রহিয়াছে। তাহাছাড়া হাদীছ শরীফে আছে–

من احب لقاء الله احب الله لقاءه *

যে ব্যক্তি আল্লাহর সহিত মিলন পছন্দ করিবে আল্লাহও তাহার সহিত মিলন পছন্দ করিবেন। তবে পছন্দনীয় পন্থা উহাই যাহা আলোচ্য হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ নিজস্ব ইচ্ছা অনিচ্ছাকে আল্লাহর ইচ্ছার সামনে বিসর্জন দেওয়া।

৪২। পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা ও অবিচলতা

وَعَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللهِ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: شَكَوْنَا إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِيْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَقُلْنَا: أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلَا تَدْعُوْ لَنَا؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيْهَا، ثُمَّ يُؤْتٰى بِالْمِنْشَارِ فَيُوْضَعُ عَلٰى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيْدِ مَا دُوْنَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ، مَا يَصُدُّهُ ذٰلِكَ عَنْ دِيْنِهِ، وَاللهِ لَيُتِمَّنَّ اللهُ هٰذَا الْأَمْرَ حَتّٰى يَسِيْرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلٰى حَضَرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللهَ وَالذِّئْبَ عَلٰى غَنَمِهِ، وَلٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُوْنَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

وَفِيْ رِوَايَةٍ: «وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً وَقَدْ لَقِيْنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ شِدَّةً».

হযরত আবু আব্দুল্লাহ খাব্বাব ইবনুল আরাত (রাঃ) বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনুযোগ করিলাম। তিনি একটি (ভাঁজ করা) চাদরে হেলান দিয়া কাবা শরীফের ছায়ায় বসা ছিলেন। আমরা বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদের জন্য (আল্লাহর নিকট) সাহায্য চাহিতেছেন না কেন? আপনি আমাদের জন্য দু'আ করিতেছেন না কেন? তিনি(তাহাদিগকে ছবরের প্রতি উদ্বুদ্ধ করিয়া)বলিলেন, তোমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা তো এই ছিল যে, কোন (মুমিন) ব্যক্তিকে পাকড়াও করা হইত। অতঃপর তাহার জন্য গর্ত খোঁড়া হইত এবং উহাতে তাহাকে নামানো হইত। অতঃপর করাত আনিয়া তাহার মাথায় রাখা হইত এবং তাহাকে দুই টুকরা করা হইত এবং লৌহচিরণী দ্বারা তাহার অস্থিমাংস আঁচড়ানো হইত। কিন্তু ইহা তাহাকে তাহার দ্বীন হইতে বিচ্যুত করিত না। আল্লাহর কসম! অবশ্যই আল্লাহ পাক এই দ্বীনকে বিজয়ী করিবেন। এমন কি (ইয়ামানের) সান্'আ শহর হইতে হাযরামাউত পর্যন্ত এক সাওয়ার নির্বিঘ্নে সফর করিবে এবং আল্লাহ ছাড়া কাহাকেও ভয় করিবে না। তবে তাহার মেষপাল সম্পর্কে নেকড়ের ভয় করিবে। কিন্তু তোমরা বড় তাড়াহুড়া করিতেছ।

(বুখারী শরীফ)

ফায়দা ঃ

(অনুযোগ করিলাম) অর্থাৎ কোরায়শদের অমানুষিক নির্যাতন নিপীড়ন সম্পর্কে অনুযোগ করিলাম। দ্বিতীয় বর্ণনায় উহার স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। হযরত খাব্বাব ইবনুল আরাত ছিলেন ঐ সকল ছাহাবা কেরামের একজন যাহারা ঈমান আনয়নের অপরাধে মক্কার মুশরিকদের হাতে অবর্ণনীয় নির্যাতন ভোগ করিয়াছিলেন। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) তাঁহার খেলাফতকালে একবার হযরত খাব্বাব (রাঃ)-কে মুশরিকদের হাতে নির্যাতন ভোগের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমার নির্যাতন ভোগের কথা কি আর বলিব! শুদু পিঠটা দেখুন। হযরত ওমর (রাঃ) তাহার পিঠ দেখিয়া বলিলেন, আজিকার মত এমন পিঠ কোন মানুষের আমি দেখি নাই। হযরত খাব্বাব (রাঃ) বলিলেন, জ্বলন্ত অংগারের উপর আমাকে শোয়ানো হইত। আর আমার পিঠের চর্বি গলিয়া উহার আগুন নিভিত। দিনের পর দিন এই ধরনের নির্যাতন ভোগ করিয়া একদিন তাঁহারা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সান্ত্বনা লাভের জন্য অনুযোগ করিয়াছিলেন। আল্লাহ পাক সকল উম্মতের পক্ষ হইতে ছাহাবা কেরামকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন।

(তিনি তাহাদিগকে ছবরের প্রতি উদ্বুদ্ধ করিয়া বলিলেন) ইহা হইতে বোঝা যায় যে, বিপদ-মুছীবত এবং আযমাইশ ও পরীক্ষার সময় পূর্ববর্তীদের হালাত (এবং ছাহাবা কেরামের জীবন-চরিত) পাঠ করা বা শ্রবণ করা খুবই ফলদায়ক। ইহাতে সহজেই সান্ত্বনা লাভ হয় এবং ছবরের তাওফিক হয়। সুতরাং এই ফিতনাপূর্ণ জামানায় প্রতিদিন নিয়মিত ছাহাবা কেরামের সীরাত এবং আল্লাহওয়ালাদের নির্ভরযোগ্য ঘটনাবলীর আলোচনা হওয়া জরুরী।

(এই দ্বীনকে বিজয়ী করিবেন) অর্থাৎ সর্বত্র ইসলামের প্রসার হইবে এবং এমন শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করিবে যে, আল্লাহর ভয় ছাড়া অন্য কোন ভয় মানুষের অন্তরে থাকিবে না। তাহার জান-মাল, ইজ্জত-আবরু ও দ্বীন-ঈমানের উপর কোন আশংকা থাকিবে না। স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার কথা অবশ্য আলাদা। বস্তুতঃ ইহা ছিল রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক জিন্দা মু'জিযা। এই ভবিষ্যদ্বাণী তিনি মক্কার যমিনে বসিয়া এমন সময় উচ্চারণ করিয়াছিলেন যখন ইসলাম ও ইসলামের মুষ্টিমেয় দুর্বল অনুসারীদের অস্তিত্বই ছিল (বাহ্যতঃ) প্রশ্নের সম্মুখীন। বলাবাহুল্য, অল্প দিনের মাঝেই তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হইয়াছিল। এমন কি পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণও লিখিয়াছেন যে, সত্য সত্যই এক আরব তরুণী সাজসজ্জা ও অলংকারসহ সান্'আ হইতে হাযরামাউত পর্যন্ত এক সফর করিয়াছিল। তাহাকে যখন পথে কোন অসুবিধা হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করা হইল তখন সে বলিল, পথে যত পুরুষের সংগে দেখা হইয়াছে সকলকেই মনে হইয়াছে যেন আমার বাপ কিংবা ভাই।

(কিন্তু তোমরা বড় তাড়াহুড়া করিতেছ) আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান। প্রতিটি বিষয়ের জন্য তিনি নির্ধারিত সময় রাখিয়াছেন। নির্ধারিত স্তর ও পর্যায়ক্রম রাখিয়াছেন। নির্ধারিত হালাত ও অবস্থা রাখিয়াছেন। কেন রাখিয়াছেন উহার হিকমত শুধু আল্লাহ পাকের ইলমের মধ্যেই রহিয়াছে। সুতরাং চূড়ান্ত ছবর ও ধৈর্যের সহিত ঐ সকল স্তর ও পর্যায় অবশ্যই অতিক্রম করিতে হইবে এবং ঐ সকল হালাত ও অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইবে। কিন্তু মানুষের স্বভাব হইল তাড়াহুড়া করা। কোরআন শরীফে ইরশাদ হইয়াছে–

* خُلِقَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا

মানুষকে তাড়াহুড়াকারী রূপে সৃষ্টি করা হইয়াছে।

উসদুল গাবাহ কিতাবে আল্লামা ইবনুল আছীর বর্ণিত একটি হাদীছের সহিত আলোচ্য হাদীছের আপাত বৈপরীত্য মনে হয়। হযরত আবু ছালেহ বলেন, খাব্বাব (রাঃ) ছিলেন তলোয়ার নির্মাণে দক্ষ কর্মকার গোলাম। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে মুহব্বত করিতেন এবং তাঁহার নিকট আসা যাওয়া করিতেন। তাঁহার মালিকান ইহা জানিতে পারিল। ফলে সে গরম লোহা দ্বারা তাঁহার মাথায় দাগাইত। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে এই সম্পর্কে অনুযোগ করিলেন। আর তিনি তাঁহার জন্য এই বলিয়া দু'আ করিলেন, اللهم انصر خبابا হে আল্লাহ! খাব্বাবকে সাহায্য করুন। ফলে তাঁহার মালিকান উম্মে আনমার-এর প্রচণ্ড মাথাব্যথা শুরু হইল। এমন কি অসহ্য হইয়া সে কুকুরের ন্যায় চিৎকার করিত। তাহাকে চিকিৎসা হিসাবে আগুনের সেঁকা গ্রহণ করিবার কথা বলা হইল। তখন হযরত খাব্বাব গরম লোহা দ্বারা তাহার মাথায় সেঁকা দিতে লাগিলেন।

এই হাদীছে দু'আ করিবার কথা বলা হইয়াছে আর কিতাবে বর্ণিত হাদীছে সান্ত্বনাবাণীর কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয় হাদীছের মাঝে কোন বৈপরীত্য নাই। কেননা উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা, অর্থাৎ একবার তিনি দু'আ করিয়াছিলেন আর একবার তাঁহাকে সান্ত্বনাদানপূর্বক ছবর করিবার কথা বলিয়াছিলেন।

৪৩। হযরত মুসা (আঃ)-এর ছবর

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ آثَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَاسًا فِيْ الْقِسْمَةِ: فَأَعْطَى الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ مِثْلَ ذٰلِكَ، وَأَعْطَى نَاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ وَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِيْ الْقِسْمَةِ. فَقَالَ رَجُلٌ: وَاللّٰهِ إِنَّ هٰذِهِ قِسْمَةٌ مَا عُدِلَ فِيْهَا، وَمَا أُرِيْدَ فِيْهَا وَجْهُ اللّٰهِ، فَقُلْتُ: وَاللّٰهِ لَأُخْبِرَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ، فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ حَتّٰى كَانَ كَالصِّرْفِ. ثُمَّ قَالَ: «فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ؟ ثُمَّ قَالَ: يَرْحَمُ اللّٰهُ مُوْسٰى قَدْ أُوْذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ». فَقُلْتُ: لَا جَرَمَ لَا أَرْفَعُ إِلَيْهِ بَعْدَهَا حَدِيْثًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَقَوْلُهُ «كَالصِّرْفِ» هُوَ بِكَسْرِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ: وَهُوَ صِبْغٌ أَحْمَرُ.

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, হুনায়ন যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (গনীমতের মাল) তাকসীম করিবার ক্ষেত্রে কিছু লোককে অগ্রাধিকার দান করিলেন। আকরা ইবনে হাবিসকে একশত উট দান করিলেন, ওয়ায়নাহ বিন হোছায়নকেও অনুরূপ দান করিলেন। আরবের কিছু অভিজাত লোককেও দান করিলেন। তাকসীমের ক্ষেত্রে তিনি তাহাদিগকে প্রাধান্য দান করিলেন। একজন বলিতে লাগিল, আল্লাহর কসম! এই তাকসীমে ইনছাফ করা হয় নাই এবং আল্লাহকে খুশী করা ইহার উদ্দেশ্য নহে। আমি বলিলাম, আল্লাহর কসম! আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে বলিয়া দিব। অতঃপর আমি তাঁহার খিদমতে আসিয়া লোকটির কথা বলিলাম। তখন তাঁহার পবিত্র চেহারা পরিবর্তন হইয়া লাল বর্ণ ধারণ করিল। অতঃপর তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল যদি ইনসাফ না করিয়া থাকেন তবে কে ইনসাফ করিবে? অতঃপর তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ (হযরত) মূসা (আঃ)-কে রহম করুন, তাঁহাকে ইহার চাইতে বেশী কষ্ট দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তিনি ছবর করিয়াছেন। তখন আমি (মনে মনে) বলিলাম, এই ঘটনার পর তাঁহার নিকট কিছুতেই (কষ্টদায়ক) কোন কথা পৌঁছাইব না। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

(হোনায়ন যুদ্ধের দিন) হোনায়ন হইল তায়েফের পথে মক্কা হইতে দশ মাইলের অধিক দূরবর্তী একস্থান। অষ্টম হিজরীর রমযান মাসে মক্কাবিজয় সম্পন্ন হইবার পর আরবের বিখ্যাত সম্পদশালী ও যুদ্ধপ্রিয় গোত্র হাওয়াযিন এই ভাবিয়া শংকিত হইয়া উঠিল যে, মক্কার কোরায়শের পতনের পর মুহম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পরবর্তী লক্ষ্য হইবে তায়েফ। তাই তাঁহাকে প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ না দিয়া এখনই আমাদের আগে বাড়িয়া হামলা করা উচিত। ফলে মালিক বিন আওফের নেতৃত্বে (পরে তিনি মুসলমান হইয়াছিলেন) চার হাজার সুদক্ষ যোদ্ধা যুদ্ধসাজে বাহির হইল।

সংবাদ পাইবার পর রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চৌদ্দ হাজার সৈন্যের বাহিনী লইয়া বাহির হইলেন এবং হোনায়ন নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করিলেন। বাহিনীতে মক্কার কিছু নও মুসলিম ও কিছু মুশরিকও ছিল।

এই প্রথম কোন যুদ্ধে লোকবল ও অস্ত্রবলে মুসলিম বাহিনী ছিল উপরে। তাই কেহ কেহ বলিয়া বসিলেন, আজ আমাদের জয় অনিবার্য। কিন্তু আল্লাহর রহমতের পরিবর্তে সংখ্যাধিক্যের উপর মুসলমানদের ভরসা থাকিবে, ইহা আল্লাহ্ পাক পছন্দ করিলেন না। তাই মুসলমানদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে মাত্র চারিহাজার যোদ্ধার হাতে তাহাদিগকে প্রাথমিক পরাজয়ের স্বাদ গ্রহণ করাইলেন। অতঃপর আসমান হইতে ফিরিশতা পাঠাইয়া তিনি মুসলমানদের মদদ করিলেন। ফলে তাঁহারা জয়ী হইয়াছিলেন এবং প্রচুর ধন-সম্পদ ও যুদ্ধবন্দী তাহাদের হস্তগত হইয়াছিল। হোনায়ন যুদ্ধের এই শিক্ষাকেই আল্লাহ্ পাক কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের জন্য নিম্নোক্ত আয়াতে তুলিয়া ধরিয়াছেন—

وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَّ ضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ * ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ اَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَ عَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ ذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ *

হোনায়ন যুদ্ধের দিনও (আমি তোমাদিগকে সাহায্য করিয়াছি) যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু তাহা তোমাদের কোন উপকারে আসে নাই এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও উহা তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। অতঃপর তোমরা পিছনে ফিরিয়া পলায়ন করিয়াছিলে। অতঃপর আল্লাহ্ তাঁহার রাসূলের উপর এবং মুমিনদের উপর

তাঁহার সাকীনাহ্ (ও প্রশান্তি) নাযিল করিলেন। আর এমন সৈন্যদল অবতীর্ণ করিলেন যাহাদিগকে তোমরা দেখিতে পাও নাই। আর আল্লাহ্ কাফিরদিগকে শাস্তি দান করিয়াছিলেন, আর ইহাই হইল কাফিরদের কর্মফল।

(তাকসীমের ক্ষেত্রে তিনি তাহাদিগকে প্রাধান্য দান করিলেন) হোনায়ন যুদ্ধে মদীনা হইতে আগত আনছার-মুহাজিরগণ সংখ্যায় ছিলেন বার হাজার। পক্ষান্তরে অবশিষ্ট দুই হাজার ছিলেন মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণকারী নও মুসলমান কিংবা এমন মুশরিক যাহাদের অন্তর ইসলামের প্রতি কিছুটা দুর্বল ছিল।

যুদ্ধের পর গনীমতের মাল তাকসীম করিবার ক্ষেত্রে তিনি এই নীতি গ্রহণ করিলেন যে, প্রাচীন মুসলমানগণ যাহাদের অন্তরে ঈমান দৃঢ়মূল ছিল এবং আল্লাহর মারিফাতের সূর্য তাহাদের অন্তরে তাওহীদের আলো ছড়াইতেছিল তাহাদের ঈমানী শক্তির উপর আশ্বস্ত হইয়া তাহাদিগকে তিনি পিছনে রাখিলেন। পক্ষান্তরে নও মুসলিম ও মুশরিকদের মনোরঞ্জনের জন্য তাহাদিগকে বেশী বেশী করিয়া দান করিলেন। গনীমত বন্টনের এই নীতি বিধৃত হইয়াছে নিম্নোক্ত হাদীছে। তিনি বলেন–

انی لاعطی رجلا و غیره احب الی منه مخافة ان یکبه الله فی النار علی وجهه *

কখনো একজন লোককে আমি (মাল) দান করি অথচ অন্য লোক আমার নিকট তাহার চাইতে প্রিয়। শুধু এই আশংকায় যে, (যদি মাল দ্বারা তাহার মনোরঞ্জন না করি তবে কাফিরই থাকিয়া যাইবে। ফলে) আল্লাহ্ তাহাকে উপুড় করিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবেন।

(একজন লোক বলিল) তাহার নাম মু'তাব বিন কোশায়ব। সে আনছার সম্প্রদায়ের ছিল। হযরত যোবায়র (রাঃ) বলেন, অহুদ যুদ্ধের সময় এই লোকই মন্তব্য করিয়াছিল, যাহা আল্লাহ্ পাক কোরআন শরীফে তুলিয়া ধরিয়াছেন–

لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا *

আমাদের যদি মতামতের অধিকার থাকিত তবে আমরা এইখানে (এইভাবে) নিহত হইতাম না।

অর্থাৎ মদীনায় অবস্থান করিয়া যুদ্ধ করিবার যে পরামর্শ আমরা দিয়াছিলাম উহা যদি মানা হইত তবে অহুদের প্রান্তরে এইভাবে প্রাণ দিতে হইত না।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামান্য সমালোচনা করাও কুফরী এবং তাহার খুন হালাল। ইহা সত্ত্বেও রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে কতল করিলেন না বরং তাহার সহিত অন্যান্য মুনাফিকদের অনুরূপ আচরণ করিলেন, যেন লোকেরা বলিতে না পারে যে, তিনি আপন সাথীদের উপরও তলোয়ার চালাইয়া থাকেন। ফলে মানুষ ইসলামের প্রতি অনাগ্রহী হইয়া পড়িবে।

(আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলিয়া দিব।) যাহাতে তিনি তাহার ব্যাপারে সতর্ক হইতে পারেন। এক হাদীছে আছে المجالس بالامانة -অর্থাৎ মজলিসের কথাবার্তা আমানত স্বরূপ। মজলিসে উপস্থিত লোকদের উচিত নহে উহা অন্যত্র প্রকাশ করা। কিন্তু আলোচ্য ঘটনা ইহার অন্তর্ভুক্ত নহে। কেননা ইহা প্রকাশ না করিলে দ্বীনের

ক্ষতি হইবার আশংকা ছিল। বরং ইহা الدين النصيحة এই হাদীছের অন্তর্ভুক্ত। (অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি হিতাকাঙক্ষা পোষণের অন্তর্ভুক্ত। الدين النصيحة হাদীছটি পরবর্তীতে আসিতেছে।

(মূসা (আঃ)-কে **ইহার চাইতে বেশী কষ্ট** দেওয়া হইয়াছে) অন্যান্য নবীকে তাহাদের কাওম দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করিয়া দৈহিকভাবে নির্যাতন করিয়াছে। কিন্তু মূসা (আঃ)-কে তাঁহার অনুসারীরা ঈমান আনয়নের পরও বিভিন্ন আচরণ দ্বারা মানসিকভাবে কষ্ট দিয়াছে। এই কারণেই আলোচ্য ক্ষেত্রে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সান্ত্বনা লাভের জন্য হযরত মূসা (আঃ)-এর ঘটনা স্মরণ করিয়াছিলেন। আল্লাহ পাক মূসা (আঃ)-এর প্রসংগ উল্লেখপূর্বক মুমিনগণকে সতর্ক করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ آذَوا مُوسٰى *

হে মুমিনগণ! তোমরা ঐ লোকদের মত হইও না যাহারা মূসা (আঃ)-কে কষ্ট দিয়াছিল।

৪৪। দুনিয়াতে শাস্তি হওয়া অনুগ্রহের প্রমাণ

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا اَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ خَيْرًا عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوْبَةَ فِيْ الدُّنْيَا، وَإِذَا اَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ اَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتّٰى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ যখন বান্দার কল্যাণ চাহেন তখন দুনিয়াতেই তাহাকে তাড়াতাড়ি শাস্তি দিয়া দেন। আর যখন বান্দার অকল্যাণ চাহেন তখন তাহাকে পাপে লিপ্ত রাখিয়া তাহার শাস্তি বিলম্বিত করেন। অতঃপর কেয়ামতের দিন তাহাকে পুরা পুরা প্রতিদান দেন।

ফায়দা ঃ

(**দুনিয়াতে তাড়াতাড়ি শাস্তি দিয়া দেন**) ইহা কল্যাণকর হইবার কারণ এই যে, দুনিয়ার শাস্তিকে যত কঠিনই মনে করা হউক না কেন উহা তো ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু আখিরাতের শাস্তি হইল চিরস্থায়ী, যাহার শুরু হইবে কিন্তু শেষ হইবে না। ইহা তো হইল কাফিরদের বেলায়। পক্ষান্তরে মুসলমানদের ক্ষেত্রে যদিও ঈমানের বরকতে একদিন না একদিন তাহার শাস্তি শেষ হইবে এবং সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। কিন্তু দুনিয়ার জিন্দেগির তুলনায় উহা এত দীর্ঘ হইবে যে, অনন্তকালের মতই মনে হইবে। তাহাছাড়া জাহান্নামের এক মুহূর্ত আযাবের ভয়াবহতার তুলনায় দুনিয়ার সারা জীবনের সকল বিপদ মুছীবত একেবারেই তুচ্ছ। কেননা জাহান্নামের আদনা দরজার শাস্তি হইল এই যে, জাহান্নামীকে একজোড়া আগুনের জুতা পরাইয়া দেওয়া হইবে। ফলে তাহার মাথার মগজ পর্যন্ত টগবগ করিতে থাকিবে। যেমন চুলার উপরে ডেগের পানি টগবগ করিতে থাকে।

এখন ভাবিয়া দেখুন; দুনিয়ার বড় হইতে বড় কোন মুছীবতও কি ইহার সমতুল্য হইতে পারে!

(আর যখন বান্দার অকল্যাণ চাহেন) বান্দা গোনাহে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও বিপদ মুছীবতের শাস্তি না আসা এবং সুখ শান্তি ও সচ্ছলতা অব্যাহত থাকা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ এই বান্দার অকল্যাণ চাহিতেছেন। কেননা ক্ষণস্থায়ী নেয়ামত দান করিয়া তাহাকে চিরস্থায়ী নেয়ামত হইতে বঞ্চিত করিতেছেন এবং চিরস্থায়ী আযাবের জন্য তাহাকে প্রস্তুত করিতেছেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে—

وَ اُمْلِىْ لَهُمْ اِنَّ كَيْدِىْ مَتِيْنٌ *

আমি তাহাদিগকে ঢিল দিতেছি। নিঃসন্দেহে আমার ধরা বড় কঠিন।

হাদীছের শিক্ষা ঃ যাহাদের উপর বিপদ নাযিল হইয়াছে তাহাদের কর্তব্য হইল পাপ মোচনের সুযোগ মনে করিয়া উহার উপর ছবর করা। কেননা বে-ছবরী দ্বারা তাকদীর রদ হইবে না অথচ পাপ মোচনের সুযোগ হাতছাড়া হইবে। বরং বে-ছবরীর আলাদা গোনাহ হইবে। পক্ষান্তরে গোনাহে লিপ্ত থাকিবার পরও যাহাদের খোশহাল অবস্থা বজায় থাকে তাহাদের উচিত সতর্ক হওয়া। কেননা ইহা তাহার প্রতি আল্লাহর নারাযি ও ক্রোধের লক্ষণ।

৪৫। যত বড় মুছীবত তত বিরাট আজর

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «إِنَّ عِظَمَ الجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ البَلَاءِ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا اَحَبَّ قَوْمًا اِبْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخْطُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

আর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, বিরাট মুছীবতের ক্ষেত্রেই বিরাট প্রতিদান হইয়া থাকে। আর আল্লাহ পাক যখন কোন কাওমকে ভালবাসেন তখন তাহাদিগকে পরীক্ষা করেন। সুতরাং যে (তাকদীরের ফায়সালায়) সন্তুষ্ট থাকে তাহার জন্য রহিয়াছে (আল্লাহর) সন্তুষ্টি। আর যে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে তাহার জন্য রহিয়াছে (আল্লাহর) অসন্তুষ্টি। (তিরমিযি শরীফ)

ফায়দা ঃ

(বিরাট মুছীবতের ক্ষেত্রেই বিরাট প্রতিদান) হযরত জাবির (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন—

يود اهل العافية يوم القيامة حين يعطى اهل البلاء الثواب ان لو كانت جلودهم قرضت فى الدنيا بالمقاريض *

(দুনিয়ার) নিরাপদ লোকেরা কেয়ামতের দিন যখন মুছীবত ভোগকারী লোকদিগকে প্রতিদান লাভ করিতে দেখিবে তখন তাহারা আকাঙক্ষা করিবে যে, হায়, যদি দুনিয়াতে তাহাদের চামড়া কাঁচি দ্বারা কর্তন করা হইত! (তবে কত না ভাল হইত, আজ প্রতিদান পাওয়া যাইত!)

গোনাহগারের জন্য মুছীবতের পরীক্ষা হইল, গোনাহের কাফফারা স্বরূপ, যাহাতে সে বিচার

দিবসের পাকড়াও হইতে বাঁচিয়া যায়। পক্ষান্তরে নেককারদের ক্ষেত্রে মুছীবতের পরীক্ষা হইল তাহার দরজা বুলন্দি ও মর্তবা বৃদ্ধির জন্য। ইহাই নিম্নোক্ত হাদীছের মতলব।

اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل *

আম্বিয়ায়ে কেরামই হইলেন সর্বাধিক মুছীবতের পরীক্ষার সম্মুখীন। অতঃপর পর্যায়ক্রমে যাহারা অধিকতর নিকটবর্তী।

(যে সন্তুষ্ট থাকে) বিপদ মুছীবত নাযিল হইবার পর বান্দার তিনটি মাকাম বা স্তর হইয়া থাকে। একটি হইল مقام الرضى (বা সন্তুষ্টির স্তর) এই স্তরে বান্দা আল্লাহর ফায়সালার উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করে এবং ইহা ভাবিয়া আনন্দিত হয় যে, আল্লাহ্ তাহাকে মুহব্বত করিতেছেন। ইহা সর্বোচ্চ স্তর। দ্বিতীয় হইল مقام الصبر (বা ছবর ও ধৈর্যের স্তর) এই স্তরে বান্দা বিপদ মুছীবতের কষ্ট বোধ করিলেও তাকদীরের ফায়সালা মনে করিয়া ছাওয়াব লাভের আশায় ধৈর্য ধারণ করে। তৃতীয়টি হইল مقام السخط (অসন্তুষ্টির স্তর) এই স্তরে বান্দা অধৈর্য প্রকাশ করে এবং তাকদীরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে। সে মুছীবতের কষ্ট ভোগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর নারাযিরও পাত্র হয়।

৪৬। এক স্ত্রীছাহাবীর ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তা

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ ابْنٌ لِأَبِيْ طَلْحَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَشْتَكِيْ، فَخَرَجَ اَبُوْ طَلْحَةَ، فَقُبِضَ الصَّبِيُّ، فَلَمَّا رَجَعَ اَبُوْ طَلْحَةَ قَالَ: مَا فَعَلَ ابْنِيْ؟ قَالَتْ اُمُّ سَلَيْمٍ ـ وَهِيَ اُمُّ الصَّبِيِّ ـ: هُوَ اَسْكَنُ مَا كَانَ، فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ الْعَشَاءَ فَتَعَشّٰى، ثُمَّ اَصَابَ مِنْهَا، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ: وَارُوا الصَّبِيَّ، فَلَمَّا اَصْبَحَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرَهُ، فَقَالَ: «اَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا» فَوَلَدَتْ غُلَامًا، فَقَالَ لِيْ اَبُوْ طَلْحَةَ: احْمِلْهُ حَتّٰى تَاْتِيَ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، وَبَعَثَ مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ، فَقَالَ: «اَمَعَهُ شَيْءٌ؟» قَالَ: نَعَمْ، تَمَرَاتٌ، فَاَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَمَضَغَهَا، ثُمَّ اَخَذَهَا مِنْ فِيْهِ فَجَعَلَهَا فِيْ فِيِّ الصَّبِيِّ، ثُمَّ حَنَّكَهُ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللّٰهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: قَال ابْنُ عُيَيْنَةَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ: فَرَاَيْتُ تِسْعَةَ اَوْلَادٍ كُلُّهُمْ قَدْ قَرَؤُوْا الْقُرْاٰنَ، يَعْنِيْ مِنْ اَوْلَادِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمَوْلُوْدِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : مَاتَ ابْنٌ لِأَبِيْ طَلْحَةَ مِنْ اُمِّ سُلَيْمٍ، فَقَالَتْ لِاَهْلِهَا: لَا تُحَدِّثُوْا اَبَا طَلْحَةَ بِابْنِهِ حَتّٰى اَكُوْنَ اَنَا اُحَدِّثُهُ، فَجَاءَ فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ عَشَاءً فَاَكَلَ وَشَرِبَ، ثُمَّ تَصَنَّعَتْ لَهُ اَحْسَنُ مَا كَانَتْ تَصَنَّعُ قَبْلَ ذٰلِكَ، فَوَقَعَ بِهَا، فَلَمَّا اَنْ رَاَتْ اَنَّهُ قَدْ شَبِعَ وَاَصَابَ مِنْهَا قَالَتْ: يَا اَبَا طَلْحَةَ، اَرَاَيْتَ لَوْ اَنَّ قَوْمًا اَعَارُوْا عَارِيَتَهُمْ اَهْلَ بَيْتٍ فَطَلَبُوْا عَارِيَتَهُمْ، اَلَهُمْ اَنْ يَمْنَعُوْهُمْ؟ قَالَ: لَا، فَقَالَتْ: فَاحْتَسِبِ ابْنَكَ . قَالَ: فَغَضِبَ، ثُمَّ قَالَ: تَرَكْتِنِيْ حَتّٰى إِذَا تَلَطَّخْتُ ثُمَّ اَخْبَرْتِنِيْ بِابْنِيْ؛ فَانْطَلَقَ حَتّٰى اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ، فَقَالَ

رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «بَارَكَ اللهُ فِي لَيْلَتِكُمَا»، قَالَ: فَحَمَلَتْ، قَالَ: وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ وَهِيَ مَعَهُ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَتَى الْمَدِيْنَةَ مِنْ سَفَرٍ لَا يَطْرُقُهَا طُرُوْقًا فَدَنَوْا مِنَ الْمَدِيْنَةِ، فَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ، فَاحْتَبَسَ عَلَيْهَا أَبُوْ طَلْحَةَ، وَانْطَلَقَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. قَالَ: يَقُوْلُ أَبُوْ طَلْحَةَ: إِنَّكَ لَتَعْلَمُ يَا رَبِّ أَنَّهُ يُعْجِبُنِيْ أَنْ أَخْرُجَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ، وَأَدْخُلَ مَعَهُ إِذَا دَخَلَ، وَقَدِ احْتَبَسْتُ بِمَا تَرَى، تَقُوْلُ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا أَبَا طَلْحَةَ مَا أَجِدُ الَّذِيْ كُنْتُ أَجِدُ، انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، وَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ حِيْنَ قَدِمَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا. فَقَالَتْ لِيْ أُمِّيْ: يَا أَنَسُ لَا يُرْضِعُهُ أَحَدٌ حَتَّى تَغْدُوَ بِهِ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا أَصْبَحَ احْتَمَلْتُهُ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيْثِ

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আবু তালহা (রাঃ)–এর পুত্র অসুস্থ ছিল। আবু তালহা (কোন কাজে) বাহিরে গিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে ছেলেটির মৃত্যু হইল। তিনি (ঘরে) ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বাচ্চার কি খবর? বাচ্চার মা উম্মে সোলায়ম বলিলেন, সে আগের তুলনায় আরামে আছে। (হযরত আবু তালহা আশ্বস্ত হইলেন) অতঃপর উম্মে সোলায়ম তাহার জন্য রাত্রের খাবার হাযির করিলেন আর তিনি আহার করিলেন। ঐ রাত্রে তিনি স্ত্রীসহবাস করিলেন। যখন তিনি অবসর হইলেন তখন উম্মে সোলায়ম তাঁহাকে (বিভিন্ন সান্ত্বনামূলক বাক্যসহ পুত্রের মৃত্যু সংবাদ দিয়া) বলিলেন, পুত্রকে দাফনের ব্যবস্থা করুন।

ভোরে হযরত আবু তালহা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির হইয়া ঘটনা বলিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ রাত্রে কি তোমরা সহবাস করিয়াছ? তিনি বলিলেন, জ্বি হাঁ। তিনি (এই বলিয়া) দু'আ করিলেন, হে আল্লাহ! তাহাদিগকে (এই সহবাসে) বরকত দান করুন। অতঃপর এই সহবাসের ফলে এক পুত্রসন্তানের জন্ম হইল। (হযরত আনাস (রাঃ) বলেন,) আবু তালহা আমাকে বলিলেন, তাহাকে কোলে করিয়া রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লইয়া যাও। তিনি বাচ্চার সহিত কয়েকটি খেজুরও পাঠাইয়া দিলেন। (আমি বাচ্চাকে কোলে করিয়া রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির করিলাম।) তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার সংগে কি কিছু আছে? আমি বলিলাম, হাঁ, কয়েকটি খেজুর আছে। তিনি উহা চিবাইয়া নিজের মুখ হইতে বাহির করিলেন, অতঃপর উহা বাচ্চার মুখে দিলেন। অতঃপর তিনি বাচ্চার নাম রাখিলেন আব্দুল্লাহ।

(বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

বুখারী শরীফের এক বর্ণনায় আছে– হযরত ইবনে ওয়ায়নাহ (রহঃ) বলেন, জনৈক আনছারী ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছেন যে, (রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আর বরকতে) জন্মগ্রহণকারী আব্দুল্লাহর নয় পুত্রকে আমি দেখিয়াছি। তাহারা সকলেই কোরআনের হাফিয ছিল।

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় আছে, উম্মে সোলায়মের গর্ভে জন্মগ্রহণকারী আবু

তালহার পুত্রের যখন মৃত্যু হইল তখন উম্মে সোলায়ম ঘরের সকলকে বলিয়া দিলেন, আমি খবর দিবার আগে তোমরা কেহ তাহাকে এই খবর দিও না। আবু তালহা (রাঃ) যখন ফিরিয়া আসিলেন তখন তিনি তাহার সামনে রাত্রের খাবার পেশ করিলেন। হযরত আবু তালহা পানাহার করিলেন। অতঃপর উম্মে সোলায়ম স্বামীর জন্য আগের চাইতেও বেশী করিয়া সাজসজ্জা করিলেন। ফলে হযরত আবু তালহা স্ত্রীসহবাস করিলেন। হযরত উম্মে সোলায়ম (রাঃ) যখন দেখিলেন যে, স্বামী পানাহারে ও সহবাসে পরিতৃপ্ত হইয়াছেন, তখন তিনি বলিলেন, হে আবু তালহা! বলুন দেখি; কোন কাওম কোন পরিবারকে কোন জিনিস ধার দিল। অতঃপর তাহারা তাহাদের ধারের জিনিস ফেরত চাহিল। এখন সেই পরিবারের লোকদের কি উক্ত জিনিস ফেরত না দিবার অধিকার আছে? তিনি বলিলেন, না (এই অধিকার নাই।) তখন উম্মে সোলায়ম বলিলেন, তবে তোমার পুত্রের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ কর এবং আল্লাহর নিকট ছাওয়াবের আশা পোষণ কর। (এমন কিছু বলিও না, বা করিও না যাহাতে ছাওয়াব নষ্ট হইয়া যায়।)

(হযরত আনাস (রাঃ) বলেন,) তখন আবু তালহা (রাঃ) রাগিয়া বলিলেন, আমাকে আগে বলিলে না। এখন নাপাক হইবার পর বলিতেছ! অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির হইয়া ঘটনা জানাইলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ্ তোমাদের এই রাত্রে বরকত দান করুন।

(হযরত আনাস (রাঃ) বলেন) অতঃপর উম্মে সোলায়ম (রাঃ) গর্ভবতী হইলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সফরে ছিলেন। হযরত উম্মে সোলায়মও তাঁহার সংগে সফরে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন সফর হইতে মদীনায় ফিরিয়া আসিতেন তখন রাত্রে প্রবেশ করিতেন না। যখন কাফেলা মদীনার নিকটবর্তী হইল তখন হযরত উম্মে সোলায়মের প্রসববেদনা শুরু হইল। ফলে আবু তালহা তাহার সেবা-যত্নের জন্য আটকা পড়িয়া গেলেন। আর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মদীনার পথে) অগ্রসর হইলেন।

(হযরত আনাস (রাঃ) বলেন,) আবু তালহা (আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করিয়া) বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি অবশ্যই জানেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (মদীনা হইতে) বাহির হন তখন তাঁহার সংগে বাহির হওয়া এবং যখন তিনি (মদীনায়) প্রবেশ করেন তখন তাঁহার সংগে প্রবেশ করা আমার খুবই পছন্দনীয়। অথচ আপনি দেখিতেছেন, আমি কি বিপদে আটকা পড়িয়া গিয়াছি। হযরত উম্মে সোলায়ম (রাঃ) বলিলেন, হে আবু তালহা! প্রথমে যেমন ব্যথাবোধ হইতেছিল এখন তেমন হইতেছে না। (সুতরাং) সামনে অগ্রসর হও। (হযরত আনাস (রাঃ) বলেন,) তখন আমরা সামনে অগ্রসর হইলাম। যখন তাহারা উভয়ে (রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে মদীনায়) আগমন করিলেন তখন তাহার প্রসববেদনা শুরু হইল এবং তিনি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন।

আমার আম্মা (উম্মে সোলায়ম) আমাকে বলিলেন, হে আনাস! তুমি তাহাকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে লইয়া যাইবার পূর্বে কেহ যেন

তাহাকে স্তন্যদান না করে। যখন সকাল হইল তখন আমি তাহাকে কোলে করিয়া রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে লইয়া গেলাম।

অতঃপর হযরত আনাস (রাঃ) উপরোল্লেখিত পূর্ণ হাদীছ বর্ণনা করিলেন।

ফায়দা ঃ

উম্মে সোলায়মের পরিবারের সহিত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গভীর মুহব্বতের সম্পর্ক ছিল। তিনি তাঁহার বাড়ীতে যাওয়া আসা করিতেন। মদীনায় তাঁহার শুভাগমনের পর উম্মে সোলায়ম তাঁহার দশ বৎসরের বালক-পুত্র হযরত আনাস (রাঃ)-কে তাঁহার খিদমতের জন্য তাঁহার পবিত্র হাতে সোপর্দ করিয়াছিলেন। মদনী জিন্দেগীর পুরা দশ বৎসর হযরত আনাস (রাঃ) তাঁহার খিদমত করিয়াছিলেন। হযরত আনাস (রাঃ) ছিলেন হযরত উম্মে সোলায়ম (রাঃ)-এর প্রথম স্বামীর ঔরসজাত।

হযরত আবু তালহা (রাঃ)-এর ঔরসজাত হযরত উম্মে সোলায়মের যে পুত্রসন্তানটি মারা গিয়াছিল তাহাকেও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব স্নেহ করিতেন এবং হাস্য পরিহাস করিয়া তাহাকে আনন্দ দিতেন। এই বাচ্চা একবার একটি পাখী ধরিয়া উহাকে পালন করিতে শুরু করিয়াছিল। কিন্তু পাখীটি মারা গেল। ফলে 'পাখীর শোকে' সে অনেক কাঁদিল। পরে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে পরিহাস করিয়া বলিলেন,

يا ابا عمير! ما فعل النغير؟

হে আবু ওমায়র! কোথায় তোমার নোগায়র? (ওমায়র শব্দের সহিত ছন্দ রাখিবার জন্য নোগায়র বলিয়াছেন। ইহার অর্থ ছোট পাখী।) কোন কোন আলিম লিখিয়াছেন, বাচ্চাটিকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'আবু ওমায়র' উপনামে ডাকিবার মাঝেই ইংগিত ছিল যে, বাচ্চাটি স্বল্পায়ু হইবে। কেননা عمير শব্দের অর্থ স্বল্পায়ু।

(**ইতিমধ্যে ছেলেটির মৃত্যু হইল**।) এক বর্ণনায় আসিয়াছে যে, হযরত আবু তালহা (রাঃ) সেই দিন রোজা অবস্থায় ছিলেন এবং পুত্রের মৃত্যুর পর হযরত উম্মে সোলায়ম (রাঃ) তাহার পূর্বস্বামীর ঔরসজাত পুত্র হযরত আনাস (রাঃ)-কে পাঠাইয়া হযরত আবু তালহা (রাঃ)-কে ডাকাইয়া আনিয়াছিলেন এবং তাহাকে তাকীদ সহ বলিয়া দিয়াছিলেন যে, পথে যেন তিনি পুত্রের মৃত্যু সংবাদ জানিতে না পারেন।

ইবনে মাজাহ শরীফের এক হাদীছে হযরত আবু তালহার সহিত উম্মে সোলায়মের বিবাহ প্রসংগে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইসলাম গ্রহণের শর্তে আবু তালহাকে বিবাহ করিতে রাজী হইয়াছিলেন। উক্ত হাদীছে আছে–

উম্মে সোলায়ম একটি ফুটফুটে সুন্দর পুত্রসন্তান জন্মদান করিলেন। আবু তালহা শিশুটিকে খুবই মুহব্বত করিতেন। তাহার যখন দৌড়াদৌড়ি করিবার বয়স হইল তখন একদিন ছেলেটি অসুস্থ হইয়া পড়িল। আর পুত্রের অসুখে আবু তালহা বড়ই কাতর ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন।

আবু তালহা সকাল সন্ধ্যা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে গমন

করিতেন। নিয়মমত এক সন্ধ্যায় তিনি দরবারে নববীতে গমন করিলেন। সেই সময় ছেলেটির মৃত্যু হইল।

(আগের তুলনায় আরামে আছে) হযরত উম্মে সোলায়মের উদ্দেশ্য ছিল যে, আগে তো অসুখের কষ্ট এবং মৃত্যু যন্ত্রণা হইতেছিল। এখন মৃত্যুর কারণে ঐ সকল কিছুই নাই। আর হযরত আবু তালহা (রাঃ) বুঝিলেন যে, সুস্থতার কারণে পুত্র আরামে আছে। হযরত উম্মে সোলায়ম তাঁহার দ্বীনী প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার কারণে ইচ্ছা করিয়াই দ্ব্যর্থ্যবোধক কথা বলিয়াছিলেন। এই ঘটনা হইতে কাহাকেও কোন শোক সংবাদ প্রদানের আদব ও তরীকা জানা যাইতেছে।

বস্তুতঃ হিকমতের পরিবর্তে হঠাৎ করিয়া শোকসংবাদ জানাইবার কারণে অনেক সময় নতুন শোকাবহ ঘটনার উদ্ভব হইতে দেখা যায়।

(খেজুর পাঠাইয়া দিলেন) নবজাতককে কোন আল্লাহওয়ালার খিদমতে লইয়া গিয়া খেজুর চিবাইয়া মুখে দেওয়া সুন্নত। ইহা ঈমান লাভের শুভলক্ষণ। কেননা খেজুর গাছকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিনের সহিত তুলনা করিয়াছেন। ইহাছাড়া খাদ্য হিসাবেও খেজুরের মিষ্টতা খুবই উপকারী।

(নাম রাখিলেন) শিশুর জন্মের পর কোন আল্লাহওয়ালাকে দিয়া একটি সুন্দর নাম রাখা সুন্নত, এই হাদীছ হইতে তাহা প্রমাণিত হয়। বস্তুতঃ শিশুদের সুন্দর নাম রাখা মা বাবার অন্যতম পবিত্র কর্তব্য। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ পিতামাতা এই বিষয়ে চরম কর্তব্য-অবহেলা করিতেছে। আবার পরে অভিযোগ করে যে, ছেলে মেয়ে আমাদের কথা শুনে না। আমাদের হক আদায় করে না। অথচ প্রথমে নিজেরাই সুন্দর ইসলামী নাম না রাখিয়া সন্তানের হক নষ্ট করিয়া বসিয়া আছে। কত পরিতাপের বিষয় যে, নাম শুনিয়া আজ বুঝিবার উপায় থাকে না যে, মুসলমানের বাচ্চা না কি কাফিরের বাচ্চা।

অবশ্য ইহা ঠিক যে, শুধু সুন্দর ইসলামী নাম রাখিয়া দিলেই কর্তব্য শেষ হয় না। বরং সেই সংগে সন্তানের পরিপূর্ণ ইসলামী তারবিয়াতও করিতে হয়। নচেৎ সুন্দর নাম উহার সুফল দিতে পারে না। ইহার পরও কোন না কোন সময় সুন্দর নামের বরকত প্রকাশ হইয়াই পড়ে।

(কোন কওম কোন পরিবারকে কোন জিনিস ধার দিল।) ইহা দ্বারা হযরত উম্মে সোলায়ম এই কথা বুঝাইয়াছেন যে, সন্তানের মৃত্যুতে অতিমাত্রায় শোককাতর হওয়া উচিত নহে। কেননা সন্তানের মালিকানা আমার নহে। সন্তান হইল আল্লাহর দেওয়া আমানত। যখন ইচ্ছা তখনই তিনি উহা ফেরত লইতে পারেন। বস্তুতঃ ইহাই হইল আদর্শ মুসলিম স্ত্রীর চরিত্র। বিপদে আপদে সে নিজেও ধৈর্য ধারণ করিবে এবং স্বামীকেও ধৈর্য ধারণে অনুপ্রাণিত করিবে। তদ্রুপ সে নিজেও ধর্মের পথে অবিচল থাকিবে এবং স্বামীকেও ধর্মের পথে অবিচল থাকিতে সাহায্য করিবে।

(রাত্রে প্রবেশ করিতেন না) মুসাফিরকে নিজের বাড়ীতে বিনা ঘোষণায় রাত্রে প্রবেশ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। যেন এমন কিছু তাহার চোখে না পড়ে যাহা তাহার মনোকষ্টের বা পারিবারিক অশান্তির কারণ হইতে পারে। পক্ষান্তরে দিনের বেলা আগমন করিলে স্ত্রী সাজগোজ করিয়া তাহার স্বামীকে স্বাগত জানাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিবে এবং স্বামীও

তাহার স্ত্রীকে উত্তম সাজে দেখিতে পাইয়া আনন্দ লাভ করিতে পারিবে। এই হুকুম অবশ্য ঐ সময়ের জন্য যখন তাহার রাত্রিকালীন আগমনের খবর পূর্ব হইতে জানা না থাকে। যদি পূর্ব হইতে জানা থাকে তবে রাত্রে আগমন করায় কোন অসুবিধা নাই।

(কেহ যেন তাহাকে স্তন্যদান না করে) যেন নবজাতকের উদরে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র থুথু প্রবেশ করে আর ইহা তাহার উভয় জাহানের সৌভাগ্যের কারণ হয়।

৪৭। রাগ দমনের ফযীলত

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

«وَالصُّرَعَةُ» بِضَمِّ الصَّادِ وَفَتْحِ الرَّاءِ، وَأَصْلُهُ عِنْدَ الْعَرَبِ مَنْ يَصْرَعُ النَّاسَ كَثِيْرًا.

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, বীর সে নহে যে কাহাকেও পরাভূত করে। বরং বীর সে-ই যে রাগের মাথায় (শরীয়তের খেলাফ কোন কাজ করা হইতে) নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখিতে পারে। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

হাদীছের মতলব হইল, শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রশংসনীয় বীরত্বের মাপকাঠি দৈহিক শক্তি নহে। বরং ক্রোধ সম্বরণের আত্মিক শক্তিই হইল মাপকাঠি। কেননা শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করিবার চাইতে নিজের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করা অনেক বেশী কঠিন। বর্ণিত আছে যে, এক জিহাদ হইতে ফিরিয়া রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবা কেরামকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন–

رجعتم من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر *

তোমরা ছোট জিহাদ হইতে বড় জিহাদে প্রত্যাবর্তন করিয়াছ।

অর্থাৎ এখন তোমাদের নফসকে দমন করিবার জিহাদ শুরু করিতে হইবে এবং ইহাই হইল আসল জিহাদ।

বস্তুতঃ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্রোধ দমন করা এবং নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখা তাহার পক্ষেই সম্ভব যিনি জীবনের সকল ক্ষত্রে মুস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের ইত্তেবা ও অনুসরণকে নিজের জীবনের নীতি রূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং শরীয়তের লাগাম দ্বারা নফসের অবাধ্য ঘোড়াকে বাগে আনিয়া সরল পথে পরিচালিত করিবার সাধনায় নিয়োজিত হইয়াছেন। ইহাকেই বলে, মুজাহাদা বা সংযম সাধনা। যিনি এই স্তরে উপনীত হইতে সক্ষম হইবেন তিনি শয়তানের নাগালের বাহিরে এবং ফিরিশতাগণের হিফাযতে থাকিবেন। কেননা ক্রোধ হইল শয়তানের লাগাম।

৪৮। রাগের চিকিৎসা

وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، وَرَجُلَانِ يَسْتَبَانِ، وَأَحَدُهُمَا قَدِ احْمَرَّ وَجْهُهُ، وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ، لَوْ قَالَ: أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ذَهَبَ مِنْهُ مَا يَجِدُ». فَقَالُوْا لَهُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «تَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত সোলায়মান বিন ছোরাদ (রাঃ) বলেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে বসা ছিলাম। (কিছু দূরে) দুইজন লোক ঝগড়া করিতেছিল। তাহাদের একজনের চেহারা রাগে লাল হইয়া গেল এবং গলার রগ ফুলিয়া উঠিল। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি একটি বাক্য জানি; যদি সে উহা বলিত তবে তাহার রাগ দূর হইয়া যাইত। যদি সে أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ বলিত তবে তাহার রাগ দূর হইয়া যাইত। তখন লোকেরা তাহাকে গিয়া বলিল যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ বলিতে হুকুম করিয়াছেন। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

হাদীছের এই উপদেশ মূলতঃ কোরআন শরীফের নিম্নোক্ত আয়াত হইতে উৎসারিত–

إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ *

শয়তানের পক্ষ হইতে কোন প্ররোচনা যদি আপনাকে প্ররোচিত করে তবে আপনি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করুন। (অর্থাৎ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم বলুন)

যেহেতু ক্রোধ হইল শয়তানী ওয়াসওয়াসা, যাহা সে মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করে। সেহেতু অন্তরে ক্রোধের সঞ্চার হইবামাত্র اعوذ بالله বলিয়া অভিশপ্ত শয়তানের প্রভাব হইতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা কর্তব্য। তখন আল্লাহর ফজল হইবে এবং শয়তান দূর হইয়া যাইবে এবং ক্রোধের উপশম হইবে। অন্যথায় শয়তান তাহার উপর সওয়ার হইয়া তাহাকে এমনই ক্রোধান্ধ করিয়া ফেলিবে আর তখন সে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া এমন সব কাণ্ড করিয়া বসিবে যে, সারা জীবন আফসোস করিয়াও উহার ক্ষতিপূরণ হইবে না।

বস্তুতঃ ক্রোধের ভয়ংকর পরিণাম বাস্তব জীবনে আমরা বারংবার প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি।

তাহাছাড়া হাদীছ শরীফে আসিয়াছে–

ان الغضب يفسد الايمان كما يفسد الصبر العسل *

'মুসাববর' যেমন (উহার তিক্ততা দ্বারা) মধুকে নষ্ট করিয়া দেয় তদ্রূপ ক্রোধ ঈমানকে নষ্ট করিয়া দেয়।

অথচ দেখুন, এমন ভয়ংকর ব্যাধির কত সহজ চিকিৎসা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল বাতাইয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগা উম্মত যদি আমলই করিতে না চাহে, ব্যাধির চিকিৎসাই যদি পছন্দ

না হয় তবে কি আর করা যাইবে!

আলোচ্য হাদীছের বর্ণনায় এই অংশটি রহিয়াছে–

فقام الى الرجل ممن سمع النبى صلى الله عليه و سلم فقال اتدرى ما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم انفا، قال انى لاعلم كلمة لو قالها لذهب عنه– اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال له الرجل و هل انا مجنون *

তখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যাহারা এই কথা বলিতে শুনিয়াছে তাহাদের মধ্য হইতে একজন ঐ (ক্রুদ্ধ) লোকটির নিকট গিয়া বলিল, তুমি কি জান, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইমাত্র কি বলিয়াছেন? তিনি বলিয়াছেন, আমি এমন একটি কালিমা জানি, যদি সে উহা বলিত তবে তাহার ক্রোধ দূর হইয়া যাইত। (কালিমাটি হইল) اعوذ بالله من الشيطان الرجيم তখন সে (আরও ক্ষিপ্ত হইয়া) বলিল, আমাকে কি পাগল মনে করিয়াছ?

আল্লামা নববী (রহঃ) বলেন, সম্ভবতঃ লোকটি মুনাফিক ছিল কিংবা গোঁয়ার বেদুঈন ছিল যাহাদের কথাবার্তা স্বভাবতঃই অমার্জিত ও রুক্ষ ধাচের হইয়া থাকে।

কেহ কেহ অবশ্য বলিয়াছেন যে, এই লোকটি হযরত মু'আয (রাঃ) ছিলেন। এমনিতেও তাঁহার স্বভাবে যথেষ্ট উষ্ণতা ছিল। আল্লামা ইবনে হাজার হায়ছামী (রহঃ) বলেন, যদি ইহা বিশুদ্ধ প্রমাণিত হয় তবে যেহেতু হযরত মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) বিশিষ্ট ছাহাবী ছিলেন সেহেতু এই ব্যাখ্যা লইতে হইবে যে, বেআদবী তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। রাগের মাথায় বিনা চিন্তায় কথাটা তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল। পরবর্তীতে অবশ্যই তিনি তাওবা করিয়াছিলেন।

কিন্তু আমাদের মতে এই ধরণের ঘটনা ছিল দুইটি। কেননা মা'আরিফুল কোরআনের বর্ণনায় দেখা যায় যে, লোকটি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই পবিত্র বাণী শ্রবণ করিবামাত্র اعوذ بالله من الشيطان الرجيم বলিয়া উঠিলেন এবং সংগে সংগে তাঁহার ক্রোধ প্রশমিত হইয়া গেল। সম্ভবতঃ এই ঘটনার পাত্র হইলেন হযরত মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)। আল্লাহই উত্তম জানেন।

অন্য হাদীছে ক্রোধ দমনের আরেকটি উপায় বলা হইয়াছে যে, যখন ক্রোধ আসে তখন যদি দাঁড়ানো অবস্থায় থাক তবে বসিয়া পড়। বসা থাকিলে শুইয়া পড়। আর (ঠাণ্ডা পানি দ্বারা) অযু কর।

ইহাও চিন্তা করা উচিত যে, আল্লাহর গযব, আল্লাহর আযাব কত ভীষণ! আমি যদি নিজের ক্রোধ দমন না করি আর প্রতিশোধ গ্রহণ হইতে বিরত না হই তবে আল্লাহ পাকের আযাব গযব হইতে আমি নিজে কিভাবে রক্ষা পাইব!

অবশ্য ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন যে, যদি বার বার ভুল হইয়া যায় এবং রাগ আসিয়া যায় তবুও নিরাশ হওয়া উচিত হইবে না। বরং চেষ্টায় লাগিয়া থাকিবে এবং ক্রোধ প্রশমিত হইবার পর সংগে সংগে তাওবা করিয়া লইবে। তাহা হইলে ইনশাআল্লাহ ধীরে ধীরে ক্রোধ

নিয়ন্ত্রণে আসিয়া যাইবে। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে শয়তানী রোগ ক্রোধ হইতে হিফাযত করুন। আমীন

৪৯। ক্ষমতা সত্ত্বেও ক্রোধ সম্বরণের পুরস্কার

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَظَمَ غَيْظًا، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ، دَعَاهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاءَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

হযরত মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ক্রোধ চরিতার্থ করিবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও উহা দমন করে কেয়ামতের দিন তাহাকে আল্লাহ্ পাক সমস্ত মাখলূকের সম্মুখে ডাকিবেন এবং ডাগর ডাগর চোখের অধিকারিণী যে কোন হূর গ্রহণের ইখতিয়ার দিবেন।

(আবু দাউদ ও তিরমিযি শরীফ)

ফায়দা ঃ

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে মরফূ হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে–

من كظم غيظا و هو يقدر على انفاذه ملأ الله قلبه امنا و ايمانا *

যে ব্যক্তি ক্রোধ চরিতার্থ করিবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও উহা দমন করে আল্লাহ্ তাহার কলবকে ঈমান ও স্বস্তি দ্বারা পূর্ণ করিয়া দিবেন।

একইভাবে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে মরফূ হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে–

من كف غضبه ستر الله عورته *

যে তাহার ক্রোধ দমন করিবে আল্লাহ্ পাক (দুনিয়াতে ও কেয়ামতে) তাহার দোষ ঢাকিয়া রাখিবেন।

অন্য এক হাদীছে আছে–

من كف غضبه كف الله عنه عذابه يوم القيامة *

যে ব্যক্তি তাহার ক্রোধ দমন করিবে আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন আপন আযাবকে তাহার উপর হইতে দূর করিয়া দিবেন।

বস্তুতঃ ক্রোধের সময় ক্রোধ না আসা বিশেষ কোন কৃতিত্ব নয়। বরং ক্রোধ আসিবার পর উহা দমন করিতে পারাই হইল মহানুভবতার পরিচায়ক। ইহাই মুমিনের শান। এই জন্যই কোরআন শরীফে মুমিনের শান এইভাবে বয়ান করা হইয়াছে 'যাহারা ক্রোধ দমন করে।' ইহা বলা হয় নাই যে, 'যাহারা রাগই করে না।'

আল্লাহর নেক বান্দাদের ক্রোধ দমন করিবার বহু ঘটনা বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত আছে। শিক্ষা গ্রহণের জন্য এখানে কয়েকটি ঘটনা লেখা হইল–

বর্ণিত আছে যে, হযরত হোসায়ন বিন আলী (রাঃ)-এর এক গোলাম তাঁহার খিদমত করিত এবং অযুর পানি আগাইয়া দিত। একদিন সে ঘটিতে করিয়া পানি দিল। হযরত হোসায়ন (রাঃ) যখন অযু হইতে ফারেগ হইলেন, তখন গোলাম ঘটি সরাইতে গেল। কিন্তু দুর্ঘটনাক্রমে ঘটির নল হযরত হোসায়ন (রাঃ)-এর মুখে আঘাত করিল। ফলে তাঁহার সামনের দাঁত ভাংগিয়া গেল। তিনি রাগতঃ দৃষ্টিতে গোলামের দিকে তাকাইলেন। গোলাম সংগে সংগে বলিয়া উঠিল و الكظمين الغيظ (যাহারা ক্রোধ দমন করে) তিনি বলিলেন, আচ্ছা আমি ক্রোধ দমন করিলাম। গোলাম বলিল, وَ الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ (এবং যাহারা মানুষকে ক্ষমা করে) তিনি বলিলেন, আচ্ছা আমি তোমাকে মাফ করিয়া দিলাম। গোলাম বলিল, وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ (আল্লাহ অনুগ্রহকারীদিগকে ভালবাসেন) তিনি বলিলেন, যাও তুমি আল্লাহর ওয়াস্তে আযাদ।

মূলতঃ গোলাম কোরআন শরীফের আয়াতের দিকে ইংগিত করিয়াছিল, যেখানে ক্রোধ দমন করা এবং মানুষকে ক্ষমা করাকে মুত্তাকীদের গুণ ও বৈশিষ্ট্য রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

কোন কোন বর্ণনায় ঘটনাটি হযরত আলী বিন হোসায়ন সম্পর্কে এবং গোলামের পরিবর্তে বাঁদীর কথা বলা হইয়াছে। হযরত আলী বিন হোসায়ন সম্পর্কে আরও বর্ণিত আছে যে, একবার তাহার এক গোলাম মেহমানদের জন্য গরম গরম গোশতের পেয়ালা আনিতেছিল। হঠাৎ পেয়ালা তাহার হাত হইতে ছুটিয়া হযরত আলী বিন হোসায়নের এক শিশুপুত্রের উপর পড়িল। ফলে তাহার মৃত্যু হইল। হযরত আলী বিন হোসায়ন (রহঃ) গোলামকে আযাদ করিয়া দিলেন। অতঃপর বাচ্চার কাফন দাফনে মনোনিবেশ করিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ মুফাসসির ইমাম রাজী (রহঃ) লিখিয়াছেন, হযরত মূসা আলাইহিস সালামের জালালী তবীয়তের কথা তো প্রসিদ্ধ। কিন্তু তাঁহার ক্রোধ দমনের অবস্থা এই ছিল যে, একদিন এক বকরীর পাল হইতে একটি বকরী ছুটিয়া গেল। হযরত মূসা (আঃ) উহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য উহার পিছনে দৌড়াইতে লাগিলেন। বকরী ছুটিতে ছুটিতে বহু দূর চলিয়া গেল। হযরত মূসা (আঃ)ও লাঠি লইয়া পিছনে দৌড়াইতে লাগিলেন। কাঁটা বিঁধিয়া বিঁধিয়া তাঁহার পা রক্তাক্ত হইয়া গেল। বকরীর পা হইতেও রক্ত ঝরিতেছিল। অবশেষে বকরীটি ক্লান্ত হইয়া থামিয়া গেল এবং হাঁপাইতে লাগিল। তখন হযরত মূসা (আঃ) বকরীটিকে ধরিলেন। (জনৈক তত্ত্বজ্ঞানী বলেন,) ভাবিয়া দেখুন; আমরা হইলে কি করিতাম! দুনিয়ার আর কোন রাখাল হইলে কি করিত! লাঠি দ্বারা পিটাইয়া বকরীর বাচ্চাকে আধমরা করিয়া ফেলিত না? কিন্তু মূসা (আঃ) কি করিলেন! নিজের পায়ের কাঁটাগুলির কথা চিন্তা না করিয়া প্রথমে বকরীর পায়ের কাঁটা বাহির করিলেন এবং তাহার পা টিপিয়া টিপিয়া ব্যথা কমাইলেন। অতঃপর উহাকে কাঁধে করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। তখন ক্রোধের পরিবর্তে তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিতেছিল। আর তিনি বলিতেছিলেন, হে বকরী! মূসার উপর যদি তোমার দয়া না হইয়া থাকে তবে নিজের উপর কেন দয়া করিলে না! নিজেকে কেন বিপদের মুখে ফেলিতে গেলে! (যদি নেকড়ের মুখে পড়িতে তবে কেমন হইত?)

ইমাম রাযি (রহঃ) বলেন, এই ঘটনা ছিল তাঁহার নবুওয়ত লাভের পূর্বে। ফিরিশতাগণ তখন আল্লাহ পাকের দরবারে আরয করিলেন, হে আল্লাহ! ইনি এত সহনশীল! স্বীয় রহমতগুণে আপনি তাঁহাকে নবী বানাইয়া দিন। আল্লাহ পাক ইরশাদ করিলেন। আমি আমার ইলমের মাঝে তাহাকে নবুওয়তের জন্য নির্বাচন করিয়া রাখিয়াছি।

৫০। রাগ না করিবার উপদেশ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَوْصِنِي، قَالَ: «لَا تَغْضَبْ»، فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: «لَا تَغْضَبْ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদ্রমতে আরয করিল, আমাকে কোন উপদেশ দান করুন। তিনি বলিলেন, কখনো ক্রুদ্ধ হইও না। লোকটি কয়েকবার উপদেশদানের আবেদন করিল আর তিনি (প্রতিবার) বলিলেন, ক্রুদ্ধ হইও না। (বুখারী শরীফ)

ফায়দা ঃ

তোহফাতুল ক্বারী কিতাবে বলা হইয়াছে যে, উপদেশ প্রার্থনাকারী ব্যক্তি হইলেন হযরত জারিয়া বিন কোদামা। কেহ কেহ তাঁহার নাম সুফয়ান বিন আব্দুল্লাহ ছাকাফী বলিয়াছেন। এই ধরনের উপদেশপ্রার্থনা বিভিন্ন হাদীছে হযরত ইবনে ওমর, আব্দুল্লাহ বিন আমর, আবু দারদা, জারিয়া বিন কোদামাহ ও হযরত মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) সম্পর্কেও বর্ণিত হইয়াছে।

(উপদেশ দান করুন) উপদেশের নির্দিষ্ট কোন বিষয় যেহেতু উল্লেখ করা হয় নাই সেহেতু মতলব হইল একটি সর্বাংগীন উপদেশ যাহা দ্বীন ও দুনিয়ার যাবতীয় কল্যাণ অন্তর্ভুক্ত করিবে।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী ও হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর এক বর্ণনায় এইরূপ আসিয়াছে–

اخبرنی بعمل يدخلنی الجنة، و لا تكثر علی لعلی اعقله *

আমাকে এমন একটি আমল বলিয়া দিন যাহা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবে। বিশদ কিছু বলিবেন না, যাহাতে আমি অনুধাবন (ও সংরক্ষণ) করিতে পারি।

(ক্রুদ্ধ হইও না) তাঁহার স্বভাবগতঃ বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে সম্ভবতঃ এই উপদেশেরই প্রয়োজন ছিল। তাই তাঁহার বারংবার প্রার্থনার উত্তরে একই উপদেশ তিনি দান করিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহা দ্বারা ক্রোধের ভীষণ ক্ষতিকরতা প্রমাণিত হয়। الخرائطی -এর বর্ণনায় অতিরিক্ত এই অংশটুকু পাওয়া যায়–

قال الرجل السائل ففكرت حين قال رسول الله صلی الله عليه و سلم، فاذا الغضب يجمع الشر كله *

প্রশ্নকারী ছাহাবী বলেন, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বলিলেন, তখন আমি (বিষয়টি) চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে, ক্রোধ সকল মন্দ ও অনিষ্ট একত্র করিয়া থাকে।

ইহার কারণ এই যে; মানুষের মাঝে 'অগ্নি উপাদান' রহিয়াছে। ইহা হইতেই ক্রোধের উৎপত্তি। যেমন হাদীছ শরীফে আসিয়াছে–

اتقوا الغضب فانه جمرة تتوقد فی قلب ابن آدم *

ক্রোধ পরিহার করিয়া চল। কেননা ইহা আদম সন্তানের কলবের মাঝে প্রজ্বলিত এক অগ্নিপিণ্ড।

আর শয়তানও আগুনের তৈরী। সুতরাং ক্রোধের মুহূর্তে আদমের বাচ্চা শয়তানের সহিত একাকার হইয়া যায়। আর তখন এমন কোন শয়তানী কাজ নাই যাহা আদমের বাচ্চা করিতে পারে না। এই কারণেই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারংবার প্রশ্নের মুখেও একই উপদেশ দান করিয়াছেন। لا تغضب -তুমি ক্রুদ্ধ হইও না।

তবে মনে রাখিতে হইবে যে, এই ক্রোধের অর্থ ব্যক্তিগত বিষয়ে ক্রোধ। অর্থাৎ আমার প্রতি কোন কষ্টদায়ক আচরণের কারণে আমি ক্রুদ্ধ হইলাম। ইহা নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে দ্বীনের কোন ক্ষতি হইতে দেখিয়া আল্লাহর ওয়াস্তে ক্রোধ আসা নিষিদ্ধ নহে বরং প্রশংসনীয়।

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের বিষয়ে কখনই ক্রুদ্ধ হইতেন না। কিন্তু যখন আল্লাহর হক নষ্ট হইতে দেখিতেন, তখন এত ক্রুদ্ধ হইতেন যে, তাঁহার চেহারা মোবারক লাল হইয়া যাইত। ছাহাবা কেরাম এমনও বলিয়াছেন–

كأن الرمان عصر على وجهه *

যেন আনার নিংড়াইয়া তাঁহার চেহারায় ঢালা হইয়াছে।

৫১। বিপদ মুছীবত মুসলমানের পাপ মোচন করে

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِيْ نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتّٰى يَلْقَى اللّٰهَ تَعَالٰى وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, মুমিন নারী-পুরুষের উপর জান-মালের দিক দিয়া এবং সন্তান-সন্ততির দিক দিয়া বিপদাপদ আসিতেই থাকে। এমন কি এক সময় সে এমন নিষ্পাপ অবস্থায় আল্লাহ পাকের সহিত মিলিত হয় যে একটি গোনাহও তাহার থাকে না। (তিরমিযি শরীফ)

ফায়দা ঃ

(বিপদাপদ আসিতেই থাকে) বাহ্যতঃ এই গুলিকে বিপদ মনে হইলেও যদি এই দিক দিয়া চিন্তা করা হয় যে, ইহা প্রতিপালকের পক্ষ হইতে আসিয়াছে তখন এইগুলিকে বিপদের পরিবর্তে নেয়ামত ও রহমত মনে হইবে।

সন্তানের দিক হইতে বিপদাপদের অর্থ সন্তানের অসুস্থতা, মৃত্যু কিংবা তাহাদের উশৃংখল হইয়া যাওয়া। পক্ষান্তরে যদি নিজের ত্রুটি বিচ্যুতি ও সঠিক তারবিয়াতের অভাবের কারণে সন্তান উশৃংখল হয় তবে ইহা বড়ই আফসোসের কথা।

আজকাল অবশ্য বেশীর ভাগ ইহাই হইতেছে। সন্তান মা-বাবাকে আল্লাহর নাফরমানি করিতে দেখিতেছে। ফলে সেও নাফরমানিতে লিপ্ত হইতেছে। এমনকি সন্তানকে শাসন করিবার নৈতিক মনোবলটুকুও যেন বর্তমানের অভিভাবকরা হারাইয়া ফেলিয়াছে।

(একটি গোনাহও তাহার থাকে না) ইহার বাহ্যিক অর্থ তো ইহাই যে, কবীরা গোনাহ এবং হক্কুল ইবাদ সমূহও মাফ হইয়া যাইবে। যদি ইহাই উদ্দেশ্য হয় তবে মহানদাতার দান

এবং ارحم الرحمين -এর রহমত কে রোধ করিতে পারে?

সাধারণভাবে শরীয়তের বিধান অবশ্য এই যে, কবীরা গোনাহ তাওবা ছাড়া এবং হক্কুল ইবাদ বান্দার নিকট হইতে মাফ করানো ছাড়া মাফ হয় না।

৫২। কোরআনের আদেশ পালনপূর্বক মুর্খ লোকদিগকে ক্ষমা করিবার উদাহরণ

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أَخِيْهِ الْحُرِّ بْنِ قَيْسٍ ، وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِيْنَ يُدْنِيْهِمْ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجْلِسِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُوْلًا كَانُوْا أَوْ شُبَّانًا، فَقَالَ عُيَيْنَةُ لِابْنِ أَخِيْهِ: يَا ابْنَ أَخِيْ لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هٰذَا الْأَمِيْرِ فَاسْتَأْذِنْ لِيْ عَلَيْهِ، فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ. فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ: هِيَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، فَوَاللّٰهِ مَا تُعْطِيْنَا الْجَزْلَ وَلَا تَحْكُمُ فِيْنَا بِالْعَدْلِ ، فَغَضِبَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حَتّٰى هَمَّ أَنْ يُوْقِعَ بِهِ، فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ لِنَبِيِّهِ ﷺ: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ ﴾ [الأعراف: ١٩٨]، وَإِنَّ هٰذَا مِنَ الْجَاهِلِيْنَ، وَاللّٰهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِيْنَ تَلَاهَا، وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, উয়ায়নাহ বিন হিছন একবার আপন ভাতিজা হযরত হুর বিন কায়স (রহঃ)-এর নিকট আসিলেন। তিনি (দ্বিতীয় খলীফা) হযরত ওমর (রাঃ)-এর সান্নিধ্যপ্রাপ্তদের একজন ছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ)–এর মজলিসের ও পরামর্শ সভার সদস্যরা যুবক হউক কিংবা প্রৌঢ় সকলেই আলিম ছিলেন।

উয়ায়নাহ তাহার ভাতিজাকে বলিলেন, হে ভাতিজা! আমীরের দরবারে তো তোমার বিশেষ মর্যাদা আছে। সুতরাং আমার জন্য সাক্ষাতের অনুমতি গ্রহণ কর। তিনি (আপন চাচার জন্য) অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে অনুমতি দিলেন। উয়ায়নাহ তাঁহার খিদমতে হাযির হইয়া বলিলেন, হে খাত্তাবের পুত্র! আল্লাহর কসম! তুমি আমাদিগকে বেশী পরিমাণে দিতেছ না এবং আমাদিগকে ইনছাফের সহিত শাসন করিতেছ না। হযরত ওমর (রাঃ) (তাহার এমন ঔদ্ধত্বপূর্ণ কথায়) ক্রুদ্ধ হইলেন। এমন কি তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। হযরত হুর বিন কায়স (রহঃ) তখন বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ পাক তাঁহার নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিয়াছেন–

خُذِ الْعَفْوَ وَ اْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ *

ক্ষমাগুণ অবলম্বন কর এবং নেক কাজের আদেশ দান কর এবং মুর্খ লোকদিগকে এড়াইয়া যাও (অর্থাৎ তাহাদের অন্যায় আচরণ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখ।)

আর নিঃসন্দেহে এই লোক মুর্খলোকদের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহর কসম! হযরত ওমর (রাঃ) এই আয়াত শুনিয়া আর বিন্দুমাত্র অগ্রসর হইলেন না। তিনি ছিলেন আল্লাহর কিতাবের সামনে চিরঅবনত। (বুখারী শরীফ)

ফায়দা ঃ

(ওয়ায়নাহ ইবনে হিছন) মক্কা বিজয়ের দিন কিংবা ইহার কিছু পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ঐ লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাহাদের মনোরঞ্জন করা হইত, যাহাতে তাহারা ইসলাম গ্রহণ করে। তদুপরি তিনি রুক্ষ মেযাজ আরব বেদুঈনদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাহাদের কথাবার্তা ও আচার-আচরণ ছিল অমার্জিত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের প্রতি পূর্ণ সহনশীলতা প্রদর্শন করিতেন। কেননা তাহাদের প্রতি কঠোর আচরণ করিলে তাহাদের ইসলাম গ্রহণ করা এবং ইসলামের উপর বহাল থাকা কষ্টকর হইয়া যাইত।

(ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখ) বর্ণিত আছে যে, যখন এই আয়াত নাযিল হইল তখন ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি? জিবরীল (আঃ) বলিলেন, জিজ্ঞাসা না করিয়া আমি বলিতে পারিব না। অতঃপর তিনি (আল্লাহর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া) ফিরিয়া আসিলেন এবং বলিলেন, আপনার প্রতিপালক আপনাকে আদেশ করিতেছেন, যে ব্যক্তি (খারাপ আচরণ দ্বারা) আপনার সংগে আত্মীয়তাসম্পর্ক ছিন্ন করিবে আপনি (উত্তম আচরণ দ্বারা) তাহার সহিত সম্পর্ক রক্ষা করিবেন এবং যে আপনাকে (আপনার প্রাপ্য হইতে) বঞ্চিত করিবে আপনি তাহাকে তাহার প্রাপ্য এবং প্রাপ্যের অতিরিক্ত দান করিবেন।

ইহা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নির্দেশ হইলেও তাঁহার উম্মতও এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। যে সকল ক্ষেত্রে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত খাছ বলিয়া প্রমাণ থাকে, যেমন এক প্রসংগে কোরআন শরীফে বলা হইয়াছে–

خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ *

ইহা আপনার জন্য খাছ। মুমিনদের জন্য নহে।

সেই সকল ক্ষেত্র ছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রে রাসূলের প্রতি সম্বোধন উম্মতের প্রতিও সম্বোধন বলিয়া গণ্য হইবে।

৫৩। অন্যের স্বার্থপরতা ও বে-ইনছাফির মুখে ধৈর্যধারণ

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «اِنَّهَا سَتَكُوْنُ بَعْدِيْ اَثَرَةٌ وَاُمُوْرٌ تُنْكِرُوْنَهَا! قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَا تَاْمُرُنَا؟ قَالَ: تُؤَدُّوْنَ الْحَقَّ الَّذِيْ عَلَيْكُمْ، وَتَسْاَلُوْنَ اللّٰهَ الَّذِيْ لَكُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

«وَالْاَثَرَةُ»: الْاِنْفِرَادُ بِالشَّيْءِ عَمَّنْ لَهُ فِيْهِ حَقٌّ.

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার পরে অচিরেই তোমরা অন্যায় অগ্রাধিকার দেখিতে পাইবে

এবং এমন সব বিষয় দেখিতে পাইবে যাহা তোমাদের পছন্দ হইবে না। তাঁহারা আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই সময়ের জন্য আপনি আমাদিগকে কি আদেশ করিতেছেন? তিনি বলিলেন, তোমাদের উপর (অন্যের) যে সকল হক রহিয়াছে তাহা (পূর্ণমাত্রায়) আদায় করিবে আর (অন্যের নিকট) তোমাদের যে হক রহিয়াছে তাহা আল্লাহর নিকট চাহিবে।(বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

বস্তুতঃ এই একটি হাদীছেই সর্বযুগের সর্বসমাজের যাবতীয় হানাহানি ও ফিতনা ফাসাদের সমাধান নিহিত রহিয়াছে। হাদীছের সারমর্ম হইল তোমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হইল শাসকবর্গের আনুগত্য করিয়া যাওয়া এবং বিদ্রোহ করিয়া অনৈক্য সৃষ্টি না করা। আর রাষ্ট্র, সরকার ও শাসকবর্গের নিকট তোমাদের যাহা পাওনা তাহা পাইবার জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করিবে। তিনি তাহাদের অন্তর তোমাদের প্রতি সদয় করিয়া দিবেন। কিংবা তোমাদিগকে অন্য প্রতিদান দিবেন। কিন্তু কোন অবস্থাতেই দাবী আদায়ের নামে বিদ্রোহ ও গোলযোগ করা জায়েয হইবে না। কেননা ইহাতে কেন্দ্রীয় শক্তি বিনষ্ট হইবে এবং উম্মত বহুধাবিভক্ত হইয়া দুর্বলতার শিকার হইবে। তখন শত্রুর মুকাবেলায় পর্যুদস্ত হওয়া ছাড়া উপায় থাকিবে না।

বস্তুতঃ যতদিন ইসলামী উম্মাহ একক কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে ছিল ততদিন যাবতীয় দোষ দুর্বলতা সত্ত্বেও বিশ্বে ইসলামী উম্মাহর প্রভাব ছিল। পক্ষান্তরে যখন হইতে কেন্দ্রচ্যুতি শুরু হইল এবং শাসকবর্গের শোষণের প্রতিবাদে অধিকার আদায়ের নামে আঞ্চলিক বিদ্রোহ শুরু হইল তখন হইতেই আমাদের ভূখণ্ড ও আজাদি শত্রুর হাতে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

মুসলিম উম্মাহর ধুরন্ধর শত্রুরাও উম্মাহর মাঝে আঞ্চলিক ও ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার সর্বনাশা চিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটাইয়া ঐক্যবদ্ধ বিশাল ইসলামী জাহানকে টুকরা টুকরা করিয়াছে। এমনকি অভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকারী আরব জাহানও আজ ২১টি রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া ক্ষুদ্র ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈলের হাতে নাজেহাল হইতেছে। উম্মতের শক্তি ও দুর্বলতার এই নিগূঢ় রহস্যের প্রতিই ইংগিত করা হইয়াছে আলোচ্য হাদীছে।

শাসক ও শাসিতের সম্পর্কের মাঝে দুইটি জিনিস রহিয়াছে। দায়িত্ব পালন ও অধিকার আদায়। ইসলাম দায়িত্ব পালনের প্রতিই অধিক জোর দিয়াছে। পক্ষান্তরে বর্তমান সভ্যজগতের রাজনীতির মূল কথা হইল অধিকার আদায়। উভয় দৃষ্টিকোণের এই পার্থক্যের ফলাফল যাহা হইবার কথা আজ তাহাই হইতেছে।

৫৪। প্রশাসনিক দায়িত্ব চাহিবার বিষয় নহে

وَعَنْ اَبِيْ يَحْيٰى اُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَا تَسْتَعْمِلُنِيْ كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا فَقَالَ: «اِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِيْ اَثَرَةً، فَاصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوْنِيْ عَلَى الْحَوْضِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

«وَاُسَيْدٌ» بِضَمِّ الْهَمْزَةِ. «وَحُضَيْرٌ»: بِحَاءٍ مُهْمَلَةٍ مَضْمُوْمَةٍ وَضَادٍ مُعْجَمَةٍ مَفْتُوْحَةٍ، وَاللّٰهُ اَعْلَمُ.

হযরত ওসায়দ বিন হোযায়র (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক আনছারী ছাহাবী (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক অমুককে আপনি যেমন প্রশাসনিক দায়িত্ব প্রদান করেন আমাদিগকে কেন তাহা করেন না? তিনি বলিলেন, আমার মৃত্যুর পরে অচিরেই তোমরা অন্যায় অগ্রাধিকার দেখিতে পাইবে। তখন ধৈর্য ধারণ করিও, আমার সংগে হাউযে কাওছারে মিলিত হওয়া পর্যন্ত। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

(**অন্যায় অগ্রাধিকার দেখিতে পাইবে।**) পদ ও দায়িত্ব লাভের আবেদনের উত্তরে এই কথা বলিবার অর্থ সম্ভবতঃ এই যে, শাসন ক্ষমতার স্বভাবই হইল অন্যের হক নষ্ট করা। তবে আল্লাহ পাক যাহাকে রক্ষা করেন তাহার কথা ভিন্ন। সুতরাং ইহা চাহিয়া লইবার বিষয় নহে।

এইখানে এই ইংগিতও পাওয়া যায় যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াফাতের পর খেলাফত আনছারদের হাতে আসিবে না।

(**হাউযে কাওছারে মিলিত হওয়া পর্যন্ত**) হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে আমাদের সামনে উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ তাঁহার মাঝে তন্দ্রা অথবা এক প্রকার অচেতনতার ভাব দেখা দিল। অতঃপর তিনি হাসিমুখে মাথা উঠাইলেন। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার হাসির কারণ কি? তিনি বলিলেন, এই মুহূর্তে আমার উপর একটি সূরা অবতীর্ণ হইয়াছে। অতঃপর তিনি বিসমিল্লাহসহ সূরা কাওছার তিলাওয়াত করিলেন এবং বলিলেন, তোমরা জান কাওছার কি? আমরা বলিলাম, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বলিলেন, ইহা জান্নাতের একটি নহর। আমার প্রতিপালক আমাকে ইহা দান করিবেন বলিয়া ওয়াদা করিয়াছেন। ইহাতে অজস্র কল্যাণ রহিয়াছে। কেয়ামতের দিন আমার উম্মত পানি পান করিবার জন্য এই হাউজের নিকট গমন করিবে। ইহার পানি পান করিবার পাত্রের সংখ্যা আকাশের তারকার সম পরিমাণ হইবে।

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত অন্য হাদীছে আছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, মেরাজের রাত্রে আমি জান্নাতে প্রবেশ করিলাম। দেখি, আমি একটি নহরের সম্মুখে, যাহার দুই পার্শ্বে মুক্তার অসংখ্য তাবু। যে যমিনের উপর দিয়া পানি প্রবাহিত হইতেছে আমি তাহা স্পর্শ করিয়া দেখিলাম যে, উহা..... মিশক। আমি জিবরীলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে জিবরীল ইহা কি? তিনি বলিলেন, ইহা কাওছার যাহা আল্লাহ পাক আপনাকে দান করিয়াছেন। অন্য হাদীছে আছে যে, উহার দৈর্ঘ ও প্রস্থ মাশরিক মাগরিবের দূরত্বের ন্যায়। যে উহা হইতে পানি পান করিবে সে কখনো পিপাসার্ত হইবে না এবং যে উহা হইতে অযু করিবে সে কখনো মলিন হইবে না। যে আমার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি লংঘন করিবে কিংবা যে আমার আহলে বাইতকে হত্যা করিবে সে উহা হইতে পান করিতে পারিবে না।

অন্য হাদীছে আছে যে, উহার পানি দুধের চাইতে সাদা এবং মধুর চাইতে মিষ্ট এবং উহার গভীরতা হইল সত্তর হাজার ফরসখ। উহার উভয় পার্শ্বে রহিয়াছে মুক্তা, ইয়াকুত ও যাবরজাদ পাথর। আল্লাহ তা'আলা সকল নবী রাসূলের মাঝে মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যই ইহা খাছ করিয়াছেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, যে কেহ তাহার দুই কানে আংগুল রাখিবে সে ঐ নহরের

পানির ছল ছল শব্দ শুনিতে পাইবে।

তাঁহার কথার অর্থ ইহা নহে যে, কানের আওয়াজ হুবহু ঐ নহরেরেই আওয়াজ বরং এই নহরের অনুরূপ আওয়াজ। অনেকের মতে কাওছার হইল হাশরের মাঠের একটি হাওজ বিশেষ যাহা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করা হইবে। বিশুদ্ধ মতে উহা পোলছিরাতের পরে হইবে। উভয় বর্ণনার মাঝে সমন্বয় হইবে এইভাবে যে, মূল নহরটি জান্নাতে অবস্থিত। হাশরের মাঠে উহা হইতেই একটি হাউজ টানিয়া আনা হইবে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার উম্মতকে হাউজের পারে নিজ হাতে পানি পান করাইবেন। ছাহাবা কেরামকে তো তিনি সরাসরি চিনিবেন। পক্ষান্তরে পরবর্তী উম্মতকে চিনিবেন তাহাদের অযুর অংগগুলির নূর দেখিয়া।

হাদীছ শরীফে আছে যে, একদল লোক হাউজে কাওছারের দিকে যাইতে থাকিবে। আর ফিরিশতাগণ তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলিবেন যে, ইহারা তো আমার উম্মত। তখন তাহাকে বলা হইবে যে, ইহারা আপনার পরে বিভিন্ন বিদ'আত সৃষ্টি করিয়াছে।

হে আল্লাহ! মেহেরবানী করিয়া আমাদের ন্যায় অধম উম্মতিদিগকেও তোমার পেয়ারা হাবীবের পবিত্র হাতে হাউজে কাওছারের পবিত্র পানি নছীব করিও। আমীন।

৫৫। শত্রুর মুকাবেলায় অবিচল ধৈর্য

وَعَنْ اَبِيْ اِبْرَاهِيْمَ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِيْ اَوْفٰى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِيْ بَعْضِ اَيَّامِهِ الَّتِيْ لَقِيَ فِيْهَا الْعَدُوَّ، اِنْتَظَرَ حَتّٰى اِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِيْهِمْ فَقَالَ: «يَا اَيُّهَا النَّاسُ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَاَسْاَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ، فَاِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا، وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ» ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الْاَحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١) وَبِاللهِ التَّوْفِيْقِ.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক যুদ্ধের দিন দুপর পর্যন্ত শত্রুর অপেক্ষা করিলেন। যখন সূর্য গড়াইয়া গেল তখন তিনি ছাহাবা কেরামের মাঝে দাঁড়াইয়া বলিলেন, লোক সকল! শত্রুর মুকাবেলার আকাঙ্ক্ষা করিও না। বরং আল্লাহর নিকট নিরাপদতা প্রার্থনা কর। তবে যদি শত্রুর সহিত মুকাবেলা হইয়া যায় তখন অবিচল ধৈর্যের পরিচয় দিও এবং মনে রাখিও যে, জান্নাত হইল তরবারির ছায়াতলে।

অতঃপর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন,

اللهم منزل الكتاب، و مجرى السحاب، و هازم الاحزاب، اهزمهم و انصرنا عليهم *

কিতাব অবতরণকারী এবং মেঘ পরিচালনাকারী এবং সকল বাহিনীকে পরাজিতকারী হে আল্লাহ! শত্রু বাহিনীকে পরাজিত করুন এবং তাহাদের বিরুদ্ধে আমাদিগকে সাহায্য করুন। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

আল্লাহই তাওফীক দান করেন।

ফায়দা ঃ

(আল্লাহর নিকট নিরাপদতা প্রার্থনা কর।) নিরাপদতা বলিতে দেহের ও আত্মার এবং দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় বিষয়ে নিরাপদতা উদ্দেশ্য।

শত্রুর মুকাবেলার আকাঙক্ষা করা মূলতঃ নিরাপদতার পরিপন্থী। কেননা যুদ্ধ ও লড়াইয়ের ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের সুন্নত ও বিধান এই যে, তাহাতে জয় পরাজয় উভয়েরই সম্ভাবনা রাখা হইয়াছে। যেমন এই হাদীছেরই অন্য এক বর্ণনায় আসিয়াছে–

فانهم ينصرون كما تنصرون *

কেননা তাহারাও জয়লাভ করিবে যেমন তোমরা জয়লাভ করিয়া থাক।

হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) বলিতেন–

ان اعافى فاشكر احب الى من ان ابتلى فاصبر *

নিরাপদ থাকিয়া আল্লাহর শোকর আদায় করা আমার নিকট পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়া ছবর করিবার চাইতে অধিক প্রিয়।

শত্রুর মুকাবেলার আকাঙক্ষা করিতে নিষেধ করিবার কারণ হইল, উম্মতের প্রতি তাঁহার অপরিসীম মমতা এবং উম্মতের জান-মালের হিফাযতের চিন্তা। যেমন এক বর্ণনায় আসিয়াছে– فتضربوا رقابهم و يضربوا رقابكم 'তখন তোমরা তাহাদিগকে হত্যা করিবে আর তাহারা তোমাদিগকে হত্যা করিবে।'

আরেকটি কারণ এই যে, ইহাতে নিজেদের শক্তির প্রতি ভরসা এবং শত্রুর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পায়, যাহা সতর্কতা ও বিচক্ষণতার পরিপন্থী।

(যখন শত্রুর সম্মুখীন হইবে) তখন মনে করিতে হইবে যে, আল্লাহ পাক তোমাদের ঈমান ও ধৈর্যের পরীক্ষা করিতে চাহেন। সুতরাং তখন অবিচলভাবে লড়াই করিও। কেননা احدى الحسنيين اما النصر و اما الشهادة (দুই উত্তম বস্তুর যে কোন একটি লাভ করা মুমিনের জন্য সুনিশ্চিত; বিজয় কিংবা শাহাদাত।)

(ছবর করিও) কেননা সাহায্য করিবার মাধ্যমে আল্লাহ ছবরকারীদের সংগে থাকিবেন বলিয়া ওয়াদা রহিয়াছে এবং আল্লাহর সৈনিকদের বিজয়েরও ওয়াদা রহিয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে

وَ اِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ *

আমার সৈনিকরাই হইবে বিজয়ী।

(সকল বাহিনীকে পরাজিতকারী) পঞ্চম হিজরীতে আরবের সকল মুশরিক গোত্র কোরায়শের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হইয়া মদীনা অবরোধ করিয়াছিল। কিন্তু আল্লাহ পাক মুশরিকদের সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে তাঁহার রাসূলকে বিজয় দান করিয়াছিলেন। এইখানে সেইদিকে ইংগিত করা হইয়াছে।

এইখানে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরীয়ত ও হাকীকত উভয়ের উপর আমল করিয়াছেন। শরীয়তের বিধান হইল শত্রুর বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তি সঞ্চয় করা এবং যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং শত্রুর মুকাবেলায় অবিচল থাকা আর হাকীকত হইল একমাত্র আল্লাহর সাহায্যের উপর ভরসা করা এবং তাঁহার সংগেই সম্পর্ক জুড়িয়া রাখা। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার যাবতীয় কাজে এইভাবেই হাকীকত ও শরীয়তের উপর যুগপৎ আমল করিতেন।

জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইহাই হইল মুসলমানের কর্তব্য যে, প্রয়োজনীয় উপায় উপকরণের যথাসাধ্য আয়োজন করিবে। কিন্তু আসল সম্পর্ক রাখিবে আল্লাহর সহিত এবং তাঁহার সাহায্যের উপরই পূর্ণ ভরসা করিবে।

অধ্যায় – ৪

সত্যবাদিতা

আল্লামা ইবনে আবী শরীফ (রহঃ) বলেন, صدق (বা সত্যবাদিতা) শব্দটি সুফীগণ ভিতর-বাহির এক হওয়া এবং প্রকাশ্য ও গোপন উভয় অবস্থা বিশুদ্ধ হওয়া অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। অর্থাৎ বান্দার অবস্থা যেন তাহার আমলকে এবং তাহার আমল যেন তাহার অবস্থাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন না করে। ছুফিয়া কেরামের মতে ইখলাছ বিষয়টি আম ও ব্যাপক এবং সত্যবাদিতা বিষয়টি খাছ ও বিশিষ্ট। অর্থাৎ সত্যবাদীমাত্রই মুখলিছ। কিন্তু মুখলিছমাত্রই সত্যবাদী নহে।

শায়খ যাকারিয়া (রহঃ) বলেন, হযরত জোনায়দ বোগদাদী (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, ইখলাছ ও সত্যবাদিতা কি ভিন্ন না অভিন্ন? তিনি বলিলেন, উভয়ের মাঝে পার্থক্য আছে। সত্যবাদিতা হইল মূল আর ইখলাছ হইল শাখা। সত্যবাদিতা সকল আমলের গোড়া। আর আমল শুরু করিবার পরই ইখলাছের প্রশ্ন আসে। তবে কোন আমল ইখলাছ ও সত্যবাদিতা ছাড়া কবুল হইবে না।

আয়াতসমূহ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ كُوْنُوا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ *

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং (সৎ ও) সত্যবাদীগণের সংগ গ্রহণ কর।

আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন–

الصّٰدِقِيْنَ وَ الصّٰدِقٰتِ *

সত্যবাদীগণ ও সত্যবাদিণীগণ

আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন–

فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ *

তাহারা যদি আল্লাহর সহিত সত্যবাদিতা বজায় রাখিত তবে উহা তাহাদের জন্য ভাল হইত।

ফায়দা ঃ

প্রথম আয়াতে মুমিনগণকে অন্তরে আল্লাহর ভয় জাগ্রত করিবার কথা বলা হইয়াছে। কেননা যাহার অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকিবে তাহার পক্ষে আল্লাহর নাফরমানি বর্জন করা এবং ফরমাবরদারি করা, এক কথায় দ্বীনের উপর চলা অতি সহজ হইবে।

তাকওয়াহীন অন্তর হইল শয়তানের আখড়া। এমন অন্তর সর্বদা শয়তানের কব্‌জায় থাকে। সুতরাং তাকওয়া অর্জন করাই হইল মুমিনের জিন্দেগীর আসল উদ্দেশ্য।

কিন্তু এই তাকওয়া অর্জন করিবার উপায় কি? কোন পথে ইহা হাছিল হইবে? ইহার প্রতি ইংগিত করা হইয়াছে আয়াতের এই পরবর্তী অংশে-كُونُوا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ (সত্যবাদীগণের সাহচর্যে থাক।) অর্থাৎ সত্যবাদীগণের সাহচর্যে থাকিয়া তাহাদের অনুরূপ আমল করিলে তোমাদের অন্তরেও তাহাদের অন্তরের অনুরূপ তাকওয়া হাছিল হইবে।

সুতরাং আলোচ্য আয়াত দ্বারা আল্লাহওয়ালাদের ছোহবতে থাকিয়া আত্মসংশোধনের অপরিহার্যতা প্রমাণিত হইতেছে। আলিমগণ লিখিয়াছেন যে, এইখানে আলিম বা ছালিহ (সৎলোক) না বলিয়া صدقين বলিবার মাধ্যমে 'আলিম ও ছালিহ'-এর পরিচয় তুলিয়া ধরা হইয়াছে। অর্থাৎ প্রকৃত আলিম ও প্রকত নেককার তাহারাই যাহারা সত্যবাদী।

صدقين বা সত্যবাদী-এর কি অর্থ? কেহ কেহ বলেন, ইহারা ঐ লোক যাহাদের ভিতর ও বাহির এবং প্রকাশ্য ও গোপন উভয় অবস্থা শরীয়ত মুতাবিক। কাহারো কাহারো মতে ইহারা ঐ লোক যাহারা রূহ জগতে কৃত ওয়াদা ভংগ করে নাই। রূহ জগতে আল্লাহ পাক সকল রূহকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, الست بربكم (আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নহি?) ইহার উত্তরে তাহারা بلى (অবশ্যই (অবশ্যই আপনি আমাদের প্রতিপালক) বলিয়া আল্লাহর প্রতিপালকত্বের স্বীকৃতি দান করিয়াছিল। দুনিয়াতে আসিয়া যাহারা এই ওয়াদার উপর পূর্ণ অবিচল রহিয়াছেন তাহারাই হইলেন صدقين বা সত্যবাদী।

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহর পক্ষ হইতে মাগফিরাত ও মহান প্রতিদান লাভকারীদের কতিপয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি গুণ হইল সত্যবাদিতা। আলোচ্য আয়াত প্রসংগে কতিপয় মুফাসসির বলেন, যদিও কোরআনের সম্বোধন নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু সাধারণভাবে কোরআনের প্রত্যক্ষ নির্দেশ হইয়াছে পুরুষদের প্রতি। আর নারী জাতিকে প্ররোক্ষভাবে ইহার অন্তর্ভুক্ত রাখা হইয়াছে। ইহা দ্বারা এই দিকে ইংগিত করা উদ্দেশ্য যে, নারীদের সকল বিষয় প্রচ্ছন্ন ও গোপনীয় এবং তাহারা দুনিয়ার জিন্দেগীতে পুরুষ জাতির অধীনস্থ। ইহার মাঝেই তাহাদের মর্যাদা নিহিত।

কিন্তু স্ত্রীছাহাবীগণ প্রতিনিধি আকারে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে আসিয়া অনুযোগ করিলেন যে, আল্লাহ পাক কোরআনের সর্বত্র পুরুষদের কথাই শুধু উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহাদিগকেই শুধু সম্বোধন করিয়াছেন। ইহা দ্বারা তো বুঝা যায় যে, আমাদের মাঝে কোনই কল্যাণ নাই। এই অনুযোগের প্রেক্ষিতে স্ত্রীজাতিকে সান্ত্বনা প্রদানের জন্য

আলোচ্য আয়াত নাযিল হইয়াছে। এইখানে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের কথা সমানভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্ পাকের নিকট মর্যাদা লাভের মাপকাঠি হইল সত্যবাদিতাসহ বিভিন্ন নেক আমল। এই ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মাঝে কোন পার্থক্য নাই।

তৃতীয় আয়াতে আল্লাহর সহিত সত্যবাদিতা বজায় রাখিবার কথা বলা হইয়াছে। ইহার অর্থ তাঁহার প্রতি ঈমান আনয়ন করা এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে নেক আমল করিয়া যাওয়া।

হাদীছসমূহ

৫৬। সত্যবাদিতা হইল নেক কাজের পথ প্রদর্শক

فَالْأَوَّلُ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِيْ إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيْقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِيْ إِلَى الْفُجُوْرِ، وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِيْ إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٢).

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, সত্যবাদিতা নেককাজের দিকে পথ প্রদর্শন করে। আর নেক কাজ জান্নাতের দিকে পথ প্রদর্শন করে। আর মানুষ সত্য বলিতে থাকে; এমন কি (একসময়) সে আল্লাহর নিকট সিদ্দীক (বা মহাসত্যবাদী) বলিয়া গণ্য হয়।

পক্ষান্তরে মিথ্যাবাদিতা পাপাচারের দিকে পথ প্রদর্শন করে। আর পাপাচার জাহান্নামের দিকে পথ প্রদর্শন করে। আর মানুষ মিথ্যা বলিতে থাকে; এমন কি (এক সময়) সে আল্লাহর নিকট মহামিথ্যাবাদী বলিয়া গণ্য হয়। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

(ছিদ্দীক বলিয়া গণ্য হয়) অর্থাৎ ছিদ্দীকীনদের মর্তবায় পৌঁছিয়া যায় এবং তাহাদের ফযীলত ও ছাওয়াব লাভ করে। কোরআন শরীফে ইরশাদ হইয়াছে–

مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَاءِ *

ইহা দ্বারা বোঝা যায় যে, নবীগণের পরেই ছিদ্দীকীনদের মর্তবা। ছিদ্দীক বলিয়া গণ্য হইবার অর্থ তাঁহাদের সম্পর্কে মানুষের অন্তরে এই কথা ঢালিয়া দেওয়া হয়। ফলে মানুষ তাহাদিগকে ভালবাসিতে শুরু করে এবং ছিদ্দীক বলিয়া গণ্য করে। আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) বলেন, আল্লাহর প্রতি যাহার ঈমান ও বিশ্বাস রহিয়াছে তাহার কর্তব্য হইল কথায় সত্যবাদী হওয়া এবং আমলের ক্ষেত্রে মুখলিছ হওয়া এবং যাবতীয় আচরণে পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করা অর্থাৎ শরীয়তের অনুসারী হওয়া। যিনি ইহা করিবেন তিনি পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হইবেন এবং গাফফারের মাগফিরাত ও সন্তুষ্টি লাভ করিবেন।

(মহা মিথ্যাবাদী বলিয়া গণ্য হয়) অর্থাৎ আল্লাহ্ ফিরিশতাগণের মাধ্যমে দুনিয়ার মানব বসতির মাঝে তাহাকে মহামিথ্যাবাদী বলিয়া প্রচার করিয়া দেন। ফলে মানুষের অন্তরে তাহার প্রতি শত্রুতা ও অবিশ্বাস সৃষ্টি হইয়া যায়।

কোন কোন বর্ণনায় হাদীছটি এইভাবে শুরু হইয়াছে عليكم بالصدق (তোমরা সত্যবাদিতা অবলম্বন কর) তদ্রূপ মিথ্যাবাদিতা প্রসংগের শুরুতে রহিয়াছে এইভাবে। و اياكم و الكذب (তোমরা মিথ্যাবাদিতা পরিহার করিয়া চল।)

৫৭। সত্যবাদিতায় স্বস্তি

الثَّانِي : عَنْ أَبِيْ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ : «دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ؛ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِيْنَةٌ، وَالْكِذْبَ رِيْبَةٌ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ(٣) وَقَالَ: حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.

قَوْلُهُ: «يَرِيْبُكَ» هُوَ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّهَا؛ وَمَعْنَاهُ: اتْرُكْ مَا تَشُكُّ فِيْ حِلِّهِ، وَاعْدِلْ إِلَى مَا لَا تَشُكُّ فِيْهِ.

আবু মুহম্মদ হাসান বিন আলী বিন আবু তালিব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী আমি মনে রাখিয়াছি, "যাহা মনে খটকা সৃষ্টি করে তাহা বর্জন কর এবং যাহা খটকা সৃষ্টি করে না তাহা গ্রহণ কর। কেননা সত্য স্বস্তি দান করে আর মিথ্যা সন্দেহে (ও অস্বস্তিতে) নিক্ষিপ্ত করে।" (তিরমিযি শরীফ)

(অর্থাৎ যাহা হালাল হইবার ব্যাপারে তোমার মনে সন্দেহ দেখা দেয় তাহা বর্জন কর আর যাহা হালাল হইবার ব্যাপারে তুমি নিঃসন্দেহ তাহা গ্রহণ কর।)

ফায়দা ঃ

যে সমস্ত বিষয় হারাম হইবার ব্যাপারে সুস্পষ্ট প্রমাণ কোরআন হাদীছে আসিয়াছে সেইগুলি অবশ্যই বর্জনীয়। তদ্রুপ যে সমস্ত বিষয় হালাল হইবার ব্যাপারে সুস্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে তাহা অবশ্যই গ্রহণীয়। পক্ষান্তরে যে বিষয়ে সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ নাই সেই বিষয়ে মুমিনের কলবকে ফায়সালাকারী গণ্য করা হইবে। মুমিনের কলবে যদি কোন বিষয়ে খটকা সৃষ্টি হয় তবে উহা বর্জন করাই শ্রেয়। (অর্থাৎ এই আদেশ মুস্তাহাব পর্যায়ের। ওয়াজিব পর্যায়ের নহে। কেননা বিশুদ্ধতর মত অনুযায়ী সন্দেহযুক্ত বিষয় বর্জন করা ওয়াজিব নহে।)

ওলামায়ে কিরাম বলেন, মুমিনের কলবকে আল্লাহ পাক এই স্বভাব দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তাহা সত্যে স্বস্তি বোধ করে এবং মিথ্যায় অস্বস্তি বোধ করে এবং যে কোন উত্তম ও পূর্ণতার প্রতি অনুরাগ এবং যে কোন মন্দ ও দোষের প্রতি বিরাগ বোধ করে। তাই আল্লাহ্ পাক কামিল মুমিনের পবিত্র অন্তরের অনুরাগকে হালাল হইবার এবং বিরাগকে হারাম হইবার নিদর্শন সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং প্রথম ক্ষেত্রে উহা গ্রহণ করিবার আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উহা বর্জন করিবার আদেশ দিয়াছেন।

একটি দুর্বল সনদে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ছাহাবীকে বলিয়াছেন। যাহা তোমার মনে খটকা সৃষ্টি করে তাহা বর্জন কর এবং যাহা তোমার মনে খটকা সৃষ্টি করে না তাহা গ্রহণ কর। ছাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি উহা কিভাবে বুঝিব? তিনি বলিলেন, যখন কোন কিছু ইচ্ছা কর তখন বুকে হাত রাখিয়া দেখ। কেননা (মুমিনের) কলব হারামের ক্ষেত্রে অস্বস্তি বোধ করে এবং হালালের

ক্ষেত্রে স্বস্তি বোধ করে। আর পরহেযগার মুসলমান বড় গোনাহে লিপ্ত হইবার ভয়ে ছোট গোনাহ পরিহার করিয়া চলে।

তাবরানীতে এই অংশটুকুও রহিয়াছে "তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তবে পরহেযগার কে? তিনি বলিলেন, যে খটকাযুক্ত বিষয়ে বিরত থাকে।"

"সন্দেহযুক্ত বিষয় পরিহার করা ওয়াজিব নহে, মুস্তাহাব"– এই কথা দ্বারা কেহ যেন ধোকায় না পড়ে। কেননা বস্তুতঃ মুমিনের জিন্দেগীতে সন্দেহযুক্ত বিষয় পরিহার করিবার গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা যাহারা উহা পরিহার করিয়া চলে না তাহারা ধীরে ধীরে এক সময় হারামের মধ্যে লিপ্ত হইয়া যায়। মুসলিম শরীফের নিম্নোক্ত হাদীছে বিষয়টিকে উদাহরণসহ সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে–

الحلال بين و الحرام بين و بينهما شبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه و عرضه و من وقع فى الشبهات وقع فى الحرام كالراعى يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه الا و ان لكل ملك حمى الا و ان حمى الله محارمه ×

(শরীয়তে) হালাল ও হারাম সুস্পষ্ট রূপে বর্ণিত হইয়াছে। আর উভয়ের মাঝে কিছু সন্দেহযুক্ত বিষয় রহিয়াছে। (অর্থাৎ উহা হালাল না হারাম তাহা পরিষ্কার নয়।) ফলে বহু লোক তাহা বুঝিতে পারে না। (আলিমগণ ইজতিহাদের মাধ্যমে বুঝিতে পারেন।) সুতরাং যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বিষয়গুলি পরিহার করিল সে নিজের দ্বীন ও ইজ্জতকে রক্ষা করিল। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বিষয় গ্রহণ করিল সে হারামে লিপ্ত হইয়া গেল। ঐ রাখালের ন্যায় যে (বাদশাহর) সংরক্ষিত এলাকার নিকটে (উট) চরায়। সে (অসাবধানতাবশতঃ) সংরক্ষিত এলাকার ভিতরে চলিয়া যাইবার সমূহ সম্ভাবনা রহিয়াছে। (ফলে সে পাকড়াও হইয়া যাইবে। তদ্রুপ যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বিষয়ে লিপ্ত হয় সে যেন হারামের নিকটে থাকে। যে কোন সময় হারামে লিপ্ত হইয়া তাহার বরবাদ হইবার ভয় আছে।) শোন! প্রত্যেক বাদশাহর কিছু সংরক্ষিত এলাকা থাকে। আল্লাহর সংরক্ষিত এলাহা হইল হারামসমূহ।

(কেননা সত্য স্বস্তি দান করে।) এই অংশটুকু অধ্যায় শিরোনামের সংগে সংযুক্ত। এখানে সত্য দ্বারা উদ্দেশ্য, যাহা শরীয়তসম্মত ও হালাল। পক্ষান্তরে মিথ্যা দ্বারা উদ্দেশ্য, যাহা শরীয়ত পরিপন্থী ও হারাম। মুমিনের হৃদয় আল্লাহর নূরে পূর্ণ থাকে। তাই বলা হইয়াছে اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله। মুমিনের অন্তর্দৃষ্টিকে ভয় করিও। কেননা তিনি আল্লাহর নূর দ্বারা দেখিয়া থাকেন। সুতরাং তাহার সামনে কোন বিষয় উপস্থিত হইলে তাহার অন্তরই তাহাকে সতর্ক করিয়া দেয় যে, ইহা ভাল কি মন্দ। যদিও প্রকৃত বিষয় তাহার জানা না থাকে।

কোন কোন আল্লাহওয়ালা সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, খাবার মুখে দিয়াই তিনি ফেলিয়া দিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, মনে হয় ইহা হারাম মাল দ্বারা হাছিল করা হইয়াছে।

৫৮। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা

الثَّالِثُ: عَنْ اَبِيْ سُفْيَانَ صَخْرِ بْنِ حَرْبٍ، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، فِيْ حَدِيْثِهِ الطَّوِيْلِ فِيْ قِصَّةِ هِرَقْلَ، قَالَ هِرَقْلُ: فَمَاذَا يَاْمُرُكُمْ - يَعْنِيْ النَّبِيَّ ﷺ - قَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ: قُلْتُ: يَقُوْلُ: «اعْبُدُوْا اللّٰهَ وَحْدَهُ لَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا، وَاتْرُكُوْا مَا يَقُوْلُ اٰبَاؤُكُمْ(٤)، وَيَاْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، وَالصِّدْقِ، وَالْعَفَافِ، وَالصِّلَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٥).

হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) হইতে বর্ণিত, (রোম সম্রাট) হেরাক্লিয়াস-(এর সহিত তাহার কথোপকথনের বর্ণনা) প্রসংগে এক দীর্ঘ হাদীছে তিনি বলেন, হেরাক্লিয়াস জিজ্ঞাসা করিলেন, লোকটি (অর্থাৎ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাদিগকে কি নির্দেশ করেন? হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, তিনি বলেন, তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত কর। তাঁহার সহিত কোন কিছুকে শরীক করিও না এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদের ভ্রান্ত কথা (ও বিশ্বাস) বর্জন কর। আর তিনি আমাদিগকে নামায ও সত্যবাদিতা এবং চারিত্রিক শুচিতা ও আত্মীয়তারক্ষার আদেশ করেন।

(বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

ষষ্ঠ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন শাসক ও সম্রাটের নামে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াতনামা পাঠাইয়াছিলেন। রোমসম্রাট হেরাক্লিয়াসের নামেও একটি পত্র প্রেরিত হইয়াছিল। রোমসম্রাট পত্র পাইয়া 'আরবের নবী' সম্পর্কে জানিবার জন্য অধীনস্থ রাজ্য সিরিয়ায় কোরায়শী লোকের সন্ধান করিলেন। হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) তখন এক বাণিজ্য কাফেলাসহ সিরিয়ায় অবস্থান করিতেছিলেন। কাফেলায় তিনিই ছিলেন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটতম। হেরাক্লিয়াস তাহাকে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করিয়াছিলেন। হাদীছের কিতাবে ইহা 'হাদীছে হিরকল' নামে খ্যাত।

হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) ঐ সময় মুশরিক থাকা সত্ত্বেও কোন প্রশ্নের জওয়াবে মিথ্যার আশ্রয় নেন নাই। তিনি নিজে বলেন, এক প্রশ্নের জওয়াবে মিথ্যা বলিবার ইচ্ছা জাগিয়াছিল। কিন্তু ভাবিলাম, আরবের লোকেরা পরে লজ্জা দিবে যে, আবু সুফিয়ান কোরায়শের নেতা হইয়াও মিথ্যা বলিয়াছেন। তাই মিথ্যা বলিবার ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া যাহা সত্য তাহাই বলিয়াছিলাম।

আফসোস, আরবের মুশরিকরা পর্যন্ত এমন সত্যবাদী ছিল এবং মিথ্যা বলিতে এমন লজ্জাবোধ করিত। কিন্তু আজ আমাদের মুসলমানদের কি অবস্থা!

৫৯। সত্য মনে দু'আ করিলে কবুল হয়

الرَّابِعُ: عَنْ اَبِيْ ثَابِتٍ، وَقِيْلَ: اَبِيْ سَعِيْدٍ، وَقِيْلَ: اَبِيْ الْوَلِيْدِ، سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، وَهُوَ بَدْرِيٌّ، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِيَّ، ﷺ، قَالَ: «مَنْ سَاَلَ اللّٰهَ، تَعَالٰى، الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللّٰهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَاِنْ مَاتَ عَلٰى فِرَاشِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

বদরী ছাহাবী হযরত সাহল বিন হোনায়ফ (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সত্য মনে আল্লাহর নিকট শাহাদাত প্রার্থনা করে আল্লাহ্ তাহাকে (তাহার নিয়তের বিশুদ্ধতার বরকতে) শহীদগণের দরজায় পৌঁছাইয়া দেন। যদিও সে বিছানায় পড়িয়া মারা যায়। (মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

এই হাদীছ প্রমাণ করে যে, নিয়তের সত্যতা উদ্দেশ্য লাভের উপায় এবং সত্য মনে নিয়ত করিবার পর আমলের তাওফিক না হইলেও উহার ছাওয়াব পাওয়া যায়।

যেমন ইতিপূর্বে এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

ان بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا و لا قطعتم واديا الا كانوا معكم، حبسهم العذر *

মদীনায় এমন কিছু লোক রহিয়া গিয়াছে যে, তোমরা যখনই কোন পথ চলিয়াছ, কিংবা কোন উপত্যকা অতিক্রম করিয়াছ তাহারা তোমাদের সংগে (শরীক) ছিল। ওযর তাহাদিগকে আটকাইয়া রাখিয়াছে।

অর্থাৎ তোমাদের সংগে জিহাদে শরীক হইবার নিয়ত তাহাদের ছিল কিন্তু ওযরের কারণে আমলের তাওফিক হয় নাই।

ইহাও বুঝা যায় যে, আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হইবার আকাঙ্ক্ষা ও দু'আ করা মুস্তাহাব। তাই হযরত ওমর (রাঃ) দু'আ করিতেন–

اللهم ارزقنى الشهادة فى سبيلك و الموت فى بلد رسولك *

হে আল্লাহ! আমাকে তোমার পথে শাহাদাত দান কর এবং তোমার রাসূলের শহরে মৃত্যু দান কর।

আসুন আমরাও আল্লাহর দরবারে সত্যমনে এই দু'আ করি। ইনশাআল্লাহ! হয় তিনি আমাদিগকে উক্ত মহান নেয়ামত দান করিবেন কিংবা উহার ছাওয়াব ও মর্তবা দান করিবেন।

৬০। সামান্য মিথ্যা সমগ্র সত্যকে বরবাদ করিয়া দেয়

اَلْخَامِسُ: عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لَا يَتْبَعْنِيْ رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَاَةٍ وَهُوَ يُرِيْدُ اَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا، وَلَا اَحَدٌ بَنٰى بُيُوْتًا لَمْ يَرْفَعْ سُقُوْفَهَا، وَلَا اَحَدٌ اشْتَرٰى غَنَمًا اَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ اَوْلَادَهَا. فَغَزَا فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ صَلَاةَ الْعَصْرِ اَوْ قَرِيْبًا مِنْ ذٰلِكَ، فَقَالَ لِلشَّمْسِ: اِنَّكِ مَاْمُوْرَةٌ وَاَنَا مَاْمُوْرٌ، اَللّٰهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيْنَا، فَحُبِسَتْ حَتّٰى فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ، فَجَمَعَ الْغَنَائِمَ، فَجَاءَتْ ـ يَعْنِي النَّارَ ـ لِتَاْكُلَهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا، فَقَالَ: اِنَّ فِيْكُمْ غُلُوْلًا، فَلْيُبَايِعْنِيْ مِنْ كُلِّ قَبِيْلَةٍ رَجُلٌ، فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ فَقَالَ: فِيْكُمُ الْغُلُوْلُ، فَلْيُبَايِعْنِيْ قَبِيْلَتُكَ، فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ اَوْ ثَلَاثَةٍ بِيَدِهِ فَقَالَ: فِيْكُمُ الْغُلُوْلُ. فَجَاؤُوْا بِرَاْسٍ

مِثْلِ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ، فَوَضَعَهَا فَجَاءَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهَا، فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِأَحَدٍ قَبْلَنَا، ثُمَّ أَحَلَّ اللهُ لَنَا الْغَنَائِمَ لَمَّا رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَأَحَلَّهَا لَنَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

«اَلْخَلِفَاتُ» بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ اللَّامِ : جَمْعُ خَلِفَةٍ، وَهِيَ النَّاقَةُ الْحَامِلُ.

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, বিগত নবীগণের মধ্য হইতে কোন এক নবী (সকলের প্রতি দরূদ ও সালাম) একবার যুদ্ধযাত্রা করিলেন। আপন কাওমকে তিনি বলিলেন, এমন কোন লোক যেন আমার সংগে যাত্রা না করে যে বিবাহ করিয়াছে অথচ এখনও বাসর যাপন করে নাই। কিংবা এমন কোন লোক, যে বাড়ীঘর বানাইয়াছে কিন্তু এখনও ছাদ দেয় নাই। কিংবা এমন কোন লোক, যে মেষপাল বা উটনীর পাল খরিদ করিয়াছে আর এখন উহাদের বাচ্চা প্রসবের অপেক্ষা করিতেছে।

অতঃপর তিনি অভিযানে বাহির হইলেন এবং আছরের সময় কিংবা উহার কিছু পূর্বে (উদ্দিষ্ট) বস্তির নিকটবর্তী হইলেন এবং সূর্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তুমিও অস্ত যাইবার জন্য আদিষ্ট। আমিও (নামায পড়িবার জন্য কিংবা সূর্যাস্তের পূর্বে যুদ্ধ করিবার জন্য) আদিষ্ট। (অতঃপর বলিলেন) হে আল্লাহ্! সূর্যকে আমাদের জন্য থামাইয়া রাখুন। ফলে সূর্য থামিয়া গেল এবং আল্লাহ তাঁহাকে বিজয় দান করিলেন। অতঃপর তিনি গনীমতের মাল জমা করিলেন। তখন উহাকে গ্রাস করিবার জন্য আগুন আসিল। কিন্তু আগুন উহাকে স্পর্শও করিল না। তখন তিনি (আল্লাহর নবী) বলিলেন, নিঃসন্দেহে তোমাদের মাঝে আত্মসাতের ঘটনা ঘটিয়াছে। সুতরাং প্রত্যেক গোত্র হইতে এক ব্যক্তি আমার হাতে বাই'আত করুক। (যখন বাই'আত করা হইল) তখন এক লোকের হাত তাঁহার হাতের সহিত লাগিয়া গেল। তখন তিনি বলিলেন, তোমাদের মাঝেই আত্মসাৎ হইয়াছে। সুতরাং তোমার গোত্রের সকলেই আমার হাতে বাই'আত করুক। (যখন উক্ত গোত্রের সকলে বাই'আত করিল) তখন দুইজন বা তিনজনের হাত তাঁহার হাতের সহিত লাগিয়া গেল। তখন তিনি বলিলেন, তোমাদের মাঝেই আত্মসাৎ হইয়াছে। তখন আত্মসাৎকারী লোকটি গরুর মাথার পরিমাণ একটি স্বর্ণখণ্ড আনিয়া রাখিল। তখন আগুন আসিয়া উহা গ্রাস করিল।

আমাদের পূর্ববর্তী কোন জাতির জন্য গনীমতের মাল হালাল ছিল না। পরে আল্লাহ আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা দেখিয়া আমাদের জন্য উহা হালাল করিয়াছেন।

(বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

(কোন এক নবী) আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) বলেন, ইহা আল্লাহর নবী ইউশা ইবনে নূন (আঃ)-এর ঘটনা।

(বিবাহ করিয়াছে) আল্লাহর নবী তাঁহার কাওমকে এই ধরণের অবস্থায় তাঁহার সহযাত্রী হইতে নিষেধ করিবার কারণ ছিল এই যে, তখন তাহাদের মন বাড়ীতে পড়িয়া থাকিবে। ফলে তাহাদের জিহাদ ও শাহাদতের স্পৃহা কমিয়া যাইবে। এমন কি জিহাদের প্রতি বিতৃষ্ণা আসিয়া

যাওয়াও বিচিত্র নহে। আল্লাহর নবীর উদ্দেশ্য ছিল যে, কাওমের সকলে যেন, এই সকল কাজ হইতে ফারেগ হইয়া অন্তরে শুধু আল্লাহর চিন্তা জাগরূক রাখিয়া জিহাদে গমন করে এবং সত্যমনে শাহাদাতের আকাঙক্ষা করিয়া মহাসৌভাগ্য ও পুরস্কার লাভ করিতে পারে।

(সূর্য থামিয়া গেল।) ইহা ছিল ঐ নবীর মুজিযা। আমাদের নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যও মিরাজের ঘটনাকালে এবং খন্দক যুদ্ধের সময় সূর্য স্থির হইয়া গিয়াছিল। [১]

(আগুন স্পর্শ করিল না) পূর্ববর্তী নবীগণের যুগে গনীমতের মালের ব্যাপারে ইহাই ছিল বিধান। অর্থাৎ গনীমতের মাল জমা করিবার পর আসমান হইতে আগুন আসিয়া উহা গ্রাস করিত। তখন বুঝা যাইত যে, আল্লাহর দরবারে তাহাদের জিহাদ ও গনীমত কবুল হইয়াছে, পক্ষান্তরে আগুন ঐ গনীমতের মাল স্পর্শ না করিলে বুঝা যাইত যে, উহাতে আত্মসাতের ঘটনা ঘটিয়াছে।

(প্রত্যেক গোত্র হইতে একজন) কেননা গোটা বাহিনীর সংখ্যা প্রায় সত্তর হাজার ছিল। ফলে প্রত্যেকের আলাদা আলাদা বাই'আত গ্রহণ করা কঠিন ছিল।

৬১। মিথ্যাবাদিতা ব্যবসার বরকত নষ্ট করে

اَلسَّادِسُ: عَنْ اَبِيْ خَالِدٍ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَاِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِيْ بَيْعِهِمَا، وَاِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আবু খালিদ হাকীম বিন হিযাম (রাঃ) হইতে বর্ণিত, (তিনি ষষ্ঠ হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার আব্বা জাহেলী ও ইসলামী উভয় যুগেই নেতৃস্থানীয় ছিলেন) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, ক্রেতা ও বিক্রেতা যতক্ষণ পৃথক না হয় ততক্ষণ তাহাদের এখতিয়ার রহিয়াছে (যে কোন একজন ক্রয় বা বিক্রয় রহিত করিতে পারে। কিন্তু যখন তাহারা পৃথক হইয়া যায় অর্থাৎ কথাবার্তা পাকা হইয়া যায় তখন কেহ এককভাবে রহিত করিতে পারে না।) যদি তাহারা সত্য বলে এবং সঠিকভাবে বর্ণনা করে তবে তাহাদের ব্যবসায় বরকত দেওয়া হইবে। আর যদি গোপন করে এবং মিথ্যা বলে তবে তাহাদের ক্রয় বিক্রয়ের বরকত নষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে।

(বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

(যদি তাহারা সত্য বলে) অর্থাৎ বিক্রেতা তাহার পণ্যের দোষগুণ ও মূল্য সম্পর্কে যদি সত্য বিবরণ দান করে। তদ্রূপ ক্রেতা যদি তাহার প্রদত্ত মুদ্রার সঠিক মূল্যমান বর্ণনা করে অর্থাৎ রৌপ্য বা স্বর্ণমুদ্রা কতটা খাঁটি এবং কাগুজে মুদ্রা সচল না অচল ইত্যাদি বিষয় সঠিকভাবে বর্ণনা করে।

১। আম্বিয়া কেরামের মুজিযা অস্বীকার করা কুফুর। কেননা প্রথমতঃ কোরআন হাদীছের অকাট্য দলীল দ্বারা ইহা সুপ্রমাণিত। দ্বিতীয়তঃ মুজিযা অস্বীকার করিবার অর্থ আল্লাহর অশেষ কুদরতকে অস্বীকার করা। বস্তুতঃ বিশ্বজগত আল্লাহর সৃষ্টি। আল্লাহর নির্দেশিত নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং তাঁহার আদেশে নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়া অসম্ভব কিছু নহে।

সত্যবাদিতা ও সততার সহিত ব্যবসা করিলে আল্লাহ পাক অবশ্যই উহাতে বরকত দান করিবেন। পক্ষান্তরে মিথ্যাবাদিতা ও অসততার আশ্রয় নিলে বরকত নষ্ট হইয়া যাইবে।

বরকত হইবার বিভিন্ন ছুরত হইতে পারে। যেমন ব্যবসার প্রসার ঘটিবে এবং সম্পদের পরিমাণ বাড়িতে থাকিবে। কিংবা অল্প মুনাফা হইলেও উহা দ্বারা প্রয়োজন পুরা হইবে এবং অন্তর হইতে অভাববোধ দূর হইয়া যাইবে। কলবের ইতমিনান নছীব হইবে। দুনিয়ার পরিবর্তে আখিরাতের প্রতি মুহব্বত বাড়িবে।

পক্ষান্তরে বে-বরকতিও বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। যেমন সম্পদের পরিমাণ কমিয়া যাইবে। কিংবা মুনাফা বেশী হইলেও প্রয়োজন বাড়িয়া যাইবে উহার দ্বিগুণ। কিংবা সম্পদ যতই বেশী হউক অন্তর হইতে অভাববোধ দূর হইবে না। কলবের ইতমিনান চলিয়া যাইবে। সুখ শান্তির অসবাব জমা হইবে কিন্তু সুখ শান্তি থাকিবে না। অন্তরে দুনিয়ার মুহব্বত এমনভাবে ঢুকাইয়া দেওয়া হইবে যে, আখিরাতের কথা সম্পূর্ণ ভুলিয়া যাইবে।

বস্তুতঃ সততা ও সত্যবাদিতা যে ব্যবসায়ে বরকত লাভের শর্ত ইহা যুগ যুগ ধরিয়া প্রমাণিত সত্য। তবে বরকত নষ্ট হইবার অন্য কোন কারণ বিদ্যমান থাকিলে কিছু বলিবার নাই। কিংবা আযমায়েশ বা পরীক্ষাও হইতে পারে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে و لنبلونكم بنقص من الاموال অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করিব সামান্য পরিমাণ মালের নোকছান করিয়া ....আর ছবরকারীদিগকে সুসংবাদ দান কর।

অধ্যায় – ৫

আল্লাহ দেখিতেছেন এই ধারণা

ইহা احسان এর দ্বিতীয় স্তর। ইহসানের পরিচয় সামনের হাদীছে আসিতেছে। সুফিয়ায়ে কেরাম তাঁহাদের আত্মসংশোধনের মুজাহাদায় মুরাকাবাকে অশেষ গুরুত্ব দিয়া থাকেন। যাবতীয় মুরাকাবার মূল কথা হইতেছে আল্লাহ সর্বাবস্থায় আমাকে দেখিতেছেন এই চিন্তা অন্তরে বদ্ধমূল করা। অবশ্য আত্মোন্নতির এই স্তর একদিনেই হাছিল হইবে না এবং নিজে নিজেই হাছিল হইবে না। বরং ছাদিকীনদের ছোহবতে থাকিতে হইবে।যেমন ইরশাদ হইয়াছে–

كُونُوا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

(আর তোমরা সত্যবাদীগণের অর্থাৎ আল্লাহওয়ালাগণের ছোহবতে থাক।)

যে কোন নেক আমল করিবার সময় চিন্তা করিতে হইবে যে, আল্লাহ আমাকে দেখিতেছেন। আবার আল্লাহ না করুন যদি কখনো অন্তরে গোনাহের ইচ্ছা জাগ্রত হয় তখনও চিন্তা করিতে হইবে যে, আল্লাহ আমাকে দেখিতেছেন। এইভাবে একসময় উক্ত 'চিন্তা' আল্লাহ পাকের নৈকট্যের এমন ছত্রচ্ছায়া লাভ করিবে যে, নেক কাজে লজ্জত বোধ হইবে এবং গোনাহের কাজে কষ্টবোধ হইবে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

افضل ايمان المرء ان يعلم ان الله معه حيث كان*

বান্দার ঈমানের সর্বোত্তম অবস্থা এই যে, সে জানিবে যে, সে যেখানেই থাকুক আল্লাহ তাহাকে দেখিতেছেন।

আয়াতসমূহ

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন—

اَلَّذِيْ يَرٰكَ حِيْنَ تَقُوْمُ * وَ تَقَلُّبَكَ فِي السّٰجِدِيْنَ *

যিনি আপনাকে দেখিতেছেন যখন আপনি নামাযে দাঁড়ান এবং নামাযীগণের সহিত আপনার উঠা-বসা(ও দেখিতেছেন।)

আল্লাহ্ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন—

وَ هُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ *

তোমরা যেখানেই থাক তিনি তোমাদের সংগে রহিয়াছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন—

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَ لَا فِي السَّمَاءِ *

নিঃসন্দেহে আসমান যমীনের কোন কিছুই আল্লাহর সামনে গোপন নাই।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন—

اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ *

নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালক ওত পাতিয়া আছেন। (সময় মত পাকড়াও করিবেন।)

আল্লাহ্ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন—

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَ مَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ *

তিনি জানেন চোখের চোরা চাহনীকে এবং মনের গোপন কথাকে (এবং আল্লাহ্ সত্য ফায়সালা করেন। আর যাহারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যান্যদিগকে ডাকে তাহারা কোন ফায়সালা করিবার ক্ষমতা রাখে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সকল বিষয় শুনেন ও জানেন।)

এই বিষয়ক আয়াত সুপ্রচুর ও সুপরিচিত।

ফায়দা ঃ

(প্রথম আয়াত) পূর্ণ আয়াতটি এই—

وَ تَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ * اَلَّذِيْ يَرٰكَ حِيْنَ تَقُوْمُ * وَ تَقَلُّبَكَ فِي السّٰجِدِيْنَ * اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ *

আর (হে নবী) আপনি মহাপরাক্রমশালী দয়ালু আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করুন। যিনি আপনাকে দেখিতেছেন যখন আপনি নামাযে দাঁড়ান এবং নামাযীগণের সহিত আপনার উঠা-বসা (ও দেখিতেছেন।) নিঃসন্দেহে তিনি (সর্ববিষয়) শ্রবণকারী, (সর্ববিষয়) জ্ঞাত।

সিজদা যেহেতু নামাযের অন্যতম প্রধান রোকন সেহেতু উহা দ্বারা নামায বুঝানো হইয়াছে। তদ্রূপ রুকু দ্বারাও নামায বুঝানো হয়। যেমন, وَ ارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ (রুকুকারীদের

সহিত রুকু কর।) অর্থাৎ নামায আদায়কারীদের সহিত নামায আদায় কর।

আল্লামা ওয়াসিতি (রহঃ) বলেন, অনেকের মতে এখানে এই ইংগিত রহিয়াছে যে, বান্দা যখন নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি একাগ্র হয় তখন সংগে সংগে আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি তাহার প্রতি নিবদ্ধ হয়।

কোন কোন আলিমের মতে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তিনি পশ্চাতেও দেখিতে পাইতেন। আলোচ্য আয়াতে তাঁহার এই বৈশিষ্ট্যের প্রতিও ইংগিত হইতে পারে। তখন অর্থ এই হইবে- (আপনার পিছনে) নামায আদায়কারীগণের প্রতি আপনার দৃষ্টিদান তিনি দেখিতেছেন।

(দ্বিতীয় আয়াত) বান্দার প্রতি আল্লাহ্ পাকের এই সংগ স্থানসাপেক্ষ নহে। কেননা তাঁহার পবিত্র যাত স্থান ও কালের ক্ষুদ্রতা ও দোষ হইতে চিরপবিত্র। অর্থাৎ তোমরা যেখানেই থাক তাহার ইলম ও কুদরতের বেষ্টনের মাঝেই আছ। কোন কাল বা কোন স্থান তাঁহার অন্তরায় হইতে পারে না এবং তোমাদের কোন কিছু তাঁহার অজ্ঞাত থাকিতে পারে না।

(তৃতীয় আয়াত) হযরত জাফর (রহঃ) বলেন, যেহেতু সৃষ্টি জগতের কিছুই তাঁহার অজ্ঞাত নহে সেহেতু তুমি তোমার নিয়ত পরখ করিয়া দেখ, উহাতে যেন রিয়ার লেশমাত্র না থাকে এবং তোমার হৃদয়ে উঁকি দিয়া দেখ, সেখানে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহারও স্থান যেন না থাকে।

আসমান ও যমিন উল্লেখ করিবার কারণ এই যে, মানুষের দৃষ্টি এই দুই সৃষ্টির বাহিরে যায় না। নতুবা আসমান যমিনসহ গোটা সৃষ্টি জগতের কোন কিছুই তো তাঁহার অজ্ঞাত নহে।

আল্লামা আলুসী (রহঃ) বলেন, হযরত মূসা (আঃ)-এর অন্তরে একবার চিন্তা হইল যে, আল্লাহ্ পাক সমগ্র জগতকে রিযিক কিভাবে দান করেন! ইহা তাঁহার সন্দেহ ছিল না; উদাহরণ জানিবার কৌতুহল ছিল। আল্লাহ্ পাক তখন হযরত মূসা (আঃ)-কে আদেশ করিলেন, এই প্রস্তর খণ্ডকে লাঠি দ্বারা আঘাত কর। লাঠির আঘাতে পাথর ভাংগিয়া গেল। হযরত মূসা (আঃ) দেখিতে পাইলেন, উহার ভিতরে একটি পোকা সবুজ পাতা খাইতেছে। আর এই যিকির করিতেছে-

سبحان من يرانى و يعرف مكانى و يذكرنى و لا ينسانى *

ঐ মহান সত্তার তাসবীহ পাঠ করিতেছি যিনি আমাকে দেখেন। আমার স্থান জানেন এবং আমাকে স্মরণ করেন, কখনো ভুলিয়া যান না।

(পঞ্চম আয়াত) চোরা চাহনী অর্থ অপরের অলক্ষ্যে নর-নারীর প্রতি কাম দৃষ্টিতে এমনভাবে তাকানো যে, অন্য কেহ তাহা অনুভব করিতে পারে না। অর্থাৎ লোকচক্ষুর অন্তরালে যে সকল গোনাহ হয়, চাই উহা জাহেরী আমল হউক কিংবা বাতেনী আমল সর্ববিষয় তিনি জানেন।

হাদীছসমূহ

৬২। ইসলামের পরিচয়, ইহসানের পরিচয়, কেয়ামতের আলামত

وَاَمَّا الْاَحَادِيْثُ؛ فَالْاَوَّلُ: عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: «بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوْسٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، ذَاتَ يَوْمٍ اِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرٰى عَلَيْهِ اَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا اَحَدٌ، حَتّٰى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَاَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ اِلٰى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلٰى فَخِذَيْهِ وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اَخْبِرْنِيْ عَنِ الْاِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اَلْاِسْلَامُ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اِنِ اسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا. قَالَ: صَدَقْتَ. فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْاَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ[২]! قَالَ: فَاَخْبِرْنِيْ عَنِ الْاِيْمَانِ. قَالَ: اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَاَخْبِرْنِيْ عَنِ الْاِحْسَانِ. قَالَ: اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ؛ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. قَالَ: فَاَخْبِرْنِيْ عَنِ السَّاعَةِ. قَالَ: مَا الْمَسْؤُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. قَالَ: فَاَخْبِرْنِيْ عَنْ اَمَارَاتِهَا. قَالَ: اَنْ تَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا، وَاَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ[৩] يَتَطَاوَلُوْنَ فِيْ الْبُنْيَانِ. ثُمَّ انْطَلَقَ، فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ اَتَدْرِيْ مَنِ السَّائِلُ؟ قُلْتُ: اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ. قَالَ: فَاِنَّهُ جِبْرِيْلُ اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ اَمْرَ دِيْنِكُمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ[৪].

وَمَعْنٰى: «تَلِدُ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا» اَيْ: سَيِّدَتَهَا؛ وَمَعْنَاهُ اَنْ تَكْثُرَ السَّرَارِيْ حَتّٰى تَلِدَ الْاَمَةُ السُّرِّيَّةُ بِنْتًا لِسَيِّدِهَا، وَبِنْتُ السَّيِّدِ فِيْ مَعْنَى السَّيِّدِ، وَقِيْلَ غَيْرُ ذٰلِكَ. وَ «الْعَالَةُ»: الْفُقَرَاءُ. وَقَوْلُهُ «مَلِيًّا» اَيْ: زَمَنًا طَوِيْلًا، وَكَانَ ذٰلِكَ ثَلَاثًا.

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে বসা ছিলাম। এমন সময় অতিশুভ্র পোশাক পরিহিত এবং অতি কৃষ্ণ কেশবিশিষ্ট একজন লোক আমাদের সামনে আবির্ভূত হইলেন। তাহার শরীরে সফরের কোন চিহ্ন ছিল না এবং আমাদের মধ্যে কেহ তাহাকে চিনেও না। তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে বসিলেন এবং আপন হাঁটুদ্বয় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাঁটুদ্বয়ের সংগে লাগাইয়া দিলেন এবং আপন হস্তদ্বয় তাঁহার (পবিত্র) উরুদ্বয়ের উপর রাখিলেন এবং বলিলেন, হে মুহম্মদ! (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইসলাম অর্থ এই যে, তুমি সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল এবং নামায কায়েম করিবে এবং যাকাত আদায় করিবে এবং রমযানের রোযা রাখিবে এবং বাইতুল্লাহ শরীফে গমনের সামর্থ্য থাকিলে হজ্জ করিবে। আগন্তুক বলিলেন, আপনি সত্য বলিয়াছেন।

(হযরত ওমর রাঃ) বলেন, আমরা তাহার বিষয়ে আশ্চর্য হইলাম যে, প্রশ্নও করিতেছেন আবার সত্যায়নও করিতেছেন।

(অতঃপর) আগন্তুক বলিলেন, আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন। তিনি বলিলেন, ঈমান এই যে, তুমি আল্লাহকে বিশ্বাস করিবে এবং তাঁহার ফিরিশতাগণকে এবং তাঁহার কিতাবসমূহকে এবং তাঁহার রাসূলগণকে এবং শেষ দিবসকে। আর ভাল ও মন্দ তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করিবে। আগন্তুক বলিলেন, আপনি সত্য বলিয়াছেন। অতঃপর আগন্তুক বলিলেন, আমাকে ইহ্সান সম্পর্কে বলুন, তিনি বলিলেন, ইহ্সান এই যে, এমনভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করিবে যেন তাঁহাকে তুমি দেখিতেছ। যদি তুমি তাঁহাকে না দেখ তবে (গাফেল হইও না। কেননা) তিনি তো তোমাকে দেখিতেছেন। আগন্তুক বলিলেন, আপনি সত্য বলিয়াছেন।

(অতঃপর) আগন্তুক বলিলেন, আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে বলুন। তিনি বলিলেন, এই বিষয়ে প্রশ্নকৃত ব্যক্তি প্রশ্নকর্তার চাইতে অধিক জ্ঞাত নয়। আগন্তুক বলিলেন, তবে আমাকে কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে বলুন। তিনি বলিলেন, (কিয়ামতের আলামত) এই যে, দাসী তাহার মালিকানকে জন্ম দিবে এবং এই যে, নগ্নপদ, নগ্নদেহী, অভাবী ও রাখাল (শ্রেণীর লোক)দিগকে তুমি প্রতিযোগিতামূলকভাবে উঁচু উঁচু ভবন বানাইতে দেখিবে। অতঃপর আগন্তুক চলিয়া গেলেন। আমি দীর্ঘ (প্রায় তিনদিন) সময় অতিবাহিত করিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে ওমর! তুমি কি জান, প্রশ্নকারী কে? আমি বলিলাম, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল অধিক জানেন। তিনি বলিলেন, তিনি (হযরত জিবরীল (আঃ) তোমাদিগকে তোমাদের দ্বীন শিক্ষা দান করিতে আসিয়াছিলেন। (মুসলিম শরীফ)

দাসী তাহার মালিকানকে জন্ম দিবার অর্থ দাসী উপপত্নীর সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে এবং তাহাদের গর্ভে মনিবের প্রচুর কন্যাসন্তান জন্ম গ্রহণ করিবে। আর মনিবের কন্যা তো মনিবতুল্য।

ফায়দা ঃ

ইহা সুন্নাহ ও শরীয়তের অন্যতম মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ একটি হাদীছ। কেননা শরীয়তের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তথা ঈমান, আকীদা, আমল, ইখলাছ ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। তাই ওলামায়ে কেরাম বলিয়াছেন, যদি সুন্নাহ-এ ইহা ছাড়া অন্য কোন হাদীছ না থাকিত তবে ইহাই যথেষ্ট হইত।

যেহেতু এই হাদীছে হযরত জিবরীল (আঃ) মানববেশে আসিয়া রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দ্বীন সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করিয়াছিলেন, সেহেতু ইহা হাদীছে জিবরীল নামে সুপরিচিত। হযরত জিবরীল (আঃ)–এর আগমনের কারণ এই যে, ছাহাবা কেরাম রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অধিক প্রশ্ন করিতেন। এই প্রশ্নবাহুল্য তাঁহার অপছন্দ হওয়ায় তিনি তাহাদিগকে নিষেধ ও তিরস্কার করিলেন। ফলে ছাহাবা কেরাম ভয়ে একেবারে প্রশ্ন করাই ছাড়িয়া দিলেন। তখন আল্লাহর পক্ষ হইতে হযরত জিবরীল (আঃ) প্রেরিত হইলেন যাহাতে তিনি ছাহাবা কেরামের সম্মুখে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে তাঁহাদের প্রয়োজনীয় প্রশ্নগুলি করেন আর ছাহাবা কেরাম দ্বীনের জরুরী বিষয়গুলি জানিয়া লইতে পারেন। যেমন মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় আসিয়াছে; রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইনি জিবরীল। যেহেতু তোমরা প্রশ্ন করিতেছ না সেহেতু তিনি তোমাদিগকে শিক্ষা দান করিতে চাহিয়াছেন।

(আপন হস্তদ্বয় তাঁহার উরুদ্বয়ের উপর) দৃশ্যতঃ ইহার অর্থ এই যে, আপন হস্তদ্বয় আপন উরুদ্বয়ের উপর রাখিলেন। কেননা ইহাই হইল আদব এবং শিক্ষকের সামনে তালেবুল ইলম-এর বসিবার তরীকা। তবে অধিকাংশ আলিমের মতে হযরত জিবরীল (আঃ) আপন হস্তদ্বয় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র উরুদ্বয়ের উপর রাখিয়াছিলেন। আর এইরূপ করিয়াছিলেন এই কথা বুঝাইবার জন্য যে, তাঁহার আগমন ও প্রশ্ন শিক্ষার্থীরূপে নহে বরং ছাহাবা কেরামকে শিক্ষা দিবার জন্যই তিনি আগমন করিয়াছেন।

(আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন) বিষয়গত দিক হইতে ঈমান ও ইসলাম ভিন্ন। কিন্তু শরীয়তের দৃষ্টিতে উভয়টি পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। কেননা শরীয়তের দৃষ্টিতে ইসলাম ছাড়া (পূর্ণ) ঈমান বা ঈমান ছাড়া ইসলাম হইতে পারে না। সুতরাং মুমিন মাত্রই মুসলমান আবার মুসলমান মাত্রই মুমিন। সুতরাং হাদীছে জিবরীলে ঈমান ও ইসলামের মাঝে যে পার্থক্য নির্দেশ করা হইয়াছে উহা বিষয়গত দিক হইতে; প্রয়োগগত দিক হইতে নহে। অর্থাৎ শরীয়তের পরিভাষায় ইসলাম অর্থ শরীয়তের বাহ্যিক আহকাম ও আমলসমূহ আনুগত্যের সহিত পালন করা। পক্ষান্তরে ঈমান অর্থ শরীয়ত নির্ধারিত আকায়েদ ও বিশ্বাসসমূহ অন্তরে গ্রহণ করা। তবে শরীয়তের বিভিন্ন বক্তব্যে একটির স্থানে অন্যটির উদার ব্যবহার দেখা যায়। যেমন নিম্নোক্ত হাদীছে আহকাম ও আমলের ক্ষেত্রে ঈমান শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে–

الايمان بضع و سبعون بابا ادناها اماطة الاذى عن الطريق و ارفعها قول لا اله الا الله *

ঈমানের দ্বার বা শাখা সত্তরের কিছু উর্ধ্বে। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন হইল রাস্তা হইতে কষ্টদায়ক জিনিস সরাইয়া দেওয়া। আর সর্বোচ্চ হইল, لا اله الا الله এই কালিমা উচ্চারণ করা।

তদ্রূপ নিম্নোক্ত আয়াতে অন্তরের বিশ্বাস সম্পর্কে ইসলাম শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে–

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ *

আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম হইল ইসলাম।

(তুমি সাক্ষ্য দিবে) অর্থাৎ মুখে কালিমা উচ্চারণ করিতে হইবে। কেননা ইসলাম গ্রহণযোগ্য হইবার জন্য ইহা শর্ত। সুতরাং কালিমার বিষয়বস্তু যে বিশ্বাস করিল, কিন্তু উচ্চারণে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও উহা উচ্চারণ করিল না সে মুমিনও হইবে না, মুসলিমও হইবে না। ইমাম নববী (রহঃ) মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে এই সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের ইজমা ও সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত বর্ণনা করিয়াছেন।

বিশুদ্ধ মতে, কালিমার বিষয়বস্তুর প্রতি অন্তরে বিশ্বাস স্থাপনের পর উহার আরবী উচ্চারণ অপরিহার্য নহে।

আল্লামা ইবনুচ্ছালাহ (রহঃ) বলেন, তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য দ্বারাই ইসলাম প্রমাণিত হয়। উহার সংগে নামায ও অন্যান্য আমল যুক্ত করিবার কারণ এই যে, এইগুলি হইল

ইসলামের সর্বোত্তম আমল ও প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। কেননা এইগুলি দ্বারা আনুগত্য চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। আর এইগুলি তরক করা আনুগত্যের দুর্বলতা প্রমাণ করে। মোটকথা আলোচ্য হাদীছে পাঁচ বেনা উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য হইল ইসলামের পূর্ণাংগতা বর্ণনা করা। পক্ষান্তরে মূল ইসলাম কালিমা-ই শাহাদত দ্বারাই অস্তিত্ব লাভ করে।

(আশ্চর্য হইলাম) কেননা প্রশ্ন করা প্রশ্নকারীর অজ্ঞতা প্রমাণ করে। পক্ষান্তরে সত্যায়ন তাহার জ্ঞান ও অবগতি প্রমাণ করে।

(আল্লাহর প্রতি ঈমান) অর্থাৎ ইহা বিশ্বাস করা যে, সত্তা, গুণ ও কর্ম সকল ক্ষেত্রেই আল্লাহ এক। উপাস্যতার ক্ষেত্রে তাঁহার কোন শরীক নাই। তাঁহার গুণ ও সত্তা সকলই অনাদি। যাবতীয় পূর্ণতার গুণে তিনি গুণান্বিত এবং যাবতীয় অপূর্ণতার দোষ হইতে চিরমুক্ত।

(তাকদীরের প্রতি) সংক্ষেপে তাকদীরের প্রতি ঈমান অর্থ ইহা বিশ্বাস করা যে, বান্দার সকল কর্ম আল্লাহর সৃষ্ট এবং তাঁহার ইচ্ছাকৃত, তবে বান্দাকর্তৃক অর্জিত। বান্দা ভাল বা মন্দ যাহা কিছু করে এবং যে পরিণতি তাহারা লাভ করিবে সমস্ত কিছু আল্লাহ পূর্ব হইতে জ্ঞাত আছেন এবং সেই অনুসারে তিনি আপনার নিকট উহা লিখিয়া রাখিয়াছেন এবং কার্যকর করিয়াছেন। সেই জ্ঞান ও লেখা অনুযায়ী বান্দার কর্ম চলিতেছে। আল্লাহ পাকই বান্দার যাবতীয় ভাল মন্দ কর্ম সৃষ্টি করেন।

মূলতঃ তাকদীর সম্পর্কে এতটুকু বিশ্বাস করিয়া ক্ষান্ত হওয়াই কর্তব্য। এই সম্পর্কে অধিক চিন্তাভাবনা করিতে হাদীছ শরীফে নিষেধ করা হইয়াছে। কেননা বিশ্বজগতের অনেক রহস্যই আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান অনুধাবন করিতে সক্ষম নহে। সুতরাং আল্লাহর ইলম ও কুদরতের নিয়ন্ত্রণাধীন তাকদীরের অপার রহস্য আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানের অনুধাবনে না আসাই স্বাভাবিক। মনে রাখিতে হইবে যে, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রদত্ত খবরই হইল বান্দার ঈমান ও বিশ্বাসের বুনিয়াদ। বান্দার ক্ষুদ্র জ্ঞানের অনুধাবন জরুরী নহে।

(প্রশ্নকৃত ব্যক্তি) অর্থাৎ কিয়ামত কায়েম হইবার নির্ধারিত সময় না জানিবার ব্যাপারে আমরা উভয়ে সমান। ইমাম সুয়ূতী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, প্রথম দিকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইহা জানা ছিল না, পরে আল্লাহ পাক তাঁহাকে কিয়ামতের নির্ধারিত সময় জানাইয়া দিয়াছেন। তবে মানুষের নিকট উহা গোপন রাখিবার নির্দেশ দিয়াছেন।

এই উত্তর হইতে বোঝা গেল যে, মুফতীকে যদি এমন কোন প্রশ্ন করা হয় যাহা তাহার জানা নাই, তবে পরিষ্কার বলিয়া দেওয়া কর্তব্য যে, আমার জানা নাই। আন্দায অনুমানের উপর উত্তর দেওয়া উচিত নহে। কেননা ইহাতে নিজে গোমরাহ হইবার এবং অন্যকে গোমরাহ করিবার সম্ভাবনা বিদ্যমান।

ইমাম সুয়ূতী (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) ও হযরত জিবরীল (আঃ)-এর মাঝে একবার এই প্রশ্নোত্তর হইয়াছিল। তবে প্রশ্নকারী ছিলেন হযরত ঈসা (আঃ)। তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে হযরত জিবরীল (আঃ) আপন ডানাগুলি ঝাড়া দিয়া বলিয়াছিলেন, প্রশ্নকৃত প্রশ্নকর্তার চাইতে অধিক জ্ঞাত নহে।

(ইহসান এই যে,) ইহসানের মূল মর্ম হইল আল্লাহর যাবতীয় হক রক্ষা করিয়া গুরু

হইতে শেষ পর্যন্ত তাঁহার বড়ত্ব ও মহিমা স্মরণ রাখিয়া হুবহু নির্দেশ মত ইবাদত করিয়া যাওয়া। ইহার স্তর দুইটি। উচ্চস্তর ও নিম্নস্তর। এই স্তর দুইটিই হাদীছ শরীফে যথাক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। মুলতঃ এই দুইটি স্তরের উৎস হইল আল্লাহর মারেফাত।

(দাসী তাহার মালিকানকে) এক বর্ণনায় আছে দাসী তাহার মনীবকে জন্ম দিবে। অন্য বর্ণনায় আছে দাসী তাহার স্বামীকে জন্ম দিবে। ইহার অর্থ এই যে, মুসলমানদের বিভিন্ন দেশ জয়ের কারণে দাসীর সংখ্যা প্রচুর হইবে এবং দাসীর ঘরে মনিব কন্যা বা মনিব পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে। সুতরাং কিয়ামতের আলামত হইল মুসলমানদের দেশ জয় ও প্রচুর সংখ্যায় দাসীর গর্ভে সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ।

কিংবা অর্থ এই যে, মানুষ শরীয়তের হুকুম সম্পর্কে মুর্খতাবশতঃ আপন সন্তানের দাসীমাতাকে বিক্রয় করিবে (অথচ উহা হারাম) আর দাসীর পুত্র পরবর্তীতে না জানিয়া তাহাকে ক্রয় করিবে এবং তাহার সহিত সহবাস করিবে। সুতরাং কেয়ামতের আলামত হইল অত্যধিক মুর্খতা ও শরীয়তের নাফরমানি।

কিংবা অর্থ এই যে, স্বাধীন নারীর সহিত তাহার পুত্র কন্যারা দাসীসুলভ আচরণ করিবে। সুতরাং কিয়ামতের আলামত হইল পিতা মাতার অবাধ্যতা।

কিংবা অর্থ হইল মানুষ তাহার মায়ের সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হইবে। সুতরাং কিয়ামতের আলামত হইল যিনা ও ব্যভিচারের ভয়াবহ প্রসার।

(নগ্নপদ, নগ্নদেহী) অর্থাৎ সমাজের অযোগ্য ও নিম্নশ্রেণীর লোকদের হাতে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি চলিয়া আসিবে এবং তাহারা অর্থ বিত্তের পাহাড় গড়িয়া তুলিবার এবং আকাশচুম্বী অট্টালিকা নির্মাণের উম্মত্ত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হইবে। আর জ্ঞানী-গুণী ও সৎ লোকেরা কোণঠাসা হইয়া পড়িবে।

অন্য হাদীছে আছে–

من اشراط الساعة ان توضع الاخيار و ترفع الاشرار

কিয়ামতের আলামত এই যে, সৎ লোকেরা মর্যাদাহীন হইবে আর দুষ্ট লোকেরা মর্যাদাশালী হইবে।

অন্য হাদীছে আছে–

لا تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس لكع بن لكع

ইতরের পুত্র ইতর যতক্ষণ সর্বাধিক সৌভাগ্যশালী না হইবে ততক্ষণ কিয়ামত হইবে না।

অন্য হাদীছে আছে–

اذا و سد الامر الى غير اهلها فانتظر الساعة

যখন শাসনক্ষমতা অযোগ্য লোকের হাতে অর্পিত হয় তখন কিয়ামতের অপেক্ষা কর।

৬৩। আল্লাহ্‌র ভয় ও উত্তম আচরণের গুরুত্ব

اَلثَّانِي : عَنْ اَبِي ذَرٍّ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادَةَ، وَاَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ، ﷺ، قَالَ: «اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَاَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

হযরত আবু যর (রাঃ) ও হযরত মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যেখানেই থাক আল্লাহকে ভয় করিও এবং মন্দ কাজের পর নেক কাজ করিও। উহা ঐ মন্দ কাজকে মুছিয়া দিবে এবং মানুষের সহিত উত্তম আচরণ করিও। (তিরমিযি শরীফ)

ফায়দা ঃ

(আল্লাহকে ভয় করিও) অর্থাৎ তুমি যেখানেই থাক মানুষ তোমাকে দেখিতে পাউক কিংবা দেখিতে না পাউক সর্বাবস্থায় আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ মানিয়া চলিবে। এমন যেন না হয় যে, লোকচক্ষুর সম্মুখে তো পরহেযগার সাজিয়া থাকিলে। আর লোকচক্ষুর আড়ালে পাপাচার চালাইলে। ইহা তো মানুষকে ভয় করা হইল।

মানুষকে ভয় করিবার পরিবর্তে আল্লাহকে ভয় করা উচিত। কেননা তিনি তোমাকে সর্বক্ষণ সর্বাবস্থায় দেখিতেছেন, আল্লাহ পাক বলেন–

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا *

নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদিগকে পাহারা দিতেছেন।

অন্য এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু যর (রাঃ)-কে বলিয়াছেন–

اوصيك بتقوى الله فى سرائرك و علانيتك *

আমি তোমাকে তোমার গোপন বিষয়ে এবং তোমার প্রকাশ্য বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করিবার উপদেশ দিতেছি।

তাকওয়া শব্দটি উচ্চারণে সামান্য হইলেও হাকীকতের দিক হইতে অসামান্য। ইহা আল্লাহর যাবতীয় হক এবং বান্দার যাবতীয় হককে অন্তর্ভুক্ত করে। কেননা যাহার অন্তরে আল্লাহর (আযাব ও গজবের) ভয় থাকিবে সে অবশ্যই আল্লাহ পাকের সকল আদেশ মান্য করিয়া এবং নিষেধ পরিহার করিয়া চলিবে।

(এবং মন্দ কাজের পর নেক কাজ করিও।) তাকওয়ার আদেশ দানের পর এই কথা বলিয়া ইহা বুঝানো হইয়াছে যে, গোনাহ হইয়া যাওয়া তাকওয়ার পরিপন্থী নহে। মুত্তাকীদের দ্বারাও গোনাহ হইয়া যাইতে পারে। তবে মুত্তাকীদের চরিত্র এই যে, গোনাহ হইবার পর তাহারা অস্থির হইয়া পড়িবে এবং অবিলম্বে তাওবা ও ইস্তিগফার শুরু করিবে। কেননা কোরআন শরীফে মুত্তাকীদের পরিচয় প্রসংগে বলা হইয়াছে–

وَ الَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَ مَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ

اللّٰهِ، وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا*

এবং যাহারা কোন অশ্লীল কাজ করিয়া ফেলিলে কিংবা (আল্লাহর আদেশ লংঘনের মাধ্যমে) নিজেদের উপর অবিচার করিয়া ফেলিলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের গোনাহের জন্য ইস্তিগফার করে। আর আল্লাহ ছাড়া কেই বা গোনাহ মাফ করিতে পারে। আর তাহারা নিজেদের কৃতকর্মের উপর হঠকারিতা করে না।

ঘটনাক্রমে গোনাহ হইবার পর নেক আমল করিবার আদেশ দানের সংগে সংগে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে– تمحها অর্থাৎ পরবর্তী নেক আমলটি পূর্ববর্তী বদ আমলকে মুছিয়া ফেলিবে। এই হাকীকতটি নিম্নোক্ত আয়াত হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে–

إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ *

নিঃসন্দেহে নেক আমল বদ আমলসমূহকে দূর করিয়া দেয়।

আলোচ্য আয়াত ও হাদীছের বাহ্যিক অর্থ এই যে, নেক আমল বদ আমলসমূহকে আমলনামা হইতেই মুছিয়া ফেলিবে। আমলনামায় উহার অস্তিত্বই থাকিবে না।

কেহ কেহ বলেন, ইহার অর্থ হইল হিসাব না লওয়া ও পাকড়াও না করা। অবশ্য আমলনামায় কিয়ামত পর্যন্ত উহা বিদ্যমানই থাকিয়া যাইবে।

আল্লামা মুহম্মদ বিন আল্লান এই ধারণা খণ্ডণ করিয়া বলেন, হাকীকতের পরিবর্তে রূপক অর্থ গ্রহণের জন্য দলীল প্রয়োজন। যেহেতু রূপক অর্থের স্বপক্ষে কোন দলীল নাই এবং ইহার প্রয়োজনও নাই সেহেতু হাকীকী অর্থ গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত।

এই হাদীছটি আল্লাহর হক সম্পর্কিত ছগীরা গোনাহের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত। কবীরা গোনাহের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ মত এই যে, তাওবার যাবতীয় শর্ত পালনপূর্বক তাওবা করা ছাড়া উহা মাফ হইবে না। তাওবা করিবার ছুরতে কবীরা গোনাহও আলোচ্য হাদীছের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। অর্থাৎ গোনাহ দ্বারা ছগীরা কবীরাহ উভয় প্রকারই উদ্দেশ্য হইবে পক্ষান্তরে বান্দার হক সমূহ বান্দাকে রাজি করা ছাড়া মাফ হইবে না। হয় দুনিয়াতে হকদার বান্দা নিজেই মাফ করিয়া দিবে কিংবা হক আত্মসাৎকারী বান্দা যে কোন উপায়ে মাফ লইবে। কিংবা আল্লাহ কিয়ামতের দিন (যদি রহম করিবার ইচ্ছা করেন তবে) হকদারকে নিজের পক্ষ হইতে সন্তুষ্ট করিবেন।

(মানুষের সহিত উত্তম আচরণ কর) তিরমিযি ও অন্যান্যদের মতে ইহার অর্থ হইল, মানুষের সহিত হাসিমুখে থাকা। তাহাদিগকে কষ্টদান হইতে বিরত থাকা এবং তাহাদের প্রয়োজনে আন্তরিক সাহায্য করা।

বহু হাদীছে মহৎ চরিত্রের প্রশংসা আসিয়াছে। কেননা মহৎ চরিত্রেই মনুষ্যত্বের প্রকাশ। মহৎ চরিত্রগুণেই পৃথিবীতে ইসলাম এত দ্রুত বিস্তার লাভ করিয়াছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মহত্তম চরিত্রের অধিকারী। তিনি নিজেই ইরশাদ করিয়াছেন–

بعثت لاتمم مكارم الاخلاق *

মহত্তম চরিত্রকে সম্পূর্ণতা দানের জন্যই আমি প্রেরিত হইয়াছি।

সুতরাং যিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যত নিকটবর্তী হইবেন তিনি ততবেশী মহৎ চরিত্রের অধিকারী হইবেন। এই নিয়মে নবীর ওয়ারিছ তথা আলিম সম্প্রদায়ের কর্তব্য হইল অধিকতর মহৎ চরিত্রের অধিকারী হওয়া। তাহাদের বাস্তব নমুনা দেখিয়া উম্মতের অন্যান্য শ্রেণীও মহৎ চরিত্র গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হইবে। তখন উম্মতের চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হইয়া অন্যান্য জাতি দলে দলে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হইবে ইনশাআল্লাহ।

গোটা মানব সম্প্রদায় আজ মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের শিকার। ইসলামী উম্মাহ্র পক্ষেই শুধু সম্ভব বিশ্ব মানবতার সামনে মহৎ চরিত্রের আদর্শ পেশ করা এবং এইভাবে তাহাদিগকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে টানিয়া আনা। এই দিকেই আলোচ্য হাদীছে উম্মাহকে উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে।

৬৪। আল্লাহকে স্মরণ করা এবং তাঁহার নিকটই চাওয়া

اَلثَّالِثُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ ، يَوْمًا فَقَالَ: «يَا غُلَامُ إِنِّيْ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: «احْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظْكَ ، احْفَظِ اللّٰهِ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللّٰهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ، وَاعْلَمْ: اَنَّ الْاُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلٰى اَنْ يَنْفَعُوْكَ بِشَيْءٍ، لَمْ يَنْفَعُوْكَ اِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ، وَاِنِ اجْتَمَعُوْا عَلٰى اَنْ يَضُرُّوْكَ بِشَيْءٍ؛ لَمْ يَضُرُّوْكَ اِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ؛ رُفِعَتِ الْاَقْلَامُ، وَجُفَّتِ الصُّحُفُ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ غَيْرِ التِّرْمِذِيِّ: «احْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ اَمَامَكَ، تَعَرَّفْ اِلَى اللّٰهِ فِيْ الرَّخَاءِ يَعْرِفُكَ فِيْ الشِّدَّةِ، وَاعْلَمْ اَنَّ مَا اَخْطَاَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَكَ، وَمَا اَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَاعْلَمْ اَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَاَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَاَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا» .

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদিন আমি (সওয়ারিতে) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে বসা ছিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, হে বালক! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখাইতেছি। (এইগুলির উপর আমল করিও) আল্লাহর হুকুম আহকাম রক্ষা করিও; আল্লাহ তোমাকে (দ্বীন ও দুনিয়ার যাবতীয় বিপদাপদ হইতে বিশেষতঃ মৃত্যুর সময়) রক্ষা করিবেন এবং আল্লাহকে স্মরণ করিও; তবে তাঁহাকে তুমি নিজের নিকটেই পাইবে। আর যখন কিছু চাহিবে তখন আল্লাহর নিকটই চাহিও এবং যখন সাহায্য প্রার্থনা করিবে তখন আল্লাহর নিকটই করিও এবং বিশ্বাস রাখিও যে, সমগ্র সৃষ্টিজগত যদি তোমার কোন উপকার করিতে একত্র হয় তবে তোমার কোন উপকার করিতে পারিবে না; কিন্তু যাহা আল্লাহ তোমার জন্য লিখিয়া রাখিয়াছেন। তদ্রূপ যদি সমস্ত সৃষ্টিজগত তোমার কোন ক্ষতি করিতে একত্র হয় তবে তোমার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না; কিন্তু যাহা আল্লাহ তোমার সম্পর্কে লিখিয়া রাখিয়াছেন। কলম উঠাইয়া রাখা হইয়াছে এবং ছহীফা (ও তাকদীরনামা) শুকাইয়া গিয়াছে। (তিরমিযি শরীফ)

তিরমিযি ছাড়া অন্য এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহকে স্মরণ রাখিও; তবে তাঁহাকে

তোমার নিকটে পাইবে এবং সুখ সচ্ছলতার সময় আল্লাহর সহিত সম্পর্ক রাখিও তবে বিপদ ও অসচ্ছলতার সময় তিনি তোমাকে চিনিবেন। আর বিশ্বাস রাখিও যে, যাহা তোমার হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে তাহা কিছুতেই তোমার হাতে আসিবার ছিল না। তদ্রূপ যাহা তোমার হাতে আসিয়াছে তাহা কিছুতেই তোমার হাতছাড়া হইবার ছিল না। আর স্মরণ রাখিও যে, ছবরের সংগেই (আল্লাহর) মদদ আসে এবং বিপদের সংগেই বিপদমুক্তি রহিয়াছে এবং কষ্টের পরেই আসানি রহিয়াছে।

ফায়দা ঃ

(একদিন আমি সওয়ারিতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে বসা ছিলাম) এই অংশটি অন্য এক রিওয়ায়াত হইতে যুক্ত করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সওয়ারির সহনক্ষমতা থাকিলে পিছনে একজন সহআরোহী লওয়া জায়েয আছে। আরও প্রমাণিত হয় যে, মুরুব্বী বা শায়খের সহআরোহী হওয়া আদবের খেলাফ নহে।

আল্লামা মুহম্মদ বিন আল্লান গোটা হাদীছ-ভাণ্ডার অনুসন্ধান করিয়া ঐ সকল ছাহাবা কেরামের নাম সংগ্রহ করিয়াছেন যাহারা কখনও না কখনও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহআরোহী হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। মোট চল্লিশ জন ছাহাবীর নাম তাঁহার সংগ্রহে আসিয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকজনের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। আবু বকর ২। উছমান ৩। আলী ৪। উসামাহ ৫। ছাফিয়্যাহ ৬। হাসান ৭। হোসায়ন ৮। মু'আয ৯। আবু দারদা ১০। ইবনে আব্বাস ১১। ফযল বিন আব্বাস ১২। আবু যর ১৩। আবু হোরায়রা ১৪। যায়দ বিন ছাবিত ১৫। হোযায়ফা ও অন্যান্য।

(হে বালক আমি তোমাকে) এই ধরণের বাক্য বলিবার উদ্দেশ্য শ্রোতার অন্তরে আগ্রহ সৃষ্টি করা, যাহাতে সে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে এবং বিষয়টি তাহার অন্তরে বদ্ধমূল হয় এবং পূর্ণ উপকার লাভ হয়।

(আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করিবেন) যেমন ইরশাদ হইয়াছে–

أُوفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ *

তোমরা আমার সহিত কৃত অংগীকার পালন কর; আমিও তোমাদের সহিত কৃত অংগীকার পালন করিব।

(তাঁহাকে তোমার নিকটেই পাইবে) আল্লাহকে নিকটে পাইবার অর্থ, তাঁহার রহমত, মদদ ও হিফাযত লাভ করা, যাহার ফলে বান্দার অন্তরে মাখলূকের ভয় থাকে না এবং কোন মাখলূকের প্রতি মুখাপেক্ষিতা থাকে না।

মোটকথা যে সকল আয়াতে বা হাদীছে আল্লাহ বান্দার সংগে বা নিকটে থাকিবার কথা আছে সেখানে স্থূল অর্থ উদ্দেশ্য নহে। কেননা আল্লাহর পবিত্র যাত ও সত্তা স্থান হইতে পবিত্র সুতরাং উহা দ্বারা ভাবগত অর্থ উদ্দেশ্য।

হাদীছের মূল শব্দ হইল تُجَاهَكَ অর্থাৎ তোমার সম্মুখে। অন্যান্য দিকের পরিবর্তে সম্মুখ দিক উল্লেখ করিবার হিকমত এই যে, মানুষ তো আখিরাতের পথে সফরে নিয়োজিত আছে, আর

মুসাফিরের লক্ষ্য সম্মুখেই থাকে। অন্য কোন দিকে থাকে না।

(আল্লাহর নিকট চাহিও) কোন মাখলূকের নিকট চাহিও না। কেননা মাখলূকের নিকট চাওয়াতে ক্ষতি ছাড়া কোন লাভ নাই। বিশ্ব জগতের সকল খাজানা তো আল্লাহর কুদরতের কব্জায়। মাখলূক নিজেই তো আল্লাহর দানের মুহ্তাজ। এক মুহ্তাজ অন্য মুহ্তাজের হাজাত পূরা করিবে কিভাবে ?

কথিত আছে যে, একবার এক আরব বেদুঈন তাহার বালক-পুত্রসহ বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করিতেছিল। এমন সময় দেখা গেল সুবিশাল মুসলিম জাহানের একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী খলীফা হারুনুর রশীদ মুলতাযামে দাঁড়াইয়া দুই হাত উপরে তুলিয়া রোনাযারি করিতেছেন। আর বেদুঈন মূলতঃ খলীফার হজ্জে আগমনের খবর পাইয়াই আসিয়াছিল। তাহার উদ্দেশ্য ছিল খলীফার দরবারে হাযির হইয়া নিজের প্রয়োজন ব্যক্ত করিবে। কিন্তু আল্লাহর দরবারে খলীফার এই রোনাযারির দৃশ্য দেখিয়া তাহার ভাবান্তর হইল। বালক-পুত্রকে সম্বোধন করিয়া সে বলিল-

انظر كيف يتضرع جبار الارض الى جبار السماء *

দেখ, যমিনের মহাপরাক্রমশালী আসমানের মহাপরাক্রমশালীর নিকট কিভাবে কাতরতা প্রকাশ করিতেছে (সুতরাং আমরা কেন তাহার নিকট হাত পাতিব। আমরাও তো আসমানওয়ালার নিকট চাহিতে পারি!)

কোন কোন আসমানী কিতাবে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ পাক বলেন–

আমার ইযযত ও মর্যাদার কসম! যে আমাকে ছাড়া অন্যের নিকট আশা করে আমি তাহার আশা ভংগ করিব এবং মাখলূকের সামনে তাহাকে বে-ইযযতের লেবাস পরাইব এবং আমার নৈকট্য হইতে তাহাকে দূরে রাখিব এবং আমার মিলন হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিব এবং চিন্তাগ্রস্ত ও দিশাহারা করিয়া রাখিব।

বিপদ মুছীবতে বান্দা আমার পরিবর্তে অন্যের নিকট আশা করে অথচ বিপদ মুছীবত আমার হাতে এবং আমিই চিরঞ্জীব, চিরব্যবস্থাপক।

বান্দা তাহার চিন্তার মাধ্যমে আমার পরিবর্তে অন্যান্যের দরওয়াজায় করাঘাত করে। অথচ সকল দরওয়াজার চাবি আমার হাতে। আর সেইগুলি বন্ধ (অবস্থায় আছে) শুধু আমার দরওয়াজা খোলা ঐ ব্যক্তির জন্য যে আমাকে ডাকে।

(কলম উঠাইয়া রাখা হইয়াছে এবং ছাহীফা শুকাইয়া গিয়াছে) অর্থাৎ বিশ্বজগতের কোথায় কখন কি ঘটিবে। কিভাবে ঘটিবে এবং কতটুকু ঘটিবে তাহা লেখা হইয়া গিয়াছে। লেখা শেষ হইবার পর কলম তুলিয়া রাখা হইয়াছে। সুতরাং নতুন করিয়া কিছু লেখার সম্ভাবনা নাই। ছাহীফা বা লাওহে মাহফুয, যাহাতে তাকদীরের যাবতীয় বিষয় লেখা হইয়াছে, তাহার কালি শুকাইয়া গিয়াছে। ফলে উহা মুছিয়া ফেলা বা উহাতে পরিবর্তন করা সম্ভব নহে। অর্থাৎ এই বাক্যদুইটি দ্বারা তাকদীরের অপরিবর্তনীয়তার প্রতি ইংগিত করা হইয়াছে।

(সুখ ও সচ্ছলতার সময় আল্লাহকে চিনিও) অর্থাৎ সুখ ও সচ্ছলতার সময় ইবাদত বন্দেগী ও দানশীলতার মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ রাখিও এবং আল্লাহর দান ও নেয়ামত স্মরণ করিয়া তাঁহার শোকর করিও। তবে বিপদাপদের সময় তিনি তোমাকে চিনিবেন। অর্থাৎ

তোমার বিগত নেক আমলের ওছিলায় বিপদ মুছীবত দূর করিবেন এবং ছবর করিবার তাওফীক দান করিবেন।

আল্লাহর প্রতি বান্দার মারিফাত (পরিচয়) দুই প্রকার। সাধারণ মারিফাত ও বিশেষ মারিফাত। সাধারণ মারিফাত হইল ঈমানের প্রাথমিক স্তর যাহাতে সকল মুমিন সমানভাবে শরীক। যথা, আল্লাহর একত্ব ও তাঁহার প্রতিপালকত্ব স্বীকার করা এবং উহার প্রতি ঈমান আনা। বিশেষ মারিফাত হইল ঈমানের উচ্চস্তর। যথা সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া আল্লাহর সহিত সম্পর্ক যুক্ত করা। আল্লাহর যিকির দ্বারা হৃদয়ে শান্তি লাভ হওয়া। আল্লাহকে লজ্জা করিয়া গোনাহ পরিহার করা এবং সর্বাবস্থায় তাঁহাকে হাযির নাযির মনে করা। কলবের এই অবস্থার যতই উন্নতি হইতে থাকিবে মারিফাতও ততই গভীর হইতে থাকিবে। ইহার সর্বশেষ স্তর হইল ফানা ফিল্লাহ।

বান্দার প্রতি আল্লাহর মারিফাতও দুই প্রকার। সাধারণ মারিফাত। যথা, বান্দার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের যাবতীয় আমল ও পরিণাম সম্পর্কে ইলম ও অবগতি। দ্বিতীয় হইল খাছ মারিফাত। যথা, বান্দাকে মুহব্বত করা, তাহাকে সান্নিধ্য ও নৈকট্যের মর্যাদা দান করা, তাহার দু'আ কবুল করা এবং বিপদ মুছীবতে তাহাকে মদদ করা। বান্দার প্রতি আল্লাহর পক্ষ হইতে এই খাছ মারিফাত তখনই হাছিল হইবে যখন বান্দার অন্তরে আল্লাহর প্রতি খাছ মারিফাত হাছিল হইবে।

(তাহা কিছুতেই তোমার হাতে আসিবার ছিল না) অর্থাৎ তাকদীরের ফায়সালা অটল। তাকদীরের বিরুদ্ধে মানুষের কোন প্রচেষ্টাই কার্যকর নহে। সুতরাং মানুষের কর্তব্য হইল আল্লাহর হুকুম হিসাবে মেহনত করা। অতঃপর ভাল বা মন্দ যে ফলাফলই আসিবে উহাকে আল্লাহর পক্ষ হইতে সুনির্ধারিত ও অবধারিত মনে করিয়া শোকর করা কিংবা ছবর করা।

উপরের আলোচনা হইতে পরিষ্কার হইয়া গেল যে, কর্মবিমুখতার নাম তাকদীর নহে বরং কর্ম প্রচেষ্টা দ্বারা তাকদীরের ফায়সালা জানা এবং ছবর বা শোকরের মাধ্যমে উহা মানিয়া লইবার নাম তাকদীর।

যেমন আল কোরআনে ইরশাদ হইয়াছে—

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗ اِلَّا هُوَ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ *

যদি আল্লাহ তোমাকে কোন অনিষ্ট দান করেন তবে তিনি ছাড়া উহা দূরকারী কেহ নাই। আর তিনি যদি তোমার কোন কল্যাণের ইচ্ছা করেন তবে তাঁহার দান রদকারী কেহ নাই।

'মানুষের ভালমন্দ যাবতীয় ভাগ্য লিখিত হইয়া গিয়াছে। ইহাতে এখন আর কোন পরিবর্তন হইবে না।'

এই বিশ্বাস যখন মানুষের অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া যাইবে তখন মাখলূকের ভয় তাহার অন্তর হইতে চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে এবং একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা ও তাওয়াক্কুল চিরজাগ্রত হইবে।

হাদীছের উভয় বর্ণনার মূল উদ্দেশ্য আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুলের উপর বান্দাকে উদ্বুদ্ধ করা।

৬৫। গোনাহকে মামুলি মনে করা গুরুতর।

الرَّابِعُ: عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: «اِنَّكُمْ لَتَعْمَلُوْنَ اَعْمَالًا هِيَ اَدَقُّ فِيْ اَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ، كُنَّا نَعُدُّهَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْمُوْبِقَاتِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

قَالَ: «الْمُوْبِقَاتُ»: الْمُهْلِكَاتُ.

হযরত আনাস (রাঃ) বলিয়াছেন, (হে লোক সকল!) তোমরা এমন এমন গোনাহ কাজ করিতে থাক যাহা তোমাদের চোখে চুলের চাইতেও তুচ্ছ। অথচ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় ঐ গুলিকে আমরা ধ্বংসের কারণ মনে করিতাম।

(বুখারী শরীফ

ফায়দা ঃ

যাহাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় নাই তাহারাই বড় গোনাহকেও তুচ্ছ মনে করে আ যাহাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় ও মারিফাত আছে তাহারা সাধারণ গোনাহকেও পাহাড়তুল্য ম করে। ছাহাবায়ে কেরাম যেহেতু আল্লাহর ভয় ও মারিফাতের সর্বোচ্চ স্তরে সমাসীন ছিলে সেহেতু তাবেয়ীগণের অবস্থাও তাহাদের চোখে এমন গুরুতর মনে হইত। সুতরাং আমাদে এই যুগের অবস্থা দেখিতে পাইলে ছাহাবা কেরাম কি ভাবিতেন তাহা চিন্তা করিয়া দেখ দরকার।

এই প্রসংগে দুইট হাদীছ উল্লেখ করা ভাল মনে হয়।

لا تنظر الى صغر الخطيئة و انظر الى عظم من عصيت *

গোনাহের ক্ষুদ্রতার দিকে তাকাইও না বরং যাঁহার নাফরমানি করিয়াছ তাঁহার বড়ত্বের দিকে তাকাও।

অন্য হাদীছে আছে—

المؤمن يرى ذنبه كانه صخرة يخاف ان تقع عليه، و الكافر يرى ذنبه كانه ذباب يمر على انفه *

মুমিন তাহার পাপকে মনে করে যেন এক বিরাট প্রস্তরখণ্ড যাহা সে তাহার উপর পড়িবার আশংকা করিতেছে। পক্ষান্তরে কাফির তাহার গোনাহকে মনে করে যেন একটি মাছি নাকের পাশ দিয়া উড়িয়া গেল।

এই সমস্ত হাদীছের শিক্ষা এই যে, মানুষের উচিত দ্বীনী বরবাদির আশংকায় ক্ষুদ্র গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকা, যেমন মৃত্যুর আশংকায় সামান্যতম পরিমাণ বিষও পরিহার করা হয়।

৬৬। আল্লাহ পাকের গায়রত

اَلْخَامِسُ: عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «اِن اللّٰهَ تَعَالٰى يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللّٰهِ، تَعَالٰى، اَنْ يَاْتِيَ الْمَرْءَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَ «الْغَيْرَةُ» بِفَتْحِ الْغَيْنِ: وَاَصْلُهَا الْاَنَفَةُ.

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ্ পাকের গায়রত হয়। আল্লাহ্ পাকের গায়রত এই যে, মানুষ ঐ সমস্ত কাজে লিপ্ত হয় যাহা আল্লাহ্ তাহার জন্য হারাম করিয়া দিয়াছেন।

(মুসলিম ও বুখারী শরীফ)

ফায়দা ঃ

একজন পুরুষ যেমন তাহার স্ত্রীকে পরপুরুষের সহিত সম্পর্ক করিতে দেখিলে, (তদ্রূপ একজন স্ত্রীলোক যেমন তাহার স্বামীকে পরনারীর সহিত সম্পর্ক করিতে দেখিলে) গায়রত বোধ করে তেমনি আল্লাহ্ পাক তাঁহার বান্দাকে কোন হারাম কাজে লিপ্ত দেখিলে গায়রত বোধ করেন। এখন চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে, কাহারও প্রতি মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের গায়রত হইলে কত ভয়ংকর শাস্তি তাহার উপর নাযিল হইতে পারে।

'গায়রত' মানুষের গুণ। আল্লাহ্ পাক ইহা হইতে পবিত্র। আল্লাহর নাফরমানির গুরুতরতা বুঝাইবার জন্য শুধু ইহা বলা হইয়াছে। এখানে গায়রত অর্থ হারাম কাজে বান্দার লিপ্ত হইবার পর আল্লাহ্ পাকের আযাব ও গজব নাযিল করিবার ইচ্ছা।

৬৭। আপন বিগত অবস্থা স্মরণ রাখা

اَلسَّادِسُ: عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: «اِنَّ ثَلَاثَةً مِنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ: اَبْرَصَ، وَاَقْرَعَ، وَاَعْمٰى، اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَبْتَلِيَهُمْ فَبَعَثَ اِلَيْهِمْ مَلَكًا، فَاَتَى الْاَبْرَصَ فَقَالَ: اَيُّ شَيْءٍ اَحَبُّ اِلَيْكَ؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ، وَجِلْدٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِيْ قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ؛ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذِرُهُ وَاُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا. قَالَ: فَاَيُّ الْمَالِ اَحَبُّ اِلَيْكَ؟ قَالَ: الْاِبِلُ ـ اَوْ قَالَ اَلْبَقَرُ ـ شَكَّ الرَّاوِيْ ـ فَاُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ، فَقَالَ: بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيْهَا.

فَاَتَى الْاَقْرَعَ فَقَالَ: اَيُّ شَيْءٍ اَحَبُّ اِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعْرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّيْ هٰذَا الَّذِيْ قَذِرَنِي النَّاسُ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ، وَاُعْطِيَ شَعْرًا حَسَنًا. قَالَ: فَاَيُّ الْمَالِ اَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: اَلْبَقَرُ، فَاُعْطِيَ بَقَرَةً حَامِلًا، وَقَالَ: بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيْهَا.

فَاَتَى الْاَعْمٰى فَقَالَ: اَيُّ شَيْءٍ اَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: اَنْ يَرُدَّ اللّٰهُ إِلَيَّ بَصَرِيْ فَاُبْصِرَ النَّاسَ، فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللّٰهُ اِلَيْهِ بَصَرَهُ. قَالَ: فَاَيُّ الْمَالِ اَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: اَلْغَنَمُ، فَاُعْطِيَ شَاةً وَالِدًا. فَاَنْتَجَ هٰذَانِ وَوَلَّدَ هٰذَا، فَكَانَ لِهٰذَا وَادٍ مِنَ الْاِبِلِ، وَلِهٰذَا وَادٍ مِنَ الْبَقَرِ، وَلِهٰذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَمِ.

ثُمَّ اِنَّهُ اَتَى الْاَبْرَصَ فِيْ صُوْرَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِيْنٌ قَدِ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِيْ سَفَرِيْ، فَلَا بَلَاغَ لِيَ الْيَوْمَ اِلَّا بِاللّٰهِ ثُمَّ بِكَ، اَسْاَلُكَ بِالَّذِيْ اَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ،

وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ، وَالْمَالَ، بَعِيْرًا اَتَبَلَّغُ بِهٖ فِيْ سَفَرِيْ ، فَقَالَ : اَلْحُقُوْقُ كَثِيْرَةٌ. فَقَالَ : كَاَنِّيْ اَعْرِفُكَ ، اَلَمْ تَكُنْ اَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيْرًا ، فَاَعْطَاكَ اللّٰهُ!؟ فَقَالَ : اِنَّمَا وَرِثْتُ هٰذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ، فَقَالَ: اِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللّٰهُ اِلٰى مَا كُنْتَ.

وَاَتَى الْاَقْرَعَ فِيْ صُوْرَتِهٖ وَهَيْئَتِهٖ ، فَقَالَ لَهٗ مِثْلَ مَا قَالَ لِهٰذَا ، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ هٰذَا ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَصَيَّرَكَ اللّٰهُ إِلٰى مَا كُنْتَ.

وَاَتَى الْاَعْمٰى فِيْ صُوْرَتِهٖ وَهَيْئَتِهٖ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِيْنٌ وَابْنُ سَبِيْلٍ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِيْ سَفَرِيْ ، فَلَا بَلَاغَ لِي الْيَوْمَ اِلَّا بِاللّٰهِ ثُمَّ بِكَ، اَسْاَلُكَ بِالَّذِيْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً اَتَبَلَّغُ بِهَا فِيْ سَفَرِيْ؟ فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ اَعْمٰى فَرَدَّ اللّٰهُ إِلَيَّ بَصَرِيْ ، فَخُذْ مَا شِئْتَ وَدَعْ مَا شِئْتَ، فَوَاللّٰهِ مَا اَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَيْءٍ اَخَذْتَهٗ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ. فَقَالَ: اَمْسِكْ مَالَكَ فَاِنَّمَا ابْتُلِيْتُمْ، فَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْكَ، وَسَخِطَ عَلٰى صَاحِبَيْكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

«وَالنَّاقَةُ الْعُشَرَاءُ» بِضَمِّ الْعَيْنِ وَفَتْحِ الشِّيْنِ وَبِالْمَدِّ: هِيَ الْحَامِلُ. قَوْلُهٗ: «اَنْتَجَ»، وَفِيْ رِوَايَةٍ: «فَنَتَجَ» مَعْنَاهُ: تَوَلّٰى نِتَاجَهَا، وَالنَّاتِجُ لِلنَّاقَةِ كَالْقَابِلَةِ لِلْمَرْاَةِ. وَقَوْلُهٗ: «وَلَّدَ هٰذَا» هُوَ بِتَشْدِيْدِ اللَّامِ : اَيْ: تَوَلّٰى وِلَادَتَهَا، وَهُوَ بِمَعْنٰى اَنْتَجَ فِي النَّاقَةِ. فَالْمُوَلِّدُ، وَالنَّاتِجُ، وَالْقَابِلَةُ بِمَعْنًى ؛ لٰكِنْ هٰذَا لِلْحَيَوَانِ وَذَاكَ لِغَيْرِهٖ. وَقَوْلُهٗ: «انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ» هُوَ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ: اَيِ الْاَسْبَابُ. وَقَوْلُهٗ: «لَا اَجْهَدُكَ» مَعْنَاهُ: لَا اَشُقُّ عَلَيْكَ فِيْ رَدِّ شَيْءٍ تَاْخُذُهٗ اَوْ تَطْلُبُهٗ مِنْ مَالِيْ. وَفِيْ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ: «لَا اَحْمَدُكَ» بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمِيْمِ ، وَمَعْنَاهُ: لَا اَحْمَدُكَ بِتَرْكِ شَيْءٍ تَحْتَاجُ اِلَيْهِ، كَمَا قَالُوْا: لَيْسَ عَلٰى طُوْلِ الْحَيَاةِ نَدَمٌ، اَيْ عَلٰى فَوَاتِ طُوْلِهَا.

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি বলিতে শুনিয়াছেন যে, বনী ইসরাঈলে তিনজন লোক ছিল, একজন কুষ্ঠরোগী, দ্বিতীয়জন টাকরোগে আক্রান্ত, তৃতীয়জন অন্ধ। আল্লাহ পাক তাহাদিগকে পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা করিলেন এবং একজন ফিরিশতাকে পাঠাইলেন, ফিরিশতা কুষ্ঠরোগীর নিকট আসিয়া বলিলেন, তোমার প্রিয়তম বিষয় কি? সে বলিল, (আমার প্রিয়তম বিষয় হইল) উত্তম বর্ণ ও উত্তম চর্ম এবং এই রোগ হইতে মুক্তি, যাহার কারণে মানুষ আমাকে ঘৃণা করে। ফিরিশতা (আপন হস্ত দ্বারা) তাহার শরীর মুছিয়া দিলেন। ফলে তাহার রোগ দূর হইয়া গেল এবং উত্তম বর্ণ ও উত্তম চর্ম লাভ হইল। ফিরিশতা জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা, কোন সম্পদ তোমার অধিক প্রিয়? সে বলিল, উট। কিংবা বলিল, গরু। (ইহা বর্ণনাকারীর সন্দেহ) তখন তাহাকে একটি গাভিন উটনী দান করা হইল। আর ফিরিশতা বলিলেন, আল্লাহ তোমাকে ইহাতে বরকত দান করুন।

অতঃপর ফিরিশতা টাকমাথাওয়ালার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার প্রিয়তম জিনিস কি? সে বলিল, উত্তম চুল, যাহাতে আমার এই রোগ বিদূরিত হয়, যাহার কারণে মানুষ আমাকে ঘৃণা করিতেছে। ফিরিশতা তাহার (মাথায় হাত) বুলাইয়া দিলেন। ফলে তাহার টাকপড়া রোগ দূর হইল এবং তাহাকে উত্তম চুল দান করা হইল। ফিরিশতা জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন ধরনের সম্পদ তোমার অধিক প্রিয়? সে বলিল, গরু। তখন তাহাকে একটি গাভিন গাভী দান করা হইল। আর ফিরিশতা বলিলেন, আল্লাহ্ তোমাকে ইহাতে বরকত দান করুন।

অতঃপর ফিরিশতা অন্ধের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার প্রিয়তম জিনিস কি? সে বলিল, (আমার প্রিয়তম জিনিস এই যে,) আল্লাহ্ আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া দিবেন, যাহাতে আমি মানুষজন (এবং পৃথিবীর যাবতীয় সৌন্দর্য) দেখিতে পাই। তখন ফিরিশতা তাহার চোখে হাত বুলাইয়া দিলেন, আর আল্লাহ্ তাহার দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া দিলেন। ফিরিশতা জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন ধরনের সম্পদ তোমার অধিক প্রিয়? সে বলিল, বকরী। তখন তাহাকে একটি গাভিন বকরী দান করা হইল। অতঃপর উট ও গাভী বাচ্চা দিতে লাগিল এবং বকরীটিও বাচ্চা দিতে শুরু করিল। ফলে (প্রথম) লোকটির এক মাঠ উট হইল এবং এই (দ্বিতীয়) লোকটির এক মাঠ গরু হইল এবং এই (তৃতীয়) লোকটির এক মাঠ বকরী হইল।

কিছুদিন পর ফিরিশতা একই রূপে ও একই বেশে কুষ্ঠরোগীর নিকট আসিয়া বলিলেন। আমি এক অভাবী মানুষ। আমার সফরের অবলম্বন (ও পাথেয়) শেষ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া অতঃপর তোমার ওছিলা ছাড়া আজ আমার লক্ষ্যে পৌঁছিবার কোন উপায় নাই।

যে আল্লাহ্ তোমাকে উত্তম বর্ণ ও উত্তম চর্ম এবং সম্পদ দান করিয়াছেন তাঁহার দোহাই দিয়া আমি তোমার নিকট একটি উট চাহিতেছি যাহা দ্বারা আমি সফরের প্রয়োজন পুরা করিব। সে বলিল, (অন্যত্র যাও। আমার দিবার মত কিছু নাই। কেননা) দায়-দেনা অনেক।

ফিরিশতা বলিলেন, মনে হয় আমি তোমাকে চিনি। তুমি কি কুষ্ঠরোগী ছিলে না (যাহার কারণে) মানুষ তোমাকে ঘৃণা করিত? আর তুমি কি গরীব ছিলে না, অতঃপর আল্লাহ্ তোমাকে সম্পদ দান করিয়াছেন? সে বলিল, (না, কক্ষণো নহে) এই মাল তো আমি বংশ পরম্পরায় লাভ করিয়াছি। ফিরিশতা বলিলেন, তোমার দাবী যদি মিথ্যা হয় তবে আল্লাহ্ তোমাকে যেমন ছিলে তেমনই যেন করিয়া দেন।

অতঃপর ফিরিশতা একই রূপে ও একই বেশে টাকমাথাওয়ালার নিকট আসিয়া একই কথা বলিলেন, সেও একই উত্তর দিল। তখন ফিরিশতা বলিলেন, তুমি যদি মিথ্যাবাদী হও তবে আল্লাহ্ তোমাকে যেমন ছিলে তেমনই যেন করিয়া দেন।

অতঃপর ফিরিশতা একই রূপে ও একই বেশে অন্ধ লোকটির নিকট আসিয়া বলিলেন, আমি এক অভাবী মুসাফির। আমার সফরের অবলম্বন ফুরাইয়া গিয়াছে। সুতরাং আল্লাহ্ ছাড়া অতঃপর তুমি ছাড়া আমার উদ্দেশ্য অর্জনের কোন উপায় নাই। যে আল্লাহ্

তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া দিয়াছেন তাঁহার দোহাই দিয়া তোমার নিকট একটি বকরী চাহিতেছি যাহা দ্বারা আমি সফরের প্রয়োজন পুরা করিব। সে বলিল, সত্যই আমি অন্ধ ছিলাম। আর আল্লাহ্ আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং তোমার যত ইচ্ছা লও আর যত ইচ্ছা রাখিয়া যাও। আল্লাহর কসম। আজ তুমি আল্লাহর নামে যাহা কিছু লইবে উহা সম্পর্কে তোমার সহিত বিবাদ করিব না। ফিরিশতা তখন বলিলেন, তুমি তোমার সম্পদ রাখিয়া দাও। আসলে তোমাদের (তিনজন)কে পরীক্ষা করা হইয়াছে। আল্লাহ্ (তোমার কৃতজ্ঞতাস্বীকার ও দানশীলতার কারণে) তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন আর তোমার সংগীদ্বয়ের প্রতি (তাহাদের না-শোকরি ও কৃপণতার কারণে) অসন্তুষ্ট হইয়াছেন।

(বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

(একই রূপে একই বেশে) ইহার দুইটি অর্থ হইতে পারে। প্রথমতঃ তিনজনের নিকট তাহাদের নিজ নিজ রূপে ও বেশে অর্থাৎ কুষ্ঠরোগীর নিকট কুষ্ঠরোগীর বেশে এবং টাকওয়ালার নিকট টাকওয়ালার বেশে আর অন্ধের নিকট অন্ধের বেশে আসিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ ফিরিশতা তাঁহার আপন বেশে অর্থাৎ প্রথমবার যেই বেশে আসিয়াছিলেন সেই বেশে দ্বিতীয়বার আসিলেন। (তবে প্রথম অর্থটিই অধিক যুক্তিযুক্ত)

প্রথম অর্থ হিসাবে তিনজনের নিকট তাহাদের নিজ নিজ বেশে আগমনের হিকমত এই যে, যেন তাহাকে দেখিয়া তাহাদের পূর্ববর্তী অবস্থা স্মরণ হয় এবং অন্তরে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ জাগ্রত হয়। আর দ্বিতীয় অর্থ হিসাবে ফিরিশতা তাঁহার পূর্ববর্তী বেশে আসিবার হিকমত এই যে, ফিরিশতার পরিচিত চেহারা দেখিয়া বা কণ্ঠস্বর শুনিয়া যেন সে তাহার পূর্ববর্তী ঘটনা স্মরণ করিতে পারে।

তদুপরি ফিরিশতা তাহাদিগকে পূর্ববর্তী অবস্থা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য বলিলেন, মনে হয় তোমাকে আমি চিনি। তুমি কি এমন এমন ছিলে না?

মোটকথা, আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে পরীক্ষায় ফেলিয়া আবার পরীক্ষায় কৃতকার্য হইবার পথ খুলিয়া দিয়াছিলেন। বান্দার প্রতি এমনই মেহেরবান তিনি! কিন্তু প্রথম দুইজন নিজেরাই নিজেদের প্রতি অবিচার করিয়াছে। পক্ষান্তরে তৃতীয়জন পূর্ববর্তী অবস্থা স্মরণ করিয়া শোকর করায় কামিয়াব হইয়াছে।

বস্তুতঃ সর্বযুগেই বান্দাকে পরীক্ষা করিবার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ পাকের এই আদত যে, পরীক্ষার সংগে সংগে কৃতকার্য হইবার উপায়ও তিনি মেহেরবানি করিয়া সামনে তুলিয়া ধরেন। কিন্তু বান্দা নিজেই যদি নিজের উপর অবিচার করে এবং কামিয়াবির উপায় উপেক্ষা করে তবে কাহার দোষ? আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করিয়াছেন—

وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ※

আল্লাহ তাহাদের প্রতি জুলুম করেন নাই বরং তাহারাই নিজেদের উপর জুলুম করিত।

আলোচ্য হাদীছের শিক্ষা এই যে, মানুষের উচিত নেয়ামত লাভের পর বিপদ-মুছীবত ও

কষ্ট-দুর্দশার দিনগুলি বিস্মৃত না হওয়া। বরং ঐ মুহূর্তগুলি স্মরণ করিয়া নেয়ামতের শোকর আদায় করা। কথিত আছে যে, সুলতান মাহমুদের প্রিয় গোলাম আয়ায মাঝে মধ্যে তাহার কামরা বন্ধ করিয়া কি যেন করিত। সুলতান তাহাকে বিষয়টি জিজ্ঞাসা করিলেন। আয়ায তখন বলিল, আপনার নিকট আসিবার পূর্বে আমি খুবই অভাব ও কষ্টের মধ্যে ছিলাম। সেই সময়ের জীর্ণ বস্ত্রগুলি আমি যত্ন করিয়া সিন্ধুকে রাখিয়া দিয়াছি। মাঝে মধ্যে উহা খুলিয়া দেখি যাহাতে বর্তমান নেয়ামতের শোকর আদায় করিতে পারি।

আলোচ্য হাদীছের আরেকটি শিক্ষা এই যে, কৃপণতা মানুষের ধ্বংসের কারণ আর দানশীলতা মানুষের কামিয়াবির উপায়।

আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) বলেন, কৃপণতার স্বভাবই প্রথম দুইজনকে আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার করিতে এবং মিথ্যা বলিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, যাহা তাহাদের জন্য আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টি ও বরবাদি ডাকিয়া আনিয়াছে। পক্ষান্তরে দানশীলতার স্বভাব তৃতীয় ব্যক্তিকে সম্পদের লোভ হইতে মুক্ত থাকিয়া নেয়ামতের শোকর আদায় করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে।

৬৮। নফসকে শাসনে রাখা

اَلسَّابِعُ: عَنْ اَبِيْ يَعْلٰى شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ: مَعْنٰى «دَانَ نَفْسَهُ»: حَاسَبَهَا.

হযরত আবু ইয়ালা শাদ্দাদ বিন আউস (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, সে-ই বুদ্ধিমান যে আপন নফসকে কঠোর প্রহরায় রাখে (এবং নফসকে উহার চাহিদা ও শাহওয়াত হইতে বিরত রাখে।) এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য আমল করে। আর অক্ষম ও নির্বোধ ব্যক্তি সে, যে নফসকে উহার প্রবৃত্তির পিছনে ছাড়িয়া দেয় আর আল্লাহর নিকট বড় বড় আশা করিয়া বসিয়া থাকে।

(তিরমিযি শরীফ)

ফায়দা ঃ

নফসের স্বভাব হইল দমাইয়া রাখিলে দমিয়া থাকা আর প্রশ্রয় দিলে তেজী ও অবাধ্য হওয়া। এইজন্য আলোচ্য হাদীছে নফসের খাহেশাতকে দমন করিয়া রাখিবার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে।

জনৈক বুজুর্গ নফসকে তিরস্কার করিয়া বলিতেছেন—

بالله يا نفس اسمعى و اعقلى + مقالة قد قالها ناصح

لا ينفع الانسان فى قبره + الا التقى و العمل الصالح

আল্লাহর কসম! হে নফস, শুনিয়া রাখ এবং বুঝিয়া লও, উপদেশদাতা এক মূল্যবান উপদেশ দিয়াছেন। কবরে তাকওয়া ও নেক আমল ছাড়া অন্য কিছু মানুষের উপকারে আসিবে না।

এই জন্য আল্লাহ্ওয়ালাগণ প্রতিদিন অন্তত একবার নির্জনে বসিয়া মোরাকাবা করেন এবং সারাদিনের আমল হিসাব করিয়া দেখেন যে, আজ তাহার নফসের দ্বারা কোন গোনাহ হইয়াছে কি না। হইয়া থাকিলে সংগে সংগে তাওবা করেন এবং বিভিন্ন উপায়ে নফসকে শাস্তিদানের ব্যবস্থা করেন। যেমন, আল্লাহর রাস্তায় কিছু দান করা। কিংবা নফসকে অতিরিক্ত ইবাদতে ও মোজাহাদায় লাগাইয়া দেওয়া, যাহাতে নফস আবার ঐ নাফরমানী করিতে সাহসী না হয়।

৬৯। অর্থহীন কথা বা কাজ পরিহার করা

الثَّامِنُ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ » حَدِيْثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ.

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, মানুষের ইসলামের উত্তম গুণ (ও পূর্ণতা) এই যে, সে অপ্রয়োজনীয় বিষয় পরিহার করিয়া চলিবে। (তিরমিযি শরীফ ও অন্যান্য)

ফায়দা ঃ

অর্থাৎ এমন কথা বা কাজ পরিহার করিয়া চলিবে যাহা তাহার দুনিয়ার জন্যও লাভজনক নহে আবার আখিরাতেও ছাওয়াব পাওয়া যাইবে না। হযরত মারূফ কারখী (রহঃ) বলিয়াছেন, বান্দার প্রতি আল্লাহর অসন্তুষ্টির আলামত এই যে, সে অপ্রয়োজনীয় কাজে লিপ্ত আছে। কেননা অপ্রয়োজনীয় কাজে লিপ্ত হইলে প্রয়োজনীয় কাজ ছুটিয়া যাইবে। ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) বলেন, অপ্রয়োজনীয় কথা এই যে, উহা না বলিয়া চুপ থাকিলে তোমার গোনাহ হইত না এবং এখন বা পরে তোমার কোন ক্ষতি হইত না। তিনি আরও বলেন, যদি তুমি অপ্রয়োজনীয় কথায় লিপ্ত হও তবে তুমি তোমার জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট করিলে এবং জিহ্বার আমলের হিসাব দিবার বিপদে পড়িলে। আর তুমি উত্তমের বিনিময়ে অধম গ্রহণ করিলে। কেননা ঐ সময়টুকু আল্লাহর যিকিরে ব্যয় করিলে হয়ত তোমার জন্য আল্লাহর পক্ষ হইতে বিরাট কোন কল্যাণের দরওয়াজা খুলিয়া যাইত।

জনৈক ছুফী কবি বড় সুন্দর বলিয়াছেন–

اغتنم ركعتين فى ظلمة الليـ + ل بل اذا كنت فارغا مستريحا

و اذا ما هممت بالخوض فى البا + طل فاجعل مكانه تسبيحا

যদি আরাম ও অবসর অবস্থায় থাক তবে রাত্রের অন্ধকারে দুই রাকাত নামায গনীমত মনে করিয়া পড়।

আর যখন অনর্থক কিছুতে লিপ্ত হইবার ইচ্ছা কর তখন উহার পরিবর্তে তাসবীহ পাঠে আত্মনিয়োগ কর।

আল্লামা মুহম্মদ বিন আল্লান (রহঃ) বলেন, মানুষ যদি সর্বদা এই চিন্তা করিতে থাকে যে, আমি যাহা কিছু বলি এবং যাহা কিছু করি আল্লাহ পাক তাহা দেখিতেছেন এবং আমার ভাল মন্দ প্রতিটি আমল দুই কাঁধের ফিরিশতা লিখিয়া রাখিতেছেন। সুতরাং সারা জীবনের প্রতিটি

কথা ও কাজের হিসাব দিতে হইবে। তদ্রূপ মানুষ যদি সর্বদা এই চিন্তা করিতে থাকে যে, মউত কখন আসিয়া পড়িবে জানা নাই। মউত আসিবার সংগে সংগে নেক আমল বন্ধ হইয়া যাইবে। সুতরাং যত নেক আমল করা সম্ভব এখনই করিয়া লওয়া উচিত। এই ধরণের চিন্তা যাহার অন্তরে থাকিবে তাহার অংগ প্রত্যংগ হইতে কখনই গোনাহর কাজ দূরের কথা অনর্থক কোন কাজও হইতে পারে না। তদ্রূপ তাহার জিহ্বা হইতেও গোনাহের কথা দূরে থাকুক অনর্থক কোন কথাও বাহির হইতে পারে না।

৭০। স্ত্রীর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা

التَّاسِعُ : عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيْمَ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ.

হযরত ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, স্বামী তাহার স্ত্রীকে কি কারণে প্রহার করিল তাহা জিজ্ঞাসা করা হইবে না।

(আবু দাউদ শরীফ ও অন্যান্য)

ফায়দা ঃ

কেননা হইতে পারে যে, প্রহারের কারণটি একান্তই ব্যক্তিগত যাহা প্রকাশ করা লজ্জার ব্যাপার। তাই বিষয়টি আল্লাহর হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। সুতরাং স্বামীর উচিত হইবে, এই বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করিয়া চলা। স্বামী যদি অন্যায় ও না-হকভাবে স্ত্রীকে প্রহার করে তবে কিয়ামতের দিন তাহাকে কঠিন আযাব ভোগ করিতে হইবে। কেননা আল্লাহ তাহাকে হুকুম করিয়াছিলেন وَ عَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ (তাহাদের সহিত উত্তম আচরণ কর) আর সে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর হুকুম লংঘন করিয়াছে।

আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের শেষ উপদেশদানকালে বলিয়াছেন, তোমাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। কেননা আল্লাহর নামে তোমরা তাহাদিগকে হালাল করিয়াছ।

অতি নারীদরদী অনেকে অবশ্য স্বামী কতৃক স্ত্রীকে প্রহার ও শাসনের বিষয়টি মানিয়া লইতে চাহেন না। কিন্তু সর্বপ্রথম মনে রাখিতে হইবে যে, ইহা আল্লাহর বিধান যিনি স্বয়ং পুরুষজাতি ও স্ত্রীজাতি– উভয়ের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। অতি নারীদরদীরা স্ত্রীজাতির স্রষ্টাও নহে, প্রতিপালকও নহে। সুতরাং তাহাদের দরদ অধিক হওয়া সম্ভব নহে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করিতেছেন–

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّ بِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ وَ الّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَ اهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوْهُنَّ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا *

পুরুষগণ স্ত্রীজাতির উপর কর্তৃত্বের অধিকারী। এই জন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন..............আর যাহাদের অবাধ্যতার আশংকা কর তাহাদিগকে (প্রথমে)

সদুপদেশ দাও। (যদি ইহাতেও তাহাদের পরিবর্তন না হয় তবে) তাহাদের শয্যা ত্যাগ কর, এবং (ইহাতেও যদি সংশোধন না হয় তবে প্রয়োজন পরিমাণ) প্রহার কর। ইহাতে যদি তাহারা অনুগত হইয়া যায় তবে তাহাদিগকে কষ্ট দিবার উপায় খুঁজিও না।

দ্বিতীয়তঃ পরিবার একটি প্রতিষ্ঠান। আর যে কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য একজন পরিচালক আবশ্যক, যাহাকে প্রতিষ্ঠানের ছোট বড় সকল সদস্য মান্য করিয়া চলিবে এবং অবাধ্যতার ক্ষেত্রে পরিচালকের হাতে শাসনক্ষমতাও থাকিবে। অন্যথায় প্রতিষ্ঠানের ধ্বংস অনিবার্য। পাশ্চাত্যে পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানের বর্তমান বিপর্যয়দশার কারণ এইখানেই খুঁজিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ ইসলাম একদিকে অনন্যোপায় অবস্থার জন্য পুরুষের হাতে শাসনক্ষমতা যেমন দিয়াছে তেমনি অপরদিকে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের পক্ষ হইতে স্ত্রীদের প্রতি সদয় আচরণের জোর তাকীদও দেওয়া হইয়াছে বার বার। তাহাছাড়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদর্শ স্বামীর আচরণ কিরূপ হইতে পারে উহার নমুনাও রাখিয়া গিয়াছেন উম্মতের সামনে। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিয়াছেন–

خيركم خيركم لاهله و انا خيركم لاهلى *

তোমাদের মাঝে সেই সর্বোত্তম যে আপন স্ত্রীর নিকট সর্বোত্তম। আর আমি তোমাদের মাঝে আপন স্ত্রীর নিকট সর্বোত্তম।

বস্তুতঃ যাহারা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত তরীকায় জীবন যাপন করিয়া থাকেন তাহাদের পারিবারিক জীবনের খোঁজ লইয়া দেখুন; স্ত্রীর হক তাহারা কিরূপ আদায় করিয়া থাকেন। আর নাইট ক্লাবসহ যাবতীয় নরক কাহারা গুলজার করিয়া রাখেন!

মোটকথা, ইসলাম যেহেতু পূর্ণাংগ মানবধর্ম, যাহা স্বয়ং আল্লাহ পাক নাযিল করিয়াছেন সেহেতু ইহার প্রতিটি বিধান অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ ও যুক্তিনির্ভর। ভাবাবেগ তাড়িত নহে। তাই পরিবার-প্রতিষ্ঠানের স্থিতি ও কল্যাণের স্বার্থে পুরুষকে যেমন শাসক ও পরিচালকের মর্যাদা দান করা হইয়াছে তদ্রূপ আল্লাহ ও রাসূল তাহাকে পারিবারিক জীবনে কোমল, বিনয়ী, দরদী ও সহনশীল হইবার নির্দেশ দান করিয়াছেন। ইহার চাইতে উত্তম পরিবার ব্যবস্থা মানব সভ্যতার ইতিহাসে কখনো ছিল না, কখনো হইবে না।

তবে বিচারকার্যের জন্য প্রয়োজন হইলে সুবিচারের স্বার্থে প্রহারের কারণ অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হইবে এবং স্বামীকে তখন সন্তোষজনক জওয়াব দিতে হইবে।

অধ্যায় – ৬

তাকওয়া ও পরহেযগারী

তাকওয়া অর্থ আল্লাহর আযাবের ভয়ে যাবতীয় নিষেধ পরিহার করিয়া চলা এবং তাঁহার সন্তুষ্টির আশায় যাবতীয় আদেশ মানিয়া চলা। এইভাবে যে জীবন যাপন করে সেই হইল মুত্তাকী বা পরহেযগার। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) কে তাকওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, যদি তুমি কাঁটাবনে হাঁট তবে কি করিবে? প্রশ্নকারী বলিল, খুব সতর্কতা

অবলম্বন করিব, যাহাতে কাঁটা না বিঁধে। তিনি বলিলেন, দুনিয়ার কাঁটাবনে সর্বদা এইভাবে চলিবে। ইহাই হইল তাকওয়া। তাকওয়ার প্রশংসা করিয়া আল্লাহ পাক ইরশাদ করিয়াছেন–

إِنْ تَصْبِرُوْا وَ تَتَّقُوْا فَإِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ *

যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর ও তাকওয়া অবলম্বন কর তবে নিঃসন্দেহে উহা বিরাট বিষয়।

মুত্তাকীদের জন্য শত্রু হইতে হিফাযতের ওয়াদাসহ ইরশাদ হইয়াছে–

إِنْ تَصْبِرُوْا وَ تَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا *

যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তবে তাহাদের চক্রান্ত তোমাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।

মুত্তাকীদিগকে আল্লাহর সাথীত্বের সুসংবাদ দান করিয়া ইরশাদ হইয়াছে-

إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَ الَّذِيْنَ هُمْ مُحْسِنُوْنَ *

আল্লাহ ঐ লোকদের সংগে রহিয়াছেন যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যাহারা সৎ কর্মশীল।

তদুপরি বিপদ হইতে মুক্তি এবং হালাল রিযিকের ওয়াদা রহিয়াছে কিতাবে বর্ণিত পঞ্চম আয়াতে। হযরত আবু যর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তিলাওয়াত করিয়া বলিলেন, হে আবু যর! যদি সমস্ত মানুষ এই আয়াতের উপর আমল করিত তবে ইহা তাহাদের জন্য যথেষ্ট হইত।

তাহাছাড়া আমল সংশোধন করা এবং গোনাহ মাফ করিবার ওয়াদা রহিয়াছে কিতাবে বর্ণিত চতুর্থ আয়াতে এবং দ্বিগুণ রহমত এবং নূরের ওয়াদা রহিয়াছে এই আয়াতে–

وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ *

তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁহার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর; তিনি তাঁহার অনুগ্রহে তোমাদিগকে দিবেন দ্বিগুণ পুরস্কার এবং তিনি তোমাদিগকে দিবেন আলো, যাহার সাহায্যে তোমরা চলিবে।

কবুলিয়াতের ওয়াদা করা হইয়াছে এই আয়াতে–

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ *

আল্লাহ মুত্তাকীদের নিকট হইতেই শুধু কবুল করেন।

এবং আল্লাহর নিকট অশেষ মর্যাদা ও সম্মান লাভের সুসংবাদ রহিয়াছে এই আয়াতে–

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقٰكُمْ *

নিঃসন্দেহে তোমাদের মাঝে সর্বাধিক মুত্তাকী ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সম্মানের অধিকারী।

এবং মুত্তাকীদের প্রতি আল্লাহর মুহব্বতের ঘোষণা রহিয়াছে এই আয়াতে–

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ *

নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদিগকে ভালবাসেন

এবং নির্ভয় ও নিশ্চিন্ততার এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সুসংবাদ রহিয়াছে এই আয়াতে–

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ * اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ كَانُوْا يَتَّقُوْنَ * لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِى الْاٰخِرَةِ *

শোন, নিঃসন্দেহে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা চিন্তাগ্রস্ত হইবে না। যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করিত তাহাদের জন্য রহিয়াছে দুনিয়া ও আখিরাতের সুসংবাদ।

তাফসীরুল বায়যাবীতে বলা হইয়াছে যে, তাকওয়ার বিভিন্ন স্তর রহিয়াছে। প্রথমতঃ শিরক হইতে মুক্ত থাকিবার মাধ্যমে চিরস্থায়ী আযাব হইতে নিজেকে রক্ষা করা। নীচের আয়াতে তাকওয়া শব্দ দ্বারা ইহাই উদ্দেশ্য।

وَ اَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى *

তাহাদের জন্য তাকওয়া (অর্থাৎ তাওহীদ)-এর কালিমা আবশ্যকীয় করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ যে কোন গোনাহ পরিহার করা। এমন কি কোন কোন আলিমের মতে ছগীরা গোনাহও পরিহার করা। শরীয়তের পরিভাষায় তাকওয়া দ্বারা সাধারণতঃ ইহাই উদ্দেশ্য। নীচের আয়াতে এই তাকওয়ারই কথা বলা হইয়াছে–

وَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَاءِ *

যদি সেই সকল জনপদের অধিবাসীগণ ঈমান আনিত ও তাকওয়া অবলম্বন করিত তবে তাহাদের জন্য আসমান ও যমিনের কল্যাণ উন্মুক্ত করিতাম।

তৃতীয়তঃ অন্তরকে হক ও সত্য হইতে বিমুখকারী সকল বিষয় হইতে বাঁচাইয়া রাখা এবং পূর্ণমাত্রায় হক ও সত্যের প্রতি নিবেদিত হওয়া। ইহাই হইল আসল তাকওয়া এবং নীচের আয়াতে এই প্রকার তাকওয়া অবলম্বনেরই কথা বলা হইয়াছে।

وَ اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ *

আল্লাহকে ভয় কর যেমন ভয় করা উচিত।

আয়াতসমূহ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ *

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর যেমন তাঁহাকে ভয় করা উচিত।

আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন–

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (وَ اسْمَعُوْا وَ اَطِيْعُوْا وَ اَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ وَ مَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ *)

(আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর) এবং (তাঁহার আদেশ নিষেধ) শোনো ও মান্য কর এবং (আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর। ইহা তোমাদের জন্য মংগলজনক হইবে। আর যাহাকে তাহার স্বভাবকৃপণতা হইতে রক্ষা করা হইবে সে সফলকাম হইবে। (এই আয়াত দ্বারা প্রথম আয়াতের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হইয়াছে।)

আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَ قُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا * (يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا *)

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের আমল সংশোধন করিয়া দিবেন এবং তোমাদের গোনাহ সমূহ মাফ করিয়া দিবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করিবে সে বিরাট কামিয়াব হইবে।

আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন–

وَ مَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ *

যে আল্লাহকে ভয় করিবে আল্লাহ তাহার জন্য (দুনিয়া ও আখেরাতের বিপদ মুছীবত হইতে) উদ্ধার লাভের উপায় করিয়া দিবেন এবং তাহাকে তাহার ধারণাতীত উপায়ে রিযিক দান করিবেন।

اِنْ تَتَّقُوْا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ، وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ *

যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে তিনি তোমাদিগকে 'ফোরকান' দান করিবেন এবং তোমাদের পাপ মোচন করিবেন এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহকারী।

ফায়দা ঃ

কিতাবে বর্ণিত প্রথম আয়াতে বলা হইয়াছে اتقوا الله حق تقاته। আল্লাহকে ভয় কর যেমন ভয় করা উচিত। অর্থাৎ তাহাকে যথাযোগ্যভাবে ভয় কর। ইহার ব্যাখ্যায় ইমাম হাকিম একটি মরফু হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন–

بان يطاع فلا يعصى، و يذكر فلا ينسى و يشكر فلا يكفر *

অর্থাৎ এমনভাবে আল্লাহর আনুগত্য করিবে যে, কখনো নাফরমানি হইবে না এবং এমনভাবে তাঁহাকে স্মরণ করিবে যে, কখনো ভুলিবে না এবং এমনভাবে তাহার শোকর করিবে

যে, কখনই কোন না-শোকরি করিবে না।

বাহ্যতঃ এই ধরনের যথাযোগ্য তাকওয়া অবলম্বন করা মানুষের সাধ্যাতীত ব্যাপার। তাই এই আয়াত নাযিল হইবার পর ছাহাবা কেরাম ভীষণ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ধরনের তাকওয়া আমাদের মাঝে কে অবলম্বন করিতে পারিবে?

তখন যথাযোগ্য তাকওয়ার উদ্দেশ্য বর্ণনা পূর্বক فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ আয়াতটি নাযিল হয়। অর্থাৎ যথাযোগ্য তাকওয়া অবলম্বনের অর্থ হইল যথাসাধ্য তাকওয়া অবলম্বন করা।

বান্দা যদি যথাসাধ্য তাকওয়া অবলম্বন করে তবে আল্লাহ পাক মেহেরবান হইয়া ধরিয়া লইবেন যে, বান্দা যথাযোগ্য তাকওয়া অবলম্বন করিয়াছে। মোটকথা, প্রথম আয়াতে আল্লাহ পাকের হক হিসাবে তাকওয়ার স্তর বর্ণনা করা হইয়াছে। আর দ্বিতীয় আয়াতে বান্দার সাধ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাকওয়ার আদেশ করা হইয়াছে।

(তৃতীয় আয়াতে) قول سديد অর্থ এমন কথা যাহার সত্যতায় মিথ্যার নামগন্ধও নাই এবং এমন সঠিক যাহাতে ভুলের নামগন্ধও নাই এবং এমন গাম্ভীর্যপূর্ণ যাহাতে রসিকতার নামগন্ধও নাই এবং এমন কোমল যাহা হৃদয়বিদারক নহে। এই ব্যাখ্যা দিয়াছেন রুহুল মাআনী গ্রন্থে আল্লামা আলুসী (রহঃ)।

আলোচ্য আয়াতের আসল হুকুম হইল তাকওয়া অবলম্বন করা যাহার অর্থ শরীয়তের যাবতীয় আদেশ নিষেধ পালন করা। ইহা অতি কঠিন কাজ। তাই আল্লাহ পাক পরবর্তীতে এমন একটি বিশেষ কাজের আদেশ দান করিয়াছেন যাহা পূর্ণাংগ তাকওয়া হাছিলের পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক। উহা হইল জিহ্বাকে সংশোধন করা অর্থাৎ সরল সত্য কথা বলা এবং অন্যায় ও অসত্য কথা হইতে বিরত থাকার অভ্যাস গড়িয়া তোলা। ইহা তাকওয়ারই অংশ, কিন্তু এমন মহাগুরুত্বপূর্ণ যাহা হাছিল হইয়া গেলে পূর্ণাংগ তাকওয়া আপনা আপনি হাছিল হইতে থাকে। এই জন্যই হাদীছ শরীফে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, নিজের জিহ্বাকে সংযত কর এবং বেশী সময় ঘরে অবস্থান কর।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) ছাফা মারওয়ার মাঝে ছাঈ করা অবস্থায় একবার আপন জিহ্বাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছিলেন, হে জিহ্বা! উত্তম কথা বল; উপকার পাইবে এবং মন্দ কথা হইতে নিরব থাক; নিরাপদে থাকিবে। অন্যথায় লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইবে। ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) বলেন, জিহ্বা আকার অবয়বে ক্ষুদ্র, কিন্তু ইহার আনুগত্য ও অবাধ্যতা খুবই বড়। এমন কি ঈমান ও কুফর যাহা আনুগত্য ও অবাধ্যতার দুই চূড়ান্ত সীমায় অবস্থিত তাহা এই জিহ্বা দ্বারাই প্রকাশ পায়।

মোটকথা আলোচ্য আয়াতে তাকওয়া অবলম্বনের আদেশ এবং উহা হাছিল করিবার উপায় এবং উহার পুরস্কারের কথা বলা হইয়াছে।

চতুর্থ আয়াতের শানেনুযূল সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, সালিম বিন আওফ বিন মালিক আশজাঈ (রাঃ) শত্রুদের হাতে বন্দী ছিলেন। তাঁহার পিতা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে আসিয়া ফরিয়াদ করিলেন। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং বেশী বেশী لا حول و لا قوة الا بالله পড়। আওফ বিন মালিক (রাঃ) তাহাই করিলেন।

পরবর্তীতে তিনি তাঁহার বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। এমন সময় তাঁহার পুত্র হযরত সালিম (রাঃ) একশত উটসহ দরওয়াজায় আসিয়া আওয়াজ দিলেন। শত্রুর অসতর্কতার সুযোগে তিনি এইগুলিসহ পলাইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল হইয়াছিল।

(পঞ্চম আয়াত) فرقان এর শাব্দিক অর্থ দুইটি বস্তুর মাঝে পার্থক্য চিহ্নিতকারী। কোরআনকে এই জন্য ফোরকান বলা হয় যে, উহা হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য চিহ্নিতকারী। আল্লাহর সাহায্যকেও ফোরকান বলা হয়। কেননা উহা দ্বারা হকপন্থীদের জয় এবং বাতিলপন্থীদের পরাজয় সম্পন্ন হয়। ফলে হক ও বাতিল পৃথক হইয়া যায়।

তাকওয়া অবলম্বনের পুরস্কার স্বরূপ ফোরকান দান করিবার অর্থ অধিকাংশ মুফাসসিরীনের মতে আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হইতে সাহায্য ও মদদ করা এবং হিফাযত করা। ফলে শত্রুদের উপর তাহারা বিজয়ী হয় এবং যাবতীয় অনিষ্ট হইতে নিরাপদ হয় এবং তাহাদের যাবতীয় মকসুদ হাছিল হয়।

কোন কোন তাফসীর মতে ফোরকান অর্থ আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা যাহা দ্বারা মানুষ হক ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যার মাঝে সহজেই পার্থক্য করিতে এবং হক ও সত্যকে অনুসরণ করিতে পারে।

তাকওয়া অবলম্বনের দ্বিতীয় সুফল হইল পাপমোচন। অর্থাৎ মানবীয় দুর্বলতাবশতঃ যে সকল ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটিয়া যায়, সেইগুলি মুছিয়া ফেলিবার জন্য নেক আমলের তাওফিক দান করা হয়। যেমন অন্য আয়াতে আছে—

إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ *

নিশ্চয় নেক আমল গোনাহ্কে বিদূরিত করে।

তাকওয়ার তিনটি প্রতিদান উল্লেখ করিবার পর وَ اللّٰهُ ذُوْ الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ (আল্লাহ মহান করুণার অধিকারী) বলিয়া এই দিকে ইংগিত করা হইয়াছে যে, বান্দা আমলের যে সাধারণ প্রতিদান লাভ করিয়া থাকে, সেই হিসাবে উল্লেখিত তিনটি প্রতিদান হইল আমলের সাধারণ প্রতিদান। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহের কোন সীমা পরিসীমা নাই।

সুতরাং মুত্তাকীদের কর্তব্য হইল উপরোক্ত তিনটি প্রতিদান ছাড়াও আল্লাহ্ পাকের নিকট আরও বহু দান ও প্রতিদানের আশা রাখা।

হাদীসসমূহ

৭১। সম্মান ও মর্যাদার মাপকাঠি তাকওয়া

وَاَمَّا الْاَحَادِيْثُ فَالْاَوَّلُ: عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَكْرَمُ النَّاسِ ؟ قَالَ: «اَتْقَاهُمْ». فَقَالُوْا: لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْاَلُكَ، قَالَ: «فَيُوْسُفُ نَبِيُّ اللّٰهِ بْنُ نَبِيِّ اللّٰهِ بْنِ نَبِيِّ اللّٰهِ بْنِ خَلِيْلِ اللّٰهِ» قَالُوْا: لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْاَلُكَ، قَالَ: «فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْاَلُوْنِيْ؟ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْاِسْلَامِ اِذَا فَقِهُوْا»

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَ«فَقُهُوا» بِضَمِّ الْقَافِ عَلَى الْمَشْهُوْرِ، وَحُكِيَ كَسْرُهَا، اَيْ : عَلِمُوْا اَحْكَامَ الشَّرْعِ .

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সর্বাধিক সম্মানিত লোক কে? তিনি বলিলেন, যিনি সর্বাধিক মুত্তাকি (তিনিই সর্বাধিক সম্মানিত।) ছাহাবা কেরাম আরয করিলেন, আমরা এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি নাই। তিনি বলিলেন, তবে তিনি হইলেন ইউসুফ। (কেননা তিনি) আল্লাহর খলীল (হযরত ইবরাহীম আঃ) এর পুত্র (হযরত ইসহাক আঃ) এর পুত্র (হযরত ইয়াকুব আঃ) এর পুত্র। তাঁহারা আরয করিলেন, আমরা এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি নাই। তিনি বলিলেন, তবে কি তোমরা আরব গোত্রগুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছ? (তাঁহারা বলিলেন, হ্যাঁ, তিনি বলিলেন, তবে শোন,) জাহেলিয়াত যুগের উত্তম ব্যক্তিরাই ইসলাম-পরবর্তী যুগে উত্তম হইবে যদি তাহারা শরীয়তের আহকাম ও বিধান সম্পর্কে ইলম হাছিল করে। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল যে, মানুষের মাঝে সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি কে? তখন তিনি তাহাদিগকে বলিলেন যে, তাকওয়াই হইল সম্মানের মাপকাঠি। সুতরাং যিনি সর্বাধিক মুত্তাকী তিনিই সর্বাধিক সম্মানিত।

হাদীছের মূল শব্দ হইল اكرم যাহার ধাতুমূল হইল كرم -আর كرم -এর মূল অর্থ হইল কল্যাণ প্রাচুর্য। সুতরাং হাদীছের অর্থ এইরূপ দাঁড়ায়। যিনি সর্বাধিক মুত্তাকী, তিনিই সর্বাধিক কল্যাণের অধিকারী। কেননা দুনিয়া আখিরাতে যাবতীয় কল্যাণের উৎস হইল তাকওয়া। আর আল্লাহ পাক ইরশাদ করিয়াছেন–

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ *

তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম মুত্তাকী আল্লাহর নিকট তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম সম্মানের অধিকারী।

যখন ছাহাবা কেরাম আরয করিলেন যে, তাকওয়ার মাপকাঠিতে সম্মানের বিষয়টি জানা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তখন তিনি সম্মানের অন্য একটি দিক তুলিয়া ধরিলেন এবং বলিলেন, হযরত ইউসুফ (আঃ) হইলেন সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী। কেননা এক দিকে তিনি মহত্তম চরিত্রের অধিকারী। তদুপরি অত্যুচ্চ বংশ মর্যাদার অধিকারী। কেননা তিনি স্বয়ং আল্লাহর নবী এবং আল্লাহর খলীল হযরত ইবরাহীম (আঃ) হইতে শুরু করিয়া পরপর তিনজন নবীর বংশধর। যখন ছাহাবা কেরাম আরয করিলেন, যে এই প্রকার সম্মানও তাহাদের জিজ্ঞাস্য নহে। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, আরবদের গোত্রগুলির মর্যাদা সম্পর্কে তাঁহারা জানিতে চাহিতেছেন, তখন তিনি উপরোক্ত উত্তর দিলেন, যাহার সারমর্ম হইল–

বংশীয় গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য বংশ পরম্পরায় স্থানান্তরিত হইয়া থাকে। ইহাতে কোন ধর্ম বা জাতির বিশেষত্ব নাই। তবে অজ্ঞানতা ও মুর্খতার কারণে তাহা চাপা পড়িয়া থাকে। সুতরাং

দ্বীন ও শরীয়তের ইলম ও আমল দ্বারা মুর্খতা ও অজ্ঞানতা যখন দূর হইয়া যাইবে তখন জাহেলী যুগের শ্রেষ্ঠ গুণের অধিকারীরাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইবে। এই নববী বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হইয়াছে। তাই দেখা যায়; হযরত আবু বকর (রাঃ) জাহেলী যুগেও কোরায়শের শ্রেষ্ঠদের মাঝে গণ্য ছিলেন। তদ্রূপ হযরত উছমান (রাঃ) এতই পূত পবিত্র জীবন যাপন করিতেন যে, জাহেলী যুগেও তিনি মদ স্পর্শ করেন নাই। হযরত খালেদ (রাঃ) শিরকের অবস্থায়ও কোন যুদ্ধে পরাজিত হন নাই। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁহারাই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের আসন অলংকৃত করিয়াছিলেন। অন্যান্য ছাহাবা কেরাম সম্পর্কেও একই কথা।

কাযি ইয়ায (রহঃ) বলেন, উত্তরত্রয়ের সারকথা এই যে, সকল প্রকার সম্মানেরই মুল হইল দ্বীন, তথা তাকওয়া, নবুওয়াত এবং শরীয়তের আহকাম ও বিধান সম্পর্কিত জ্ঞান।

৭২। নারীর মোহ বড় ফিতনা

اَلثَّانِيْ : عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَاِنَّ اللّٰهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ، فَاتَّقُوْا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ؛ فَاِنَّ اَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। দুনিয়া মিষ্ট ও সবুজ। আর আল্লাহ তোমাদিগকে দুনিয়াতে খলিফা ও প্রতিনিধি রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি দেখিতে চাহেন যে, তোমরা কেমন আমল কর। সুতরাং দুনিয়া সম্পর্কে সতর্ক থাকিও এবং নারীদের সম্পর্কেও সতর্ক থাকিও। কেননা বনী ইসরাঈলের সর্বপ্রথম ফিতনা নারীকে কেন্দ্র করিয়াই হইয়াছিল।

(মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

(দুনিয়া মিষ্ট ও সবুজ) দুনিয়াকে এমন মিষ্ট ফলের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, যাহার বর্ণ সবুজ। কেননা মিষ্টতা স্বাদের দিক হইতে প্রিয় আর সবুজ বর্ণ দৃষ্টিনন্দন হইবার কারণে প্রিয়। এইভাবে উহাতে প্রিয়তার দুইটি দিক একত্র হইয়াছে। সুতরাং অর্থ এই দাঁড়াইল যে, সবুজ ও মিষ্ট ফল যেমন অতিপ্রিয় তদ্রূপ দুনিয়াও বাহ্যত অতিপ্রিয়। কিন্তু পঁচনশীল হইবার কারণে ফলের স্বাদ ও বর্ণ যেমন ক্ষণস্থায়ী তদ্রূপ হাকীকতের দিকে নযর করিলে এই দুনিয়া এবং তাহার রঙ্গ-রস ও আনন্দ জৌলুসও ক্ষণস্থায়ী। হয় দুনিয়া তোমার হাতছাড়া হইয়া যাইবে কিংবা তুমি দুনিয়া ছাড়িয়া কবরে চলিয়া যাইবে।

(দুনিয়া ও নারী সম্পর্কে সতর্ক থাকিও) অর্থাৎ দুনিয়ার মোহ কিংবা নারীর মোহ যেন আল্লাহর আদেশ পালনে এবং তাঁহার নিষেধ পরিহারকরণে বিঘ্ন না ঘটায় এবং আল্লাহর মুহব্বত হইতে দূরে সরাইয়া না দেয়।

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, 'নারীরমোহ' দ্বারা পরনারী ও আপন স্ত্রী উভয়ই উদ্দেশ্য। বরং আপন স্ত্রীর ফিতনা অধিকতর গুরতর। কেননা পরনারীর মোহ ক্ষণস্থায়ী। পক্ষান্তরে স্ত্রীর মোহ স্থায়ী।

(**বনী ইসরাইলের সর্বপ্রথম ফিতনা**) সম্ভবতঃ এখানে হারুত মারুতের ঘটনার দিকে ইংগিত করা হইয়াছে। কেননা এই ফিরিশতাদ্বয় বনী ইসরাঈলের এক নারীর মোহে পড়িয়াই কর্তব্যবিচ্যুত হইয়া শাস্তি লাভ করিয়াছিল। তদ্রূপ বিলআম বিন বাউরা-এর ঘটনার দিকেও ইংগিত হইতে পারে। কেননা সে আপন স্ত্রীর মোহমুগ্ধ ও বশীভূত হইবার কারণেই ধ্বংস হইয়াছিল। তাহাছাড়া যুগে যুগে পৃথিবীর বহু বরেণ্য ব্যক্তির পদস্খলন ও ধ্বংস সাধিত হইয়াছে নারী-আসক্তিরই কারণে। আল্লাহ আমাদের সকলকে এই দুই ফিতনা হইতে হিফাযত করুন। আমীন।

৭৩। সর্বদা যে দু'আ করা কর্তব্য

اَلثَّالِثُ: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ: «اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَسْاَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দু'আ করিতেন—

اللهم انى اسألك الهدى و التقى و العفاف و الغنى *

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট হিদায়াত, তাকওয়া, চারিত্রিক শুচিতা ও অমুখাপেক্ষিতা প্রার্থনা করিতেছি। (মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

এই সকল বিষয় পূর্ব হইতেই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাছিল ছিল। তদুপরি প্রার্থনার অর্থ হইল প্রতিনিয়ত উচ্চতর স্তর লাভের প্রার্থনা। অর্থাৎ হে আল্লাহ! হেদায়াত, তাকওয়া, চারিত্রিক শুচিতা ও অমুখাপেক্ষিতা— এই সকল ক্ষেত্রে আমার উন্নতি অব্যাহত রাখ এবং উচ্চ হইতে উচ্চতর মর্তবা দান করিতে থাক।

আরেকটি উদ্দেশ্য হইল উম্মতের অন্তরে এই সকল বিষয়ের গুরুত্ব পয়দা করা এবং আল্লাহর নিকট এই সকল বিষয় প্রার্থনা করিতে উদ্বুদ্ধ করা।

৭৪। মন্দ বিষয়ে কসম করিবার হুকুম

اَلرَّابِعُ: عَنْ اَبِيْ طَرِيْفٍ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ الطَّائِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ ثُمَّ رَاٰى اَتْقٰى لِلّٰهِ مِنْهَا فَلْيَاْتِ التَّقْوٰى» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত 'আদী বিন হাতিম (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে কসম করে, অতঃপর অন্য বিষয়কে উক্ত কসমকৃত বিষয় হইতে অধিক তাকওয়াপূর্ণ দেখিতে পায় তখন তাহার কর্তব্য হইল তাকওয়াপূর্ণ বিষয়টি গ্রহণ করা। (মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

অর্থাৎ যদি কেহ কোন কাজ করিবে কিংবা করিবে না বলিয়া কসম করে অথচ দেখা গেল যে, কসম অব্যাহত রাখিলে গোনাহ হইবে। বরং উহার বিপরীত কাজটিই হইল তাকওয়ার দাবী, তখন কসম ভংগ করিয়া বিপরীত কাজটি করাই কর্তব্য। যেমন কেহ কসম করিল যে, নামায তরক করিবে কিংবা মদ পান করিবে কিংবা কোন মুসলমানের সহিত কথা বলিবে না ইত্যাদি, তবে কসম ভংগ করা এবং উহার কাফ্ফারা আদায় করা অবশ্যকর্তব্য। যদি কোন মোস্তাহাব তরক করিবার কিংবা কোন মাকরূহে তানযিহী করিবার কসম করে তবে কসম ভংগ করিয়া বিপরীত কাজটি করা মুস্তাহাব হইবে।

কাফ্ফারার কথা এই হাদীছে নাই, তবে মুসলিম শরীফে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীছে আছে–

من حلف على يمين فرآى غيرها خيرا منها فليأت بالذى هو خير و ليكفر عن يمينه *

যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে কসম করে অতঃপর অন্য বিষয়কে উক্ত কসমকৃত বিষয় হইতে উত্তম মনে করে তবে তাহার কর্তব্য হইল উত্তম বিষয়টি গ্রহণ করা এবং কসমের কাফ্ফারা আদায় করা।

কসমের কাফ্ফারা হইল তিনজন মিসকিনকে মধ্যম পর্যায়ের খাবার কিংবা পোশাক দান করা।

৭৫। জান্নাতে দাখেল হইবার শর্ত

اَلْخَامِسُ: عَنْ أَبِي أُمَامَةَ صُدَيِّ بْنِ عَجْلَانَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ فِيْ حِجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ: «اتَّقُوْا اللّٰهَ، وَصَلُّوْا خَمْسَكُمْ، وَصُوْمُوْا شَهْرَكُمْ، وَأَدُّوْا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، وَأَطِيْعُوْا أُمَرَاءَكُمْ، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، فِيْ أٰخِرِ كِتَابِ الصَّلَاةِ وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিদায় হজ্জে খোতবা দিতে শুনিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড় এবং তোমাদের রমাযান মাসে রোযা রাখ এবং তোমাদের মালের যাকাত দান কর এবং তোমাদের শাসকদের আনুগত্য কর তবে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের জান্নাতে প্রবেশ করিবে। (তিরমিযি শরীফ)

ফায়দা ঃ

যেহেতু সমস্ত আমলের মাঝে তাকওয়াই হইল আসল সেহেতু প্রথমে উহার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

(তোমাদের রমযান মাস) এই মাসকে উম্মতের সহিত সম্বন্ধিত করিবার কারণ এই যে, এই মাসে উম্মতে মুহম্মদী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আল্লাহর পক্ষ হইতে বহু অনুগ্রহ ও রহমত নাযিল হয়। যেমন কবরের আযাব মাফ হওয়া, শয়তানদিগকে শৃংখলিত করা, জাহান্নাম হইতে মুক্তি দান করা ইত্যাদি। এক হাদীছে আছে–

رجب شهر الله و شعبان شهرى و رمضان شهر الامة *

রজব মাস হইল আল্লাহ পাকের মাস, শাবান মাস হইল আমার মাস আর রমযান মাস হইল উম্মতের মাস।

(তোমাদের মালের যাকাত দান কর।) অন্য বর্ণনায় আছে, খুশী মনে যাকাত প্রদান কর এবং বাইতুল্লাহর হজ্জ কর।

(তোমাদের শাসকদের আনুগত্য কর।) অর্থাৎ যে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর নাফরমানি না হয় ঐ সকল ক্ষেত্রে শাসক নিজে ফাসিক হইলেও তাহার আনুগত্য করিয়া যাইতে হইবে। কেননা আনুগত্য ছিন্ন হইলে শান্তি শৃংখলা বিনষ্ট হইবে। গোলযোগ ও হানাহানি দেখা দিবে। এইভাবে উম্মতের শক্তিক্ষয় হইবে এবং শত্রুদের হাতে পর্যুদস্ত হইতে হইবে। তাই যে কোনভাবেই হউক উম্মতের ঐক্য ও সম্মিলিত শক্তি বজায় রাখিতে হইবে। অবশ্য আল্লাহর নাফরমানির ক্ষেত্রে আনুগত্য জায়েয হইবে না। হাদীছ শরীফে আছে–

لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق *

খালিকের নাফরমানি করিয়া মাখলূকের ফরমাবরদারি জায়েয নহে।

তবে ফিতনা ও গোলযোগ পরিহার করিয়া ন্যায় ও সত্যকে আঁকড়াইয়া ধরিতে হইবে। কিন্তু ঐ অবস্থায়ও গোলযোগ করা যাইবে না। প্রয়োজনে আল্লাহর ওয়াস্তে জুলুম বরদাশত করিতে হইবে। যেমন হযরত ইমাম মালিক ও হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) চাবুকের আঘাতে বেহুঁশ হইয়াছেন। কিন্তু বিদ্রোহের আওয়াজ তুলেন নাই। তদ্রূপ সতের বৎসর বয়সের মহান সেনাপতি মুহম্মদ বিন কাসিম মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে স্বেচ্ছায় গ্রেফতারি বরণ করিয়াছেন। কিন্তু বিদ্রোহ করেন নাই। অথচ তদানিন্তন খিলাফতের বিরুদ্ধে কিয়ামত সৃষ্টি করিবার জন্য তাহার অংগুলি হেলনই যথেষ্ট ছিল।

অধ্যায় – ৭

একীন ও তাওয়াক্কুল

আয়াতসমূহ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

لَمَّا رَاَى الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا *

যখন মুসলমানগণ (শত্রু) বাহিনী সমূহ দেখিতে পাইল তখন তাহারা বলিল, ইহা ত উহাই যাহার ওয়াদা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল আমাদের সহিত করিয়াছেন এবং আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল সত্য বলিয়াছেন। আর ইহা তাহাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণই শুধু বৃদ্ধি করিয়াছে।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন–

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيْمَانًا وَّ قَالُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ * فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ فَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْءٌ وَّ اتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ *

ঐ সকল লোক যাহাদিগকে লোকেরা বলিল যে, (মক্কার আবু সুফিয়ান ও তাহার সংগী) লোকেরা তোমাদের (নির্মূল করিবার) জন্য (লোক-লস্কর ও সাজ-সরঞ্জাম) জোগাড় করিয়াছে। সুতরাং তাহাদিগকে ভয় কর। কিন্তু (এই হুমকিপূর্ণ কথা) তাহাদের ঈমান বৃদ্ধি করিল এবং তাহারা বলিল, আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম সহায় (ও ব্যবস্থাপক।) অনন্তর তাহারা আল্লাহ্র নিয়ামত ও অনুগ্রহসহ ফিরিয়া আসিল। কোন অনিষ্ট তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। (কেননা) তাহারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অনুসরণ করিয়াছে। আর আল্লাহ্ মহাঅনুগ্রহের অধিকারী ।

আল্লাহ্ পাক আরও ইরশাদ করেন–

وَ تَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ *

সেই চিরঞ্জীব (সত্তার) উপর তাওয়াক্কুল কর যিনি (কখনো) মৃত্যু বরণ করিবেন না।

আল্লাহ্ পাক আরও ইরশাদ করেন–

وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ *

মুমিনদের অবশ্যকর্তব্য হইল আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল (ও ভরসা) করা।

আল্লাহ্ পাক আরও ইরশাদ করেন–

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ *

(তাহাদের সহিত পরামর্শ করুন) অতঃপর যখন আপনি (পরামর্শের পর উদ্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করিতে) বদ্ধপরিকর হইবেন তখন আল্লাহ্র উপর ভরসা করুন (পরামর্শের উপর ভরসা করিবেন না।)

তাওয়াক্কুলের আদেশসম্পর্কিত আয়াত সুপ্রচুর ও সুপরিচিত।

(তাওয়াক্কুলের ফযীলত সম্পর্কে) আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন–

وَ مَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ *

যে আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল (ও ভরসা) করিবে আল্লাহ্ তাহার জন্য যথেষ্ট হইবেন।

আল্লাহ্ পাক আরও ইরশাদ করেন–

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَّ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ * (اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ * اُولٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَّهُمْ

دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ *)

নিঃসন্দেহে (পূর্ণ) মুমিন ঐ লোকেরা যাহাদের সামনে আল্লাহর আলোচনা হয় তখন তাহাদের অন্তর ভয়কম্পিত হয়। আর যখন তাহাদিগকে তাঁহার আয়াত সমূহ তিলাওয়াত করিয়া শোনানো হয় তখন তাহাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পায়। আর তাহারা আপন প্রতিপালকের উপর ভরসা করে। (তাহারা ঐ সমস্ত লোক যাহারা নামায কায়েম করে এবং আমি যাহা দান করিয়াছি তাহা হইতে খরচ করে। উহারাই সত্যিকার মুমিন। তাহাদের জন্য তাহাদের প্রতিপালকের নিকট রহিয়াছে বড় বড় মর্তবা এবং মাগফিরাত এবং উত্তম রিযিক।

ফায়দা ঃ

(ইয়াকীন ও তাওয়াক্কুল) ইয়াকীন–এর আভিধানিক অর্থ সুনিশ্চিত জ্ঞান যাহাতে সন্দেহের লেশমাত্র নাই। পরিভাষায় ইয়াকীন অর্থ কোন বিষয়ে এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, ইহা এমন, অন্য রূপ হওয়া সম্ভব নহে। তত্ত্বজ্ঞানীদের মতে ইয়াকীনের হাকীকত হইল অন্তরের স্বচ্ছতা দ্বারা গায়বী বিষয় অবলোকন এবং চিন্তার বিশুদ্ধতা দ্বারা তত্ত্ব ও রহস্য অনুধাবন।

তাওয়াক্কুলের হাকীকত ইমাম নববী (রহঃ) মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা-গ্রন্থে এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহর প্রতি আস্থা স্থাপন করা এবং এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহর ফায়সালাই কার্যকর। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত অনুসরণ করা এবং জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণ অর্জনে সচেষ্ট হওয়া এবং শত্রু (ও অন্যান্য ক্ষতিকর বিষয়) হইতে সতর্ক থাকা, যেমন নবী ও রাসূলগণ করিয়াছেন। তবে এই বিশ্বাস পোষণ করিতে হইবে যে, উপকার বা ক্ষতি করিবার কোন শক্তি আসবাবের নাই। বরং সবই আল্লাহর হুকুমে হয়। ইমাম কোশায়রী (রহঃ) বলেন, তাওয়াক্কুলের স্থান হইল অন্তর। সুতরাং সকল কিছু আল্লাহর হুকুমে হয়, এই বিশ্বাস অন্তরে পোষণের পর দৌড়ঝাঁপ করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নহে বরং ইহাই আল্লাহর হুকুম।

ইমাম আবু উছমান আল হিয়ারী (রহঃ) তাওয়াক্কুলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন এইভাবে–

التوكل الاكتفاء بالله تعالى مع الاعتماد عليه *

তাওয়াক্কুলের অর্থ আল্লাহর উপর ভরসা করিয়া আল্লাহকেই যথেষ্ট মনে করা।

প্রথম আয়াতটি আহযাব যুদ্ধসম্পর্কিত। احزاب শব্দটি حزب এর বহুবচন। অর্থ দল, বাহিনী। যেহেতু এই যুদ্ধে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে আরবের প্রায় সকল গোত্র সম্মিলিতভাবে মদীনার উপর চড়াও হইয়াছিল সেহেতু ইহাকে احزاب (বা সম্মিলিত বাহিনীর) যুদ্ধ বলা হয়। অপরদিকে মুসলমানগণ যেহেতু মদীনার প্রতিরক্ষার জন্য পরিখা খনন করিয়াছিলেন সেহেতু ইহাকে পরিখা বা খন্দক যুদ্ধও বলা হয়। এই যুদ্ধে এমন ভীষণ অবস্থা হইয়াছিল যে, মুসলমানদের অন্তরেও দুশ্চিন্তা ভর করিয়াছিল। আর মুনাফিকরা তো ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়নই করিয়াছিল। কিন্তু আল্লাহ পাক মুসলমানগণের অন্তরকে ভয়মুক্ত করিয়া দিলেন। ফলে তাহারা বলিতে লাগিলেন যে, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল তো পূর্বেই ওয়াদা করিয়াছেন যে, আমাদিগকে শত্রুর ভয় দ্বারা পরীক্ষা করা হইবে এবং অবিচল থাকিলে আমাদিগকে সাহায্য

করা হইবে এবং আমরা বিজয়ী হইব। আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল সত্য ওয়াদাই করিয়াছেন এবং সম্মিলিত শত্রু বাহিনীর আগমনের মাধ্যমে উহার প্রকাশ হইতে শুরু করিয়াছে। সুতরাং আল্লাহর প্রতিশ্রুত সাহায্য লাভের জন্য এখন আমরা অবিচল থাকিব। মুনাফিকদের মত পিছপা হইব না। মোটকথা শত্রুবাহিনীর আগমন আল্লাহর প্রতিশ্রুতির প্রতি তাহাদের বিশ্বাস এবং আল্লাহর ফায়সালার প্রতি তাঁহাদের আত্মসমপর্ণের মনোভাবই শুধু বৃদ্ধি করিয়াছিল।

দ্বিতীয় আয়াতের শানেনুযূল এই যে, অহুদ যুদ্ধের পর নাঈম বিন মাসউদ আশজায়ী মুসলমানদের নিরুৎসাহিত করিবার জন্য বলিয়াছিল যে, শত্রুরা পুনরায় বাহিনী প্রস্তুত করিয়া তোমাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবার আয়োজন করিতেছে। অহুদের যুদ্ধে মুসলমানগণ এমনিতেই পর্যুদস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং এই ভীতিমূলক ভুয়া সংবাদে তাহাদের মনোবল একেবারে ভাংগিয়া পড়াই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু মুসলমানগণের ভরসা ও তাওয়াক্কুল যেহেতু ছিল আল্লাহর উপর সেহেতু এই কথায় তাহারা মোটেই অবদমিত হইলেন না। বরং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত যুদ্ধাভিযানে বাহির হইয়া 'সূকুল বদর'-এ উপনীত হইলেন। অহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরায়শের কাফিরদিগকে পুনরায় এইস্থানে মুখামুখি হইবার ঘোষণা দিয়াছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তাহাদের অন্তরে এমন ভীতি সঞ্চার করিয়া দিলেন যে, আবু সুফিয়ান ও তাহার বাহিনী নির্ধারিত স্থানে আসিতে সাহস করিল না। ছাহাবা কেরামের নিকট পণ্যদ্রব্য ছিল। তাহারা উহা বেচাকিনা করিলেন এবং খুব লাভবান হইলেন। অতঃপর নিরাপদে মদীনায় ফিরিয়া আসিলেন। নিরাপদে ও লাভবান অবস্থায় ফিরিয়া আসিবার দিকেই ইংগিত করা হইয়াছে। فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ فَضْلٍ বলিয়া।

(তাঁহারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসরণ করিয়াছে) অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের পক্ষ হইতে যখন যুদ্ধের জন্য বাহির হইবার আদেশ হইল তখন তাঁহারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে খুশি মনে বাহির হইল।

(তৃতীয় আয়াত) এখানে মুসলমানদের প্রতি নিরংকুশ তাওয়াক্কুলের আদেশ করা হইয়াছে। অনেকে ইহা দ্বারা আসবাব বর্জনের মাধ্যমে তাওয়াক্কুল করিবার আবশ্যকতা প্রমাণ করেন। কিন্তু দৃশ্যতঃ ইহা সাধারণ স্তরের জন্য নহে। যাহারা আধ্যাত্মিক উন্নতির সুউচ্চ স্তরে উপনীত হইয়াছেন এবং যাহাদের অন্তর্দৃষ্টি হইতে আসবাবের পর্দা সরিয়া গিয়াছে এবং আসবাবের যিনি খালিক ও স্রষ্টা তাঁহার তাজাল্লী যাহাদের উপর পূর্ন মাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছে তাহাদের জন্য হইল আসবাব বর্জনের তাওয়াক্কুল। পক্ষান্তরে সাধারণ স্তরের তাওয়াক্কুল এই যে, তাহারা আল্লাহর হুকুম হিসাবে আসবাব গ্রহণ করিবে। কিন্তু এই আকীদা ও বিশ্বাস পোষণ করিবে যে, আসবাব একটি পর্দা মাত্র। প্রকৃতপক্ষে হইবার এবং না হইবার সম্পর্ক হইল আল্লাহ পাকের হুকুমের সহিত।

আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) বলেন, তাওয়াক্কুলকারীর দুই অবস্থা। প্রথম স্তর এই যে, অন্তরে আসবাবের প্রতি তাহাদের কোন ভ্রুক্ষেপ থাকে না। শুধু আল্লাহর হুকুম হিসাবে উহা অবলম্বন করে। দ্বিতীয় স্তর এই যে, কখনো কখনো আসবাবের প্রতি তাহাদের নযর চলিয়া যায়। কিন্তু তাহারা জ্ঞান ও যুক্তি এবং আধ্যাত্মিক ভাব দ্বারা উহা দমনে সচেষ্ট থাকে। এক পর্যায়ে আল্লাহ

পাক আপন দয়াগুণে তাহাদেরকেও প্রথম স্তরে উপনীত করেন। ফলে তাহারা আসবাবের ধোকা হইতে পূর্ণ মুক্তি লাভ করে।

(চিরঞ্জীব সত্তার উপর তাওয়াক্কুল কর।) আল্লাহর যাত ও সত্তাবাচক নামের পরিবর্তে ছিফাত ও গুণবাচক নাম উল্লেখ করিবার মাধ্যমে এই দিকে ইংগিত করা হইল যে, যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহর উপর ভরসা করিবে সে বরবাদ হইবে। কেননা গায়রুল্লাহ মাত্রই মরণশীল। শুধু আল্লাহর যাত অবিনশ্বর। সুতরাং তিনিই তাওয়াক্কুল ও ভরসার একমাত্র উপযুক্ত।

(শেষ আয়াত) আলোচ্য আয়াতে ঐ সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হইয়াছে যাহা প্রত্যেক মুমিনের মাঝে থাকা অতি আবশ্যক। ইহাতে এই ইংগিত রহিয়াছে যে, প্রত্যেক মুমিনের উচিত নিজের জাহেরী ও বাতেনী অবস্থার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা। যদি সে নিজের মাঝে এই সমস্ত গুণ ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান দেখিতে পায় তবে আল্লাহর শোকর আদায় করিবে। আর যদি কোন কমি ও খুঁত থাকে তবে উহা দূর করিবার জন্য পূর্ণ ছবরের সহিত মুজাহাদা করিবে।

মুমিনের প্রথম বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতে বলা হইয়াছে—

اَلَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ *

অর্থাৎ যখন আল্লাহর আলোচনা হয় তখন তাহাদের অন্তরে ভয় জাগ্রত হয়।

অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে—

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ *

শোন! আল্লাহর যিকির বা স্মরণ দ্বারা অন্তরে প্রশান্তি সৃষ্টি হয়।

সুতরাং বোঝা গেল যে, আলোচ্য আয়াতে যেই ভয়ের কথা বলা হইয়াছে উহা মনে প্রশান্তি বিনষ্টকারী ভয় নহে। বরং এমন ভয় যাহার উৎস হইল ভক্তি ও মুহব্বত। কিংবা এই ভয়ের অর্থ আযাবের ভয় যাহা পাপ চিন্তা হইতে বিরত রাখে। অর্থাৎ অন্তরে পাপ চিন্তা আসিবা মাত্র তাঁহার আযাবের ভয় জাগ্রত হয়। ফলে বান্দা পাপ হইতে বিরত থাকে।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হইয়াছে وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا অংশে। অর্থাৎ তাহাদের সামনে যখন আল্লাহ পাকের পাক কালামের আয়াত তিলাওয়াত করা হয় তখন তাহাদের ঈমান অর্থাৎ ঈমানী শক্তি ও ঈমানী নূর বৃদ্ধি পায়। তখন নেক আমল এমনই আনন্দদায়ক হয় যে, উহা তরক করা কষ্টকর হয় এবং পাপের প্রতি এমনই স্বভাবগতঃ ঘৃণা পয়দা হয় যে, সে উহা চিন্তাও করিতে পারে না। ঈমানের এই অবস্থাকে হাদীছ শরীফে حلاوة الايمان (ঈমানের মাধুর্য) বলা হইয়াছে।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্যের কথা বর্ণিত হইয়াছে وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ অংশে। অর্থাৎ তাহারা আল্লাহর উপর ভরসা করে। তবে ছহী হাদীছে বলা হইয়াছে যে, ইহার অর্থ আসবাবকে অস্বীকার করা নহে। বরং আসবাবের ক্ষমতাকে অস্বীকার করিয়া আসবাবের স্রষ্টা আল্লাহর ক্ষমতাকে স্বীকার করিয়া লওয়া। যেমন এক হাদীছে আসিয়াছে—

اجملوا فى الطلب و توكلوا على الله *

তোমরা উত্তমরূপে চেষ্টা কর। অতঃপর আল্লাহর উপর ভরসা কর।

পরবর্তী আয়াতে আরও দুইটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হইয়াছে। দেখুন–

اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ * .

যাহারা নামায কায়েম করে এবং আমাদের প্রদত্ত রিযিক হইতে (আল্লাহর রাস্তায়) খরচ করে।

এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য যাহারা অর্জন করিবে তাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে ঘোষিত সনদ এই–

اُولٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا *

উহারাই প্রকৃত মুমিন।

অতঃপর তাহাদের পুরস্কার সম্পর্কে বলা হইয়াছে–

لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ *

তাহাদের জন্য তাহাদের প্রতিপালকের নিকট রহিয়াছে বহু উচ্চ মর্তবা এবং মাগফিরাত এবং মহান রিযিক।

হাদীছসমূহ

৭৬। বেলা-হিসাব জান্নাতী হইবে সত্তর হাজার

فَالْاَوَّلُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلَّمَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الْاُمَمُ، فَرَاَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ، وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ اَحَدٌ اِذْ رُفِعَ لِيْ سَوَادٌ عَظِيْمٌ، فَظَنَنْتُ اَنَّهُمْ اُمَّتِيْ، فَقِيْلَ لِيْ: هٰذَا مُوْسٰى وَقَوْمُهُ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْاُفُقِ، فَنَظَرْتُ فَاِذَا سَوَادٌ عَظِيْمٌ، فَقِيْلَ لِيْ: انْظُرْ اِلَى الْاُفُقِ الْاٰخَرِ، فَاِذَا سَوَادٌ عَظِيْمٌ، فَقِيْلَ لِيْ: هٰذِهٖ اُمَّتُكَ، وَمَعَهُمْ سَبْعُوْنَ اَلْفًا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ» ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ، فَخَاضَ النَّاسُ فِيْ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمُ الَّذِيْنَ صَحِبُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمُ الَّذِيْنَ وُلِدُوْا فِي الْاِسْلَامِ، فَلَمْ يُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا ـ وَذَكَرُوْا اَشْيَاءَ ـ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا الَّذِيْ تَخُوْضُوْنَ فِيْهِ؟» فَاَخْبَرُوْهُ فَقَالَ: «هُمُ الَّذِيْنَ لَا يَرْقُوْنَ، وَلَا يَسْتَرْقُوْنَ وَلَا يَتَطَيَّرُوْنَ، وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ» فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ: ادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَّجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ، فَقَالَ: «اَنْتَ مِنْهُمْ» ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ اٰخَرُ فَقَالَ: ادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَّجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ، فَقَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

«الرُّهَيْطُ» بِضَمِّ الرَّاءِ: تَصْغِيْرُ رَهْطٍ، وَهُمْ دُوْنَ عَشَرَةِ اَنْفُسٍ . «وَالْاُفُقُ»: النَّاحِيَةُ وَالْجَانِبُ. «وَعُكَّاشَةُ» بِضَمِّ الْعَيْنِ وَتَشْدِيْدِ الْكَافِ وَبِتَخْفِيْفِهَا، وَالتَّشْدِيْدُ اَفْصَحُ .

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার সামনে বিভিন্ন উম্মত পেশ করা হইল। একজন নবীকে দেখিলাম; তাঁহার সংগে ক্ষুদ্র একটি দল রহিয়াছে। আরেকজন নবীকে দেখিলাম; তাঁহার সংগে এক দুইজন লোক রহিয়াছে। অন্য একজন নবীকে দেখিলাম; তাঁহার সহিত কোন লোকই নাই। হঠাৎ আমাকে এক বিরাট দল দেখানো হইল। আমি ভাবিলাম যে, ইহারা আমার উম্মত। কিন্তু আমাকে বলা হইল, ইনি মুসা ও তাঁহার উম্মত। তবে দিগন্তপানে দেখুন। আমি তাকাইলাম। তখন বিরাট দল দেখিতে পাইলাম। আবার আমাকে বলা হইল, অপর দিগন্তপানে দেখুন। সেখানেও এক বিরাট দল দেখা গেল। আমাকে বলা হইল, ইহা আপনার উম্মত। তাহাদের সংগে সত্তর হাজার মানুষ এমন রহিয়াছে যাহারা বেলা-হিসাব ও বেলা-আযাব জান্নাতে দাখেল হইবে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠিয়া আপন হুজরায় চলিয়া গেলেন। তখন ছাহাবা কেরাম ঐ লোকদের সম্পর্কে আলোচনা করিতে লাগিলেন যাহারা বেলা-হিসাব ও বেলা-আযাব জান্নাতে প্রবেশ করিবে। কেহ বলিলেন, সম্ভবতঃ তাহারা ঐ সকল লোক যাহারা (ইসলামের শুরু হইতে) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছোহবত (ও সংগ) লাভ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিলেন, সম্ভবতঃ তাহারা ঐ সমস্ত লোক যাহারা ইসলামের অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং আল্লাহর সহিত কাহাকেও শরীক করে নাই। (এইভাবে) তাঁহারা বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করিতেছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের সামনে বাহির হইয়া আসিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বিষয়ে তোমরা আলোচনা করিতেছ? তাঁহারা তাঁহাকে (বিষয়টি) অবহিত করিলেন। তখন তিনি বলিলেন, তাহারা ঐ সমস্ত লোক যাহারা ঝাড়ফুঁক করে না এবং করায় না এবং কুলক্ষণ গ্রহণ করে না। বরং (সর্বাবস্থায়) আপন প্রতিপালকের উপর ভরসা করে। তখন হযরত ওকাশা বিন মুহছিন আসাদী দাঁড়াইয়া বলিলেন, আল্লাহর নিকট দু'আ করুন যেন তিনি আমাকে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেন। তিনি বলিলেন, তুমি তাহাদের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর অন্য একজন দাঁড়াইয়া বলিলেন, আল্লাহর নিকট দু'আ করুন যেন তিনি আমাকে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বলিলেন, ওকাসা তোমার চাইতে অগ্রবর্তী হইয়া গিয়াছে। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

(বিভিন্ন উম্মত পেশ করা হইল) ইহাতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অতিউচ্চ মর্যাদা প্রকাশ পাইতেছে। এইভাবে সকল উম্মতকে তাঁহার সামনে পেশ করিবার হিকমত সম্ভবতঃ এই যে, (কোন কোন মতে) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র বনী আদমের জন্য প্রেরিত হইয়াছেন। প্রত্যেক উম্মতের নবী দ্বীন ও শরীয়ত প্রচারের ক্ষেত্রে তাঁহার নায়েব বা স্থলবর্তী ছিলেন মাত্র।

উম্মত পেশ করিবার এই ঘটনা হয়ত স্বপ্নযোগে ঘটিয়াছিল। আর নবীগণের স্বপ্নও অহীর অন্তর্ভুক্ত। কিংবা হয়ত জাগ্রত অবস্থায় মেরাজের সময় কিংবা অন্য কোন সময় ঘটিয়াছিল।

(সত্তর হাজার) প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই সত্তর হাজার লোক কি গোনাহগার ও জালিম

হওয়া সত্ত্বেও বেলা-হিসাব ও বেলা-আযাব জান্নাতে প্রবেশ করিবে? উত্তর এই যে, আলোচ্য হাদীছে উল্লেখিত চারিটি গুণে যাহারা গুণান্বিত হইবে তাহারা অবশ্যই যাবতীয় গোনাহ হইতে মুক্ত, পবিত্র ও ন্যায়পরায়ণ হইবে। কিংবা এই সকল গুণের বরকতে আল্লাহ পাক তাহাদের গোনাহ সমূহ মাফ করিয়া দিবেন।

(ঝাড়ফুঁক) ঝাড়ফুঁক ও তাবিজ ব্যবহার সম্পর্কে ওলামা কেরামের বিভিন্ন মতামত রহিয়াছে। সার সংক্ষেপ এই যে, ঝাড়ফুঁক ও তাবিজ তুমার তিন প্রকার হইয়া থাকে। প্রথম প্রকার জাহেলিয়াতের যুগে প্রচলিত ঝাড়ফুঁক। ইহা পরিহার করা তো সকল মুসলমানের জন্য অবশ্যকর্তব্য এবং প্রায় সকল মুসলমান উহা পরিহার করিয়াও থাকে। সুতরাং আলোচ্য হাদীছে ইহা উদ্দেশ্য হইতে পারে না। তদ্রূপ আল্লাহর নামে এবং হাদীছে বর্ণিত ঝাড়ফুঁক ও তাবিজও উদ্দেশ্য হইতে পারে না। কেননা ইহা তো সুন্নতসম্মত এবং ইহা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা। তৃতীয় প্রকার হইল ফিরিশতাগণের নামে, নবী রাসূলগণের নামে বা অলী কুতুবের নামে ঝাড়ফুঁক করা, যেমন অনেকেই করিয়া থাকে। ইহা সরাসরি নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নহে; আবার আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ পর্যায়েরও নহে, যাহার বৈধতা হাদীছ শরীফে রহিয়াছে। এই মধ্যবর্তী পর্যায়ের ঝাড়ফুঁক বা তাবিজ বৈধ ও মুবাহ প্রকারের সহিত যুক্ত হইবে। কেননা ইহাতে আল্লাহকেই প্রকৃত কার্যসম্পাদক বিশ্বাস করা হয়। শুধু বরকতের জন্য তাঁহাদের নাম ব্যবহার করা হয়। আর ইহা জায়েয আছে। তবে ইহা না করাই উত্তম। কেননা দৃশ্যতঃ ইহা গায়রুল্লাহর নামে ঝাড়ফুঁক ও তাবিজ করিবার সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে কসম করিবার মত ইহাও পরিহার করা সমীচীন। আলোচ্য হাদীছে এই প্রকার ঝাড়ফুঁক পরিহার করিবার কথাই বলা হইয়াছে। (কুরতুবী)

তবে ইমাম নববী, কুরতুবী ও খাত্তাবী প্রমুখের মতে হাদীছের অর্থ এই যে, উক্ত সত্তর হাজার লোক আল্লাহর ইচ্ছা ও ফায়সালার প্রতি পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি ও আত্মসমর্পণবশতঃ হাদীছে বর্ণিত ও আল্লাহর নামে কৃত ঝাড়ফুঁক ও তাবিজও পরিহার করিয়া থাকে এবং আল্লাহর পক্ষ হইতে যাহা কিছু আসে তাহাই তাহারা আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকে। উহা দূর করিবার জন্য ঝাড়ফুঁক বা তাবিজের আশ্রয় গ্রহণ করে না। ইহা যে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ঈমান ও আত্মসমর্পণের সর্বোচ্চ পর্যায় তাহাতে আর সন্দেহ কি? অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিকিৎসার উদ্দেশ্যে যে ঝাড়ফুঁক করিয়াছেন উহা শুধু বৈধতা প্রকাশ করিবার জন্য।

(কুলক্ষণ গ্রহণ করে না) অর্থাৎ প্রচলিত বিশ্বাস ও কুসংস্কারের ভিত্তিতে বিভিন্ন জিনিস হইতে কুলক্ষণ গ্রহণ করে না এবং উহার কারণে ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে না। যেমন জাহেলিয়াতের যুগে বিভিন্ন লক্ষণ দেখিয়া যাত্রা স্থগিত করা হইত।

(ওকাসা) ইনি বিশিষ্ট ছাহাবী ছিলেন। সাহসিকতায়ও ছিলেন শ্রেষ্ঠ। বদরের যুদ্ধে তাঁহার বিশেষ ঘটনা ছিল এই যে, যুদ্ধ করিতে করিতে তাঁহার তরবারি ভাংগিয়া গিয়াছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে একটি মোটা কাষ্ঠখণ্ড দান করিয়াছিলেন। আর হযরত ওকাসা (রাঃ)-এর হাতে উহা শাণিত তরবারি হইয়া উঠিয়াছিল। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর যামানায় মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার সময় শহীদ হওয়া পর্যন্ত উহা তাঁহার নিকটেই ছিল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াফাতের সময় তাঁহার

বয়স হইয়াছিল ৪৪ বৎসর। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার ইরশাদ করিলেন–

منا خير فارس فى العرب *

আমাদের মাঝে আরবের শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী রহিয়াছে। ছাহাবা কেরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কে? হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বলিলেন, ওকাসা বিন যিহদান। বিশ্বাসের অতুলনীয় দৃঢ়তা, নেক ও পূণ্যের প্রতি অসাধারণ আগ্রহ এবং আল্লাহর প্রতিদানের প্রতি প্রবল আসক্তির কারণেই সকল ছাহাবাকে ছাড়াইয়া তিনি এই অনন্য মর্যাদা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

৭৭। বিশেষ নববী দু'আ

اَلثَّانِي : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَيْضًا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ: «اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ . اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُ بِعِزَّتِكَ؛ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَنْ تُضِلَّنِيْ ، اَنْتَ الْحَيُّ الَّذِيْ لَا تَمُوْتُ، وَالْجِنُّ وَالْاِنْسُ يَمُوْتُوْنَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَهٰذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ وَاخْتَصَرَهُ الْبُخَارِيُّ .

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দু'আ করিতেন–

اللهم لك اسلمت، و بك آمنت، و عليك توكلت، و اليك انبت، و بك خاصمت، اللهم اعوذ

بعزتك لا اله الا انت ان تضلنى، انت الحى الذى لا يموت و الجن و الانس يموتون *

হে আল্লাহ। তোমারই নিকট আমি আত্মসমর্পণ করিয়াছি এবং তোমারই উপর ঈমান আনিয়াছি এবং তোমারই উপর তাওয়াক্কুল (ও ভরসা) করিয়াছি এবং তোমারই অভিমুখে আমি রুজু করিয়াছি এবং তোমারই সাহায্যে আমি (শত্রুদের বিরুদ্ধে) লড়াই করিয়াছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার সর্বময় ক্ষমতার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি যেন তুমি আমাকে পথভ্রষ্ট না কর। তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নাই। তুমি চিরঞ্জীব যাহার মৃত্যু নাই। অথচ মানব ও জ্বিন সকলেই মৃত্যু বরণ করিবে। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

(তোমারই অভিমুখে রুজু করিয়াছি।) অর্থাৎ তোমার ইবাদত বন্দেগীতে আত্মনিমগ্ন হইয়াছি এবং তোমার নৈকট্য লাভে মনোনিবেশ করিয়াছি।

কিংবা অর্থ এই যে, তোমার সমীপে তাওবা করিয়াছি এবং নিজের দীনতা ও হীনতা প্রকাশ করিয়াছি। যাবতীয় কাজকর্মে ও চেষ্টা তদ্বীরে সফল হইবার জন্য তোমারই পানে চাহিয়া আছি।

(সকলে মৃত্যু বরণ করিবে) সমস্ত মাখলূককে বাদ দিয়া শুধু আল্লাহর উপর ভরসা করা এবং সকল বিষয়ে তাঁহারই শরণাপন্ন হইবার রহস্যের প্রতি ইংগিত করা হইয়াছে। অর্থাৎ গায়রুল্লাহ তো মরণশীল এবং তাহার শক্তি ও ক্ষমতা অবনতিশীল। পক্ষান্তরে আল্লাহ চিরঞ্জীব

এবং তাঁহার ক্ষমতা নিরংকুশ ও চিরঅক্ষয়। সুতরাং যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহকে আশ্রয় করিয়া মর্যাদা লাভ করিতে চাহিবে সে যলীল ও অপদস্থ হইবে এবং যে গায়রুল্লাহর নিকট পথের দিশা চাহিবে সে অতি অবশ্যই ভ্রষ্ট হইবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর রজ্জু আঁকড়াইয়া ধরিবে সে দুনিয়া আখিরাতে মর্যাদাবান হইবে।

৭৮। তাওয়াক্কুলকারীদের কথা

اَلثَّالِثُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَيْضًا قَالَ: «حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ، قَالَهَا اِبْرَاهِيْمُ ﷺ حِيْنَ اُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ ﷺ حِيْنَ قَالُوْا: اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَقَالُوا: حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: «كَانَ اٰخِرُ قَوْلِ اِبْرَاهِيْمَ ﷺ حِيْنَ اُلْقِيَ فِي النَّارِ: حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ».

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে আরো বর্ণিত যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হইল তখন তিনি বলিলেন, حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْل (আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম ব্যবস্থাপক।) হযরত মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ইহা উচ্চারণ করিয়াছিলেন যখন লোকেরা বলিয়াছিল যে, শত্রুদল তোমাদের বিরুদ্ধে (প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছে এবং সাজ সরঞ্জাম) যোগাড় করিয়াছে। সুতরাং তাহাদিগকে তোমরা ভয় কর। তখন তাহাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পাইল এবং তাহারা বলিল, আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম ব্যবস্থাপক।

অন্য এক রিওয়ায়াতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আগুনে নিক্ষিপ্ত হইবার সময় হযরত ইবরাহীম (আঃ)–এর সর্বশেষ কথা ছিল এই, حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْل (আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। আর তিনি অতি উত্তম ব্যবস্থাপক।) (বুখারী শরীফ)

ফায়দা ঃ

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে আগুনে নিক্ষেপ করিবার যাবতীয় আয়োজন যখন সম্পন্ন হইল এবং ভীষণ এক অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করা হইল তখন মানুষ ও জ্বিনজাতি ছাড়া আসমান যমিন এবং উহাতে বিদ্যমান সকল ফিরিশতা ও মাখলূক এই বলিয়া একযোগে চিৎকার করিয়া উঠিল, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার যমিনে ইবরাহীম ছাড়া আপনার ইবাদত করিবার মত আর কেহ নাই। সুতরাং আপনার ইজ্জত ও বড়ত্বের দোহাই, আমাদিগকে তাঁহাকে সাহায্য করিবার অনুমতি দান করুন। আল্লাহ পাক ইরশাদ করিলেন, সে যদি তোমাদের কাহারো নিকট সাহায্যের আবেদন জানায় তবে সে তাহাকে সাহায্য করিতে পারে। আমি তাহাকে এই বিষয়ে অনুমতি দিলাম। আর যদি সে আমাকে ছাড়া অন্য কাহারও নিকট সাহায্যের আবেদন না করে তবে তাহার ব্যাপারে আমিই ভাল জানি এবং আমিই তাহার সহায় হইব।

যখন লোকেরা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে আগুনে নিক্ষেপ করিতে চাহিল তখন শূন্যে

ভাসমান মেঘের ব্যবস্থাপক (ফিরিশতা) আসিয়া আরয করিলেন, হে ইবরাহীম! আপনি চাহিলে আমি পানি বর্ষণ করিয়া আগুন নিভাইয়া দিব। কিন্তু তিনি বলিলেন, তোমার নিকট আমার কোন প্রয়োজন নাই। তখন বাতাসের ব্যবস্থাপক ফিরিশতা হাজির হইয়া আরয করিলেন, আপনি চাহিলে আমি (বাতাস দ্বারা) আগুন উড়াইয়া লইয়া যাইব। কিন্তু তিনি বলিলেন, না। অতঃপর আসমানের দিকে মাথা তুলিয়া বলিলেন–

اللهم انت الواحد فى السماء و انا الواحد فى الارض ليس احد يعبدك غيرى حسبى الله و نعم الوكيل *

হে আল্লাহ! আসমানে আপনিই একমাত্র (আপনার কোন অংশীদার নাই) তদ্রূপ যমিনে আমিই একমাত্র। আমাকে ছাড়া অন্য কেহ আপনার ইবাদত করে না। আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম ব্যবস্থাপক। তখন আপন কুদরত দ্বারা আল্লাহ তাঁহাকে সাহায্য করিলেন এবং আগুনকে হযরত ইবরাহীম (আঃ)–এর জন্য শীতল ও শান্তিদায়ক হইবার আদেশ দিলেন।

قُلْنَا يَا نَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّ سَلٰمًا عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ *

আমি বলিলাম, হে আগুন! ইবরাহীমের জন্য সুশীতল ও শান্তিদায়ক হইয়া যাও।

আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলকারীরা যুগে যুগে বিপদাপদ ও কঠিন দুর্যোগের সময় ইহাই বলিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং আমাদেরও কর্তব্য হইল তাঁহাদের পথ অনুসরণ করা।

ওলামায়ে কেরাম বলেন, যে ব্যক্তি এই দু'আ বেশী বেশী পড়িবে তাহাকে আল্লাহ তাওয়াক্কুলের নিয়ামত দান করিবেন। বিপদ মুছীবতের সময় খাঁটি অন্তরে পূর্ণভাব ও মর্ম বুঝিয়া ইহা পড়িলে আল্লাহ পাক তাহাকে আপন গায়বী কুদরত দ্বারা এমন ভাবে উদ্ধার করিবেন যে, সে নিজেই হয়রান হইয়া যাইবে।

৭৯। জান্নাতীদের অন্তর কেমন?

اَلرَّابِعُ: عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اَقْوَامٌ اَفْئِدَتُهُمْ مِثْلُ اَفْئِدَةِ الطَّيْرِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

قِيْلَ: مَعْنَاهُ مُتَوَكِّلُوْنَ، وَقِيْلَ: قُلُوْبُهُمْ رَقِيْقَةٌ.

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, একদল লোক জান্নাতে প্রবেশ করিবে। তাহাদের অন্তর হইবে পাখীদের অন্তরের ন্যায়। (মুসলিম শরীফ)

কেহ কেহ বলেন, ইহার অর্থ এই যে, তাহারা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ও ভরসাকারী। অন্য কেহ বলেন, তাহাদের অন্তর অতি কোমল।

ফায়দা ঃ

এখানে একদল লোকদ্বারা ঐ সকল সৌভাগ্যবান লোক উদ্দেশ্য যাহারা প্রথমবারেই

জান্নাতে প্রবেশ করিবে। প্রশংসামূলক আলোচনার প্রেক্ষিতে ইহাই প্রমাণিত হয়। কেননা সাধারণভাবে তো জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করিবার পর সকল মুসলমানই ইনশাআল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করিবে। ইহা আল্লাহর ওয়াদা আর তিনি ওয়াদা ভংগ করেন না। সুতরাং এইখানে সাধারণ জান্নাতীদের কথা বলা উদ্দেশ্য নহে।

তাওয়াক্কুলের ক্ষেত্রে তাহাদের অন্তরকে পাখীদের অন্তরের সাহিত তুলনা করিবার কারণ এই যে, পাখীরা এমনই তাওয়াক্কুলকারী যে, রিজিকের জন্য বাহ্যিক কোন উপকরণ গ্রহণ করে না। এই জান্নাতীরাও দুনিয়াতে রিযিকের জন্য বিশেষ কোন পেরেশানী না করিয়া আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা করিয়া তাঁহারই ইবাদতে সদানিমগ্ন থাকিত। আর আল্লাহ গায়বী কুদরত দ্বারা তাহাদের রিযিকের ইন্তিজাম করিতেন, ঐ রিযিকেই তাহারা সন্তুষ্ট থাকিত।

পাখীদের অন্তরের মত নরম হইবার অর্থ এই যে, খুব সহজেই তাহারা আল্লাহর আনুগত্য গ্রহণ করিত এবং নেক কাজে অগ্রসর হইত।

তৃতীয় অর্থ এই যে, পাখীদের অন্তর যেমন শত্রুর ভয়ে সর্বদা ভীত ও সতর্ক থাকে ইহারাও তদ্রূপ সর্বদা আল্লাহর ভয়ে ভীত ও সর্তক থাকিত।

৮০। আল্লাহর উপর ভরসার উদাহরণ

اَلْخَامِسُ: عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ، فَلَمَّا قَفَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَفَلَ مَعَهُمْ، فَاَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ فِيْ وَادٍ كَثِيْرِ الْعِضَاهِ، فَنَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُّوْنَ بِالشَّجَرِ، وَنَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَحْتَ سَمُرَةٍ، فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ، وَنِمْنَا نَوْمَةً، فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْعُوْنَا، وَاِذَا عِنْدَهُ اَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: «اِنَّ هٰذَا اخْتَرَطَ عَلَيَّ سَيْفِيْ وَاَنَا نَائِمٌ، فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِيْ يَدِهٖ صَلْتًا، قَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّيْ؟ قُلْتُ: اَللّٰهُ ـ ثَلَاثًا» وَلَمْ يُعَاقِبْهُ وَجَلَسَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَفِيْ رِوَايَةٍ: قَالَ جَابِرٌ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِذَاتِ الرِّقَاعِ ، فَاِذَا اَتَيْنَا عَلٰى شَجَرَةٍ ظَلِيْلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، وَسَيْفُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُعَلَّقٌ بِالشَّجَرَةِ، فَاخْتَرَطَهُ فَقَالَ: تَخَافُنِيْ؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ: فَمَنْ يَّمْنَعُكَ مِنِّيْ؟ قَالَ: «اَللّٰهُ».

وَفِيْ رِوَايَةِ اَبِيْ بَكْرٍ الْاِسْمَاعِيْلِيِّ فِيْ صَحِيْحِهٖ: قَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّيْ؟ قَالَ: «اَللّٰهُ»، قَالَ: فَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْ يَدِهٖ، فَاَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ السَّيْفَ فَقَالَ: «مَنْ يَّمْنَعُكَ مِنِّيْ؟»، فَقَالَ: كُنْ خَيْرَ آخِذٍ، فَقَالَ: «تَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، وَاَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ؟» قَالَ: لَا، وَلٰكِنِّيْ اُعَاهِدُكَ اَنْ لَا اُقَاتِلَكَ، وَلَا اَكُوْنَ مَعَ قَوْمٍ يُقَاتِلُوْنَكَ، فَخَلّٰى سَبِيْلَهُ، فَاَتٰى اَصْحَابَهُ فَقَالَ: جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ.

قَوْلُهُ: «قَفَلَ» اَيْ: رَجَعَ. وَ «الْعِضَاهُ»: الشَّجَرُ الَّذِيْ لَهُ شَوْكٌ. وَ «السَّمُرَةُ» بِفَتْحِ السِّيْنِ وَضَمِّ الْمِيْمِ: الشَّجَرَةُ مِنَ الطَّلْحِ، وَهِيَ الْعِظَامُ مِنْ شَجَرِ الْعِضَاهِ. وَ «اخْتَرَطَ السَّيْفَ» اَيْ: سَلَّهُ وَهُوَ فِيْ يَدِهِ. «صَلْتًا» اَيْ: مَسْلُوْلاً، وَهُوَ بِفَتْحِ الصَّادِ وَضَمِّهَا.

হযরত জাবির (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, নজদের দিকে পরিচালিত গাযওয়ায় তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে ছিলেন। যখন তিনি ফেরত রওয়ানা হইলেন তখন (হযরত) জাবিরও তাঁহার সহিত রওয়ানা হইলেন। এমন এক উপত্যকায় দুপুরের আরামের সময় হইল যেখানে প্রচুর বাবলা গাছ ছিল তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাত্রাবিরতি করিলেন। লোকেরা বিভিন্ন গাছের নীচে ছায়া গ্রহণের জন্য আলাদা হইয়া গেল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি গাছের নীচে নামিলেন এবং উহাতে আপন তলোয়ার ঝুলাইয়া রাখিলেন।

(হযরত জাবির (রাঃ) বলেন,) আমরা সকলে একটু ঘুমাইয়া পড়িলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে ডাক দিলেন। আমরা গিয়া দেখি; তাঁহার সামনে এক বেদুঈন উপস্থিত। তিনি বলিলেন, আমি ঘুমন্ত অবস্থায় এই লোক আমার তলোয়ার আমার উপর উঁচাইয়া ধরিয়াছিল। কিন্তু তলোয়ার তাহার হাতে থাকা অবস্থায় আমি জাগ্রত হইয়া গেলাম। তখন সে বলিল, আমার হাত হইতে কে আপনাকে রক্ষা করিবে? আমি তিনবার বলিলাম, আল্লাহ (আমাকে রক্ষা করিবেন)। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাঁহার মহানুভবতা ও দয়ার কারণে) বেদুঈনকে কোন শাস্তি দিলেন না। (অতঃপর) তিনি (শোয়া অবস্থা হইতে উঠিয়া) বসিলেন।

(বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

অন্য রিওয়ায়াতে হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, আমরা যাতুররিকা যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে ছিলাম। যখন আমরা একটি ছায়াদার গাছের নিকট পৌঁছিলাম তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উহার নীচে রাখিয়া আমরা চলিয়া আসিলাম। এমন সময় এক মুশরিক আসিয়া পড়িল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তলোয়ার গাছে ঝুলানো ছিল। তখন সে তলোয়ার উঁচাইয়া ধরিয়া বলিল, তুমি কি আমাকে ভয় কর? তিনি বলিলেন, না। সে বলিল, তবে কে তোমাকে আমার হাত হইতে রক্ষা করিবে? তিনি বলিলেন, আল্লাহ।

আবু বকর ইসমাঈলী (রহঃ)-এর সংকলিত 'ছহীহ' কিতাবের বর্ণনায় আছে যে, মুশরিক লোকটি বলিল, কে তোমাকে আমার হাত হইতে রক্ষা করিবে? তিনি বলিলেন, আল্লাহ। তখন তলোয়ার তাহার হাত হইতে পড়িয়া গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তলোয়ারটি তুলিয়া বলিলেন, তোমাকে আমার হাত হইতে কে রক্ষা করিবে? সে বলিল, আপনি উত্তম (তরবারি) ধারণকারী হউন। তিনি বলিলেন, তুমি কি সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই আর আমি আল্লাহর রাসূল? সে বলিল, না– তবে আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে, আমি আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করিব না এবং যাহারা আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করে তাহাদেরও সংগে থাকিব না। তখন রাসূলুল্লাহ

ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। আর সে তাহার সংগীদের নিকট আসিয়া বলিল, আমি শ্রেষ্ঠ মানুষের নিকট হইতে তোমাদের সান্নিধ্য আসিয়াছি।

ফায়দা ঃ

বেদুঈন লোকটি ছিল বনী মুহারিব গোত্রভুক্ত। ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাতুররিকা অভিযানে বাহির হইয়াছিলেন। ইহা চতুর্থ হিজরীর ঘটনা। তাহার নাম ছিল গাওরাছ বিন হারিছ। তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়া রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধসৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

(কে তোমাকে রক্ষা করিবে) অর্থাৎ কেহ তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। কেননা স্থুল দৃষ্টির মুশরিক মনে করিত যে, তলোয়ারই হত্যাকারী। তাহার জানা ছিল না যে, আল্লাহই হইলেন প্রকৃত কার্যসম্পাদক। আর তিনি মানুষ ও তাহার অন্তরের মাঝে আড়াল হইয়া থাকেন।

(শাস্তি দিলেন না) বস্তুতঃ এই মহত্তম চরিত্র রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমগ্র জীবনব্যাপী সমুজ্জ্বল ছিল এবং ইহার দ্বারাই তিনি আরবদের পাষাণ হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। ফলে অতি অল্প সময়ে তাহারা ইসলামের সংস্পর্শে আসিয়া সমগ্র বিশ্বমানবতার জন্য হিদায়াতের আলোকবর্তিকা হইতে পারিয়াছিলেন। হাদীছ শরীফে আসিয়াছে

انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق *

মহত্তম চরিত্রের পূর্ণতা বিধানের জন্যই আমি প্রেরিত হইয়াছি।

বস্তুতঃ উম্মত এই নববী চরিত্রের যত বেশী নিকটবর্তী হইতে পারিবে তাহাদের দ্বারা পথহারা মানবজাতির ততই বেশী কল্যাণ সাধিত হইবে।

৮১। প্রকৃত তাওয়াক্কুলের ফল

اَلسَّادِسُ: عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: «لَوْ اَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

مَعْنَاهُ تَذْهَبُ اَوَّلَ النَّهَارِ خِمَاصًا: اَيْ: ضَامِرَةَ الْبُطُوْنِ مِنَ الْجُوْعِ ، وَتَرْجِعُ اٰخِرَ النَّهَارِ بِطَانًا، اَيْ: مُمْتَلِئَةَ الْبُطُوْنِ.

হযরত ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, যদি তোমরা আল্লাহর উপর যথাযোগ্য ভরসা করিতে তবে তিনি পক্ষিকুলকে যেমন রিযিক দান করেন তোমাদিগকেও তেমনি রিযিক দান করিতেন। পক্ষিকুল সকালে খালি পেটে বাহির হয় আর সন্ধ্যায় পেট ভরিয়া ফিরিয়া আসে। (তিরমিযি শরীফ)

ফায়দা ঃ

শু'আবুল ঈমান কিতাবে এই হাদীছের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইমাম বায়হাকী (রহঃ) বলেন, আলোচ্য হাদীছ দ্বারা রুজি ও জীবিকার ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিবার বৈধতা মোটেই প্রমাণিত হয় না। বরং ইহা রিযিকের সন্ধানে সচেষ্ট হইবার আবশ্যকতাই প্রমাণ করে। কেননা পক্ষিকুলের প্রতিদিন সকালে নীড় ছাড়িয়া বাহির হইবার উদ্দেশ্য রিযিকের সন্ধান ছাড়া অন্য কিছু নহে।

আল্লাহই ভাল জানেন, হাদীছের আসল উদ্দেশ্য এই যে, রিযিকের সন্ধানে বাহির হইবার এবং ছোটাছুটি করিবার ক্ষেত্রে মানুষ যদি আল্লাহর উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল ও ভরসা করিত এবং ইহা বিশ্বাস রাখিত যে, তাঁহারই হাতে সমস্ত খাজানা। তবে পক্ষিকুলের ন্যায় তাহারাও পূর্ণ রিযিক লাভ করিয়া সফল অবস্থায় ফিরিয়া আসিত। কিন্তু আল্লাহর প্রতি পূর্ণ তাওয়াক্কুলের অভাবেই মানুষ নিজের শক্তি, মেধা ও কৌশলের উপর ভরসা করিয়া থাকে এবং রিযিকের সন্ধানের নামে ধোকাবাজি ও মিথ্যাচারের আশ্রয় লয়। আল্লাহ আমাদিগকে হিফাযত করুন।

৮২। শয়নকালের দু'আ

اَلسَّابِعُ: عَنْ اَبِي عُمَارَةَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يَا فُلَانُ إِذَا اَوَيْتَ اِلٰى فِرَاشِكَ فَقُلْ: اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِيْ اِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِيْ اِلَيْكَ: وَفَوَّضْتُ اَمْرِيْ اِلَيْكَ، وَاَلْجَاْتُ ظَهْرِيْ اِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً اِلَيْكَ، لَا مَلْجَاَ وَلَا مَنْجٰى مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ، اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ اَنْزَلْتَ، وَنَبِيِّكَ الَّذِيْ اَرْسَلْتَ؛ فَاِنَّكَ اِنْ مِتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَاِنْ اَصْبَحْتَ اَصَبْتَ خَيْرًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيْحَيْنِ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اِذَا اَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّاْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلٰى شِقِّكَ الْاَيْمَنِ وَقُلْ: وَذَكَرَ نَحْوَهُ، ثُمَّ قَالَ: وَاجْعَلْهُنَّ اٰخِرَ مَا تَقُوْلُ».

হযরত বারা বিন আযিব (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন– হে অমুক! যখন তুমি (শয়ন করিবার জন্য) বিছানায় যাইবে তখন এই দোয়া পড়িও–

اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِى اِلَيْكَ، وَ وَجَّهْتُ وَجْهِىْ اِلَيْكَ وَ فَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ، وَ اَلْجَأْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ، رَغْبَةً وَّ رَهْبَةً اِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ، وَ بِنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ *

হে আল্লাহ নিজেকে আমি আপনার হাতে সমর্পণ করিলাম এবং আমার মুখমণ্ডল আপনার অভিমুখী করিলাম এবং আমার যাবতীয় কাজ আপনার সোপর্দ করিলাম এবং আগ্রহ ও ভয়ের সহিত আমার পিঠ আপনার সংগে যুক্ত করিলাম। আপনাকে ছাড়া আমার কোন আশ্রয়স্থল নাই এবং কোন বাঁচিবার স্থান নাই। আপনার অবতীর্ণ কিতাব এবং আপনার প্রেরিত নবীর উপর আমি ঈমান আনিয়াছি।

যদি সেই রাত্রে তুমি মৃত্যু বরণ কর তবে ফিতরত ও স্বভাবের উপর (অর্থাৎ ঈমানের উপর) মৃত্যু বরণ করিবে। আর যদি (জীবিত অবস্থায়) সকাল যাপন কর তবে বিরাট কল্যাণ (ও ছাওয়াব) লাভ করিবে। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত বারা (রাঃ) হইতে বর্ণিত অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, যখন তুমি বিছানায় যাইবে তখন নামাযের অযুর অনুরূপ অযু করিও। অতঃপর ডান কাত হইয়া শয়ন করিও এবং এই দু'আ বলিও।

অতঃপর তিনি উপরে বর্ণিত দু'আটি বলিলেন এবং বলিলেন, এই দু'আই যেন হয় (ঘুমের পুর্বে) তোমার সর্বশেষ কথা।

ফায়দা ঃ

(হে অমুক) হাদীছের ব্যাখ্যা গ্রন্থগুলিতে বলা হইয়াছে যে, মূলতঃ ছাহাবী হযরত উসায়দ বিন হোযায়র (রাঃ)-কে সম্বোধন করা হইয়াছিল। বর্ণনাকারী বর্ণনার সময় নামের পরিবর্তে অমুক শব্দটি উল্লেখ করিয়াছেন।

পরবর্তী বর্ণনায় বর্ণনাকারী ছাহাবী হযরত বারা (রাঃ) বলিতেছেন যে, স্বয়ং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া হাদীছটি ইরশাদ হইয়াছিল। তবে উভয় বর্ণনায় কোন বৈপরীত্ব নাই। কেননা হইতে পারে যে, একবার হযরত ওসায়দ (রাঃ)-কে এবং একবার তাঁহাকে সম্বোধন করা হইয়াছিল।

(নিজেকে আপনার হাতে সমর্পণ করিলাম এবং আমার মুখমণ্ডল আপনার অভিমুখী করিলাম) উভয় বাক্যের মর্ম মুলতঃ অভিন্ন। অর্থাৎ আমি নিজেকে এবং নিজের সকল অংগ প্রত্যংগকে আপনার আদেশ নিষেধের অনুগত করিলাম এবং আমার সম্পর্কে আপনার যাবতীয় ফায়সালা ও তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করিলাম এবং সমস্ত মাখলূক হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া আপনার পাক যাতের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করিলাম।

(আমার যাবতীয় বিষয় আপনার সোর্পদ করিলাম) আমার দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় বিষয়ে আপনার উপর ভরসা ও তাওয়াক্কুল করিলাম। আসবাব দ্বারা দুনিয়ার কোন কাজ হইবে না। আপনার হুকুমেই হইবে। তদ্রূপ আমল দ্বারা আখিরাতে কোন নাজাত হইবে না। আপনার হুকুমে এবং আপনার রহমেই হইবে। সুতরাং দুনিয়ার জিন্দেগীতে যেমন আসবাবের উপর আমার ভরসা নাই তদ্রূপ আখিরাতের জিন্দেগীতেও আমলের উপর আমার ভরসা নাই।

(আমার পিঠ আপনার সংগে যুক্ত করিলাম) অর্থাৎ যেহেতু দুনিয়ার সকল শক্তি ক্ষণস্থায়ী ও অকার্যকর এবং একমাত্র আপনার শক্তিই চিরস্থায়ী ও কার্যকর সেহেতু আমি আপনার বলে বলীয়ান হইতে চাই এবং আপনার হিফাযত লাভ করিতে চাই।

(আগ্রহ ও ভয়ের সহিত) আমার অন্তরে আপনার রহমতের কারণে ছাওয়াব ও প্রতিদান লাভের আশা যেমন আছে, তেমনি আপনার ক্রোধের কারণে শাস্তি ও আযাবের ভয়ও আছে। তবে আশা ও ভয় উভয় অবস্থায় আপনারই আশ্রয় আমি গ্রহণ করিব। কেননা আপনার আযাব

হইতে বাঁচিবার আপনি ছাড়া কোন আশ্রয়স্থান নাই।

ডান কাত হইয়া শোয়ার উপকারিতা এই যে, হৃদপিণ্ড তখন ঝুলিয়া থাকে না। ফলে উহা ঘুমে একেবারে মজিয়া যায় না। ফলে তাহাজ্জুদের জন্য শেষ রাত্রে জাগ্রত হওয়া সহজ হয়।

৮৩। চরম বিপদেও আল্লাহর উপর ভরসা থাকা চাই

الثَّامِنُ: عَنْ اَبِيْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمْرِ بْنِ كَعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ الْقُرَشِيِّ التَّيْمِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ - وَهُوَ وَاَبُوْهُ وَاُمُّهُ صَحَابَةٌ، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ - قَالَ: نَظَرْتُ اِلٰى اَقْدَامِ الْمُشْرِكِيْنَ وَنَحْنُ فِيْ الْغَارِ وَهُمْ عَلٰى رُؤُوْسِنَا فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ اَنَّ اَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَاَبْصَرَنَا. فَقَالَ: «مَا ظَنُّكَ يَا اَبَا بَكْرٍ بِاِثْنَيْنِ اللّٰهُ ثَالِثُهُمَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ)– হইতে বর্ণিত, (তিনি ও তাঁহার পিতা-মাতা সকলেই ছাহাবী, রাদিয়াল্লাহু আনহুম) তিনি বলেন, (হিজরতের সময়) আমরা গুহায় অবস্থান করা অবস্থায় আমি মুশরিকদের পা দেখিতে পাইলাম। তাহারা আমাদের মাথার উপরে ছিল। তখন আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহাদের কোন একজন যদি আপন পদদ্বয়ের নীচে তাকায় তবে সে অবশ্যই আমাদিগকে দেখিতে পাইবে। তিনি বলিলেন, হে আবু বকর! ঐ দুইজন সম্পর্কে তোমার কি ধারণা যাহাদের তৃতীয়জন হইলেন আল্লাহ!

(বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

মদীনায় হিজরত করিবার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে সংগে করিয়া রাত্রের অন্ধকারে মক্কা হইতে বাহির হইলেন এবং ছাওর পাহাড়ের এক গুহায় তিনদিন পর্যন্ত আত্মগোপন করিয়া থাকিলেন। মক্কার কোরায়শরা টের পাইয়া তাঁহার সন্ধানে চারিদিকে ছুটিতে লাগিল। এমন কি একদল মুশরিক ছাওর পাহাড়ের গুহার মুখের সামনে আসিয়া উপস্থিত হইল। গুহার মুখটি ছিল খুব সংকীর্ণ। তদুপরি আল্লাহর হুকুমে এক মাকড়সা গুহামুখে জাল বুনিয়া ফেলিল। ফলে ভিতরে কোন মানুষ থাকিতে পারে ইহা তাহারা ধারণাই করিতে পারিল না। গুহার এই একটি মাত্র সংকীর্ণ দরওয়াজাই ছিল তখন। কিন্তু বর্তমানে অপর দিকে একটি প্রশস্ত মুখ রহিয়াছে। ইহা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মু'জিযা রূপে আল্লাহ সেই মুহূর্তে সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিলেন। ঘটনা এই যে, গুহার মুখে মুশরিকদের উপস্থিতির কারণে বিচলিত হইয়া হযরত আবু বকর (রাঃ) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহারা যদি গুহায় ঢুকিয়া পড়ে তবে আমরা কি করিব? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার পবিত্র হাত দ্বারা গুহার অপর দিকে ইংগিত করিয়া বলিলেন, আমরা এই দিক দিয়া বাহির হইয়া যাইব। অথচ সেইদিকে তখন গুহার কোন মুখ ছিল না। কিন্তু আল্লাহ পাকের কুদরতে তৎক্ষণাৎ সেই দিকে গুহার মুখ খুলিয়া গেল।

(আমরা গুহায় অবস্থান করা অবস্থায়) ইহা মক্কা হইতে তিন মাইল দূরবর্তী ছাওর পাহাড়ের গুহা। মোট দুইটি পর্বত-গুহার সহিত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

সম্পর্ক হইয়াছিল। অপরটি হইল হেরা পর্বতের গুহা। কেহ কেহ বলেন, হেরা গুহা উত্তম। কেননা আল্লাহ পাক ঐ গুহাকে প্রথম অহী অবতরণের জন্য নির্বাচিত করিয়াছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্জন ইবাদতের জন্য উহাকে পছন্দ করিয়াছিলেন। অন্যদের মতে ছাওর পর্বতের গুহা উত্তম। কেননা কোরআনে আল্লাহ উহার আলোচনা করিয়াছেন এবং উহার দ্বারা আল্লাহ তাঁহার শ্রেষ্ঠ রাসূলকে হিফাযত করিয়াছেন।

(ঐ দুইজন সম্পর্কে তোমার কি ধারণা) বস্তুতঃ ইহা ছিল মানব সভ্যতার ইতিহাসের সবচাইতে গুরুতর সংকট মুহূর্ত। দৃশ্যটির ভয়াবহতা একবার কল্পনা করুন। অতঃপর চিন্তা করিয়া দেখুন, এমন মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রতি কেমন ভরসা ও তাওয়াক্কুল প্রকাশ করিতেছেন এবং কেমন প্রশান্ত চিত্তে হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে শান্ত্বনা দিতেছেন।

আলোচ্য হাদীছের শিক্ষা ইহাই যে, সংকট যতই কঠিন হউক এবং মুছীবত যতই গুরুতর হউক এবং ভবিষ্যত যতই অন্ধকার মনে হউক যে আল্লাহর উপর ভরসা ও তাওয়াক্কুল করিবে তিনি তাঁহার হিফাযতের জন্য যথেষ্ট হইবেন।

এই ঘটনা কোরআন শরীফে এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে–

فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِىَ اثْنَيْنِ اِذْهُمَا فِى الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا *

আল্লাহ তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছেন ঐ সময় যখন কাফিররা তাঁহাকে বহিষ্কার করিয়াছিল। তিনি ছিলেন দুইজনের একজন, যখন তাঁহারা গুহার মধ্যে ছিলেন। তখন তিনি আপন সংগীকে বলিলেন, চিন্তিত হইও না। আল্লাহ আমাদের সংগে আছেন।

বস্তুতঃ যিনি আল্লাহর সংগ লাভে ধন্য হইবেন জগত সংসারে কোন কিছুরই ভয় বা উৎকণ্ঠা তাহার থাকিতে পারে না। আর এই উম্মতের প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ করুণা এই যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতে উম্মতকেও আল্লাহ পাক তাঁহার সংগ ও সান্নিধ্য দানের সুসংবাদ ঘোষণা করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে–

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ *

নিঃসন্দেহে আল্লাহ ছবরকারীদের সংগে রহিয়াছেন।

আরও ইরশাদ হইয়াছে–

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوا وَ الَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ *

নিঃসন্দেহে আল্লাহ ঐ লোকদের সংগে রহিয়াছেন যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করিয়াছে এবং যাহারা নেক আমলকারী।

(অবশ্যই আমাদিগকে দেখিতে পাইবে।) এই উৎকণ্ঠা ও চিন্তাগ্রস্ততা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নহে। ইহা মানুষের স্বভাবজাত। ইহা দুনিয়াদারকে পর্যায়ক্রমে নিরাশার দিকে লইয়া যায়। আর আল্লাহওয়ালাকে অধিকতর আল্লাহমুখী করে। তখন আল্লাহ তাঁহার অন্তরে সাকীনা

ঢালেন। ফলে স্বভাবজাত উৎকণ্ঠাটুকুও তাহার দূর হইয়া যায়। তাহাছাড়া হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর উৎকণ্ঠা তাঁহার নিজের জন্য ছিল ন। ছিল দোজাহানের সরদার রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য।

৮৪। ঘর হইতে বাহির হইবার দু'আ

. اَلتَّاسِعُ: عَنْ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اُمِّ سَلَمَةَ، وَاسْمُهَا هِنْدُ بِنْتُ اَبِيْ اُمَيَّةَ حُذَيْفَةَ الْمَخْزُوْمِيَّةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ: «بِسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ، اَوْ اَزِلَّ اَوْ اُزَلَّ اَوْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ، اَوْ اَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ» حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ رَوَاهُ اَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمَا بِاَسَانِيْدَ صَحِيْحَةٍ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، وَهٰذَا لَفْظُ اَبِيْ دَاوُدَ.

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। (তাঁহার আসল নাম হিন্দ বিনতে আবী উমাইয়া হোযায়ফা, গোত্র বনু মাখযুম।) তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁহার ঘর হইতে বাহির হইতেন তখন এই দু'আ পড়িতেন-

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ، اَوْ اَزِلَّ اَوْ اُزَلَّ، اَوْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ، اَوْ اَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ *

আমি আল্লাহর নাম বলিয়া বাহির হইতেছি এবং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করিতেছি। আমি নিজে পথভ্রষ্ট হওয়া কিংবা অন্যের দ্বারা পথভ্রষ্ট হওয়া এবং নিজে পদস্খলিত হওয়া কিংবা অন্যের দ্বারা পদস্খলিত হওয়া এবং নিজে জুলুম করা কিংবা অন্যের জুলুমের শিকার হওয়া এবং নিজে মূর্খতা-(পূর্ণ আচরণ) করা কিংবা অন্যের মুর্খতা (মূলক আচরণের) শিকার হওয়া হইতে আপনার পানাহ চাহিতেছি।

(ছহীহ হাদীছ, আবু দাউদ ও তিরমিযী)

ফায়দা ঃ

(যখন বাহির হইতেন) ওলামায়ে কেরাম ইহার দুইটি অর্থ করিয়াছেন, (ক) ঘর হইতে বাহির হইবার পর পর এই দু'আ পড়িতেন। (খ) যখন বাহির হইবার ইচ্ছা করিতেন তখন এই দু'আ পড়িতেন।

আবু দাউদ শরীফের বর্ণনা এইরূপ-

;রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই তাঁহার ঘর হইতে বাহির হইতেন আসমানের দিকে নযর তুলিতেন এবং বলিতেন ....

(আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করিতেছি) অর্থাৎ আমার অবর্তমানে ঘর এবং ঘরওয়ালাদের হিফাযতের যে ইন্তিজাম করিয়াছি উহার উপর আমার ভরসা নহে। তদ্রূপ যে উদ্দেশ্য লাভের জন্য বাহির হইতেছি উহার ক্ষেত্রেও আমার মেহনতের উপর ভরসা নহে। বরং আপনার পাক যাতের উপর ভরসা। আপনিই স্বীয় গায়বী কুদরত দ্বারা ঘরের হিফাযত করিবেন এবং বাহির

হইবার মাকছুদ পুরা করিবেন এবং নিরাপদে ঘরওয়ালাদের মাঝে ফিরাইয়া আনিবেন।

(নিজে পথভ্রষ্ট হওয়া) মানুষের পথভ্রষ্টতার কারণ দুইটি, নিজের নফস কিংবা শয়তানের প্ররোচনা। এখানে নফসের ধোকা এবং শয়তানের প্ররোচনা উভয়টি হইতে পানাহ চাওয়া হইয়াছে।

(নিজে মূর্খতাপূর্ণ আচরণ করা) অর্থাৎ এমন কোন কাজ করা যাহা আমার শান মুতাবিক নহে এবং আমার স্বভাবসম্মত নহে।

৮৫। ঘর হইতে বাহির হইবার দু'আর ফযীলত

. اَلْعَاشِرُ: عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ يَعْنِيْ اِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ-: بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ، يُقَالُ لَهُ: هُدِيْتَ وَكُفِيْتَ وَوُقِيْتَ، وَتَنَحّٰى عَنْهُ الشَّيْطَانُ». رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمْ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ، زَادَ اَبُوْ دَاوُدَ: «فَيَقُوْلُ: - يَعْنِي الشَّيْطَانَ - لِشَيْطَانٍ آخَرَ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ؟».

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি (আপন গৃহ হইতে বাহির হইবার সময়) এই দু'আ পড়িবে–

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ، لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ *

আমি আল্লাহর নামে বাহির হইতেছি এবং আল্লাহর উপর ভরসা করিতেছি। আল্লাহ ছাড়া কাহারো কোন শক্তি ও ক্ষমতা নাই।

তখন (আল্লাহর পক্ষ হইতে ফিরিশতাগণের মাধ্যমে) তাহাকে বলা হয়, তোমাকে সরল পথ প্রদর্শন করা হইল এবং তোমার দায়িত্ব গ্রহণ করা হইল এবং তোমাকে রক্ষা করা হইল। আর শয়তান তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যায়। (আবু দাউদ, নাসাঈ, ও অন্যান্য)

ইমাম আবু দাউদ অতিরিক্ত এই অংশটুকু বর্ণনা করিয়াছেন। তখন এক শয়তান অপর শয়তানকে বলিতে থাকে, এমন লোকের উপর কিভাবে তোমার ক্ষমতা চলিতে পারে যাহাকে হিদায়াত দান করা হইয়াছে এবং (আল্লাহর পক্ষ হইতে) যাহার দায়িত্ব গ্রহণ করা হইয়াছে এবং যাহাকে রক্ষা করা হইয়াছে?

ফায়দা ঃ

অর্থাৎ যেহেতু তুমি আল্লাহর নামের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এবং তাঁহার উপর ভরসা করিয়া বাহির হইয়াছ এবং গায়রুল্লাহর যাবতীয় ক্ষমতা অস্বীকার এবং আল্লাহ পাকের সর্বময় ক্ষমতা স্বীকার করিয়া সমস্ত বিষয় তাঁহার হাতে সোপর্দ করিয়াছ সেহেতু যেই উদ্দেশ্য লাভের জন্য তুমি বাহির হইয়াছ উহা লাভ করিবার সঠিক পথ তোমাকে প্রদর্শন করা হইবে এবং ঘর ও ঘরওয়ালাদের হিফাযতের যেই দায়িত্ব এতক্ষণ পর্যন্ত বাহ্যত তুমি পালন করিতেছিলে ঐ

দায়িত্ব তোমার পক্ষ হইতে ফিরিশতাগণ পালন করিবেন এবং শত্রুর সকল অনিষ্ট হইতে তোমাকে রক্ষা করিবেন।

কিংবা এমনও অর্থ হইতে পারে যে, তোমাকে ছিরাতুল মুস্তাকিমের উপর অবিচল রাখা হইল। ফলে কখনো তুমি গোমরাহ হইবে না এবং দ্বীন ও দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়ে তোমার দায়িত্ব গ্রহণ করা হইল। ফলে কখনো তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না এবং আখিরাতের যাবতীয় আযাব হইতে তোমাকে রক্ষা করা হইল। ফলে মউত হইতে শুরু করিয়া জান্নাতে দাখিল হওয়া পর্যন্ত তুমি কোন পেরেশানির সম্মুখীন হইবে না।

শয়তান যখন তাঁহাকে সর্বদিক হইতে সুরক্ষিত দেখে তখন তাহার ক্ষতি সাধনের ব্যাপারে হতাশ হইয়া সরিয়া পড়ে।

বিশেষ ফায়দা ঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, জিবরীল আল্লাহর পক্ষ হইতে لا حول ولا قوة الا بالله -এর এই অর্থ বলিয়াছেন, لا حول -যাবতীয় গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকিবার কোন সাধ্য নাই আল্লাহর সুরক্ষা ছাড়া এবং আল্লাহর আনুগত্য করিবার কোন সামর্থ্য নাই আল্লাহর তাওফীক ছাড়া।

ফাতহুল মিশকাত গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, এই বিষয়ে সর্বোত্তম হাদীছ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে ছিলাম, আমি এই কালিমাটি উচ্চারণ করিলাম, তখন তিনি বলিলেন, তুমি কি ইহার ব্যাখ্যা জান? আমি আরয করিলাম, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল অধিক জানেন। তিনি বলিলেন, (ইহার অর্থ এই) আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আল্লাহর নাফরমানি হইতে বাঁচিয়া থাকিবার কোন সাধ্য নাই এবং আল্লাহর আনুগত্য করিবারও কোন সার্মথ্য নাই।

কালিমাটিকে শুধু নাফরমানি ও আনুগত্যের সহিত খাছ করিবার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, এই দুইটিই হইল দ্বীন ও শরীয়তের মূল বিষয়।

৮৬। দুর্বলের বরকতে রিযিক লাভ

وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ اَخَوَانِ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ اَحَدُهُمَا يَاْتِي النَّبِيَّ ﷺ، وَالْاٰخَرُ يَحْتَرِفُ، فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ اَخَاهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ عَلٰى شَرْطِ مُسْلِمٍ.

«يَحْتَرِفُ»: يَكْتَسِبُ وَيَتَسَبَّبُ.

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় দুই ভাই ছিলেন। একজন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে আসা যাওয়া করিতেন। অন্যজন জীবিকা উপার্জন করিতেন। (উহা দ্বারা উভয়ের প্রয়োজন পুরা হইত) একদিন উপার্জনকারী লোকটি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে আপন ভাইয়ের নামে অভিযোগ করিলেন (যে, সে উপার্জনের কাজে আমার কোন সহযোগিতা করে না।) তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম (তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া) বলিলেন, হয়ত তাহারই কারণে তুমি রিযিক লাভ করিতেছ। (তিরমিযি শরীফ)

ফায়দা ঃ

অর্থাৎ তোমার ভাইয়ের প্রতি সহমর্মিতার কারণেই হয়ত তোমার রিযিক লাভ করা সহজ হইতেছে। কেননা হাদীছ শরীফে আছে–

الله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه *

বান্দা যতক্ষণ তাহার ভাইকে সাহায্য করে ততক্ষণ আল্লাহ্‌ বান্দাকে সাহায্য করিয়া থাকেন।

অন্য হাদীছে আছে–

و هل ترزقون (او قال: تنصرون) الا بضعفائکم *

তোমরা তোমাদের দুর্বলদের ওছিলাতেই রিজিক (বা সাহায্য) লাভ করিয়া থাক।

এই প্রসংগে নিম্নের ঘটনাটি খুবই শিক্ষণীয়। শায়খুল হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া (রহঃ) বলেন, আমার চাচাজান মাওলানা মুহম্মদ ইলয়াস (রহঃ) শৈশবকাল হইতেই স্বাস্থ্যগত দুর্বলতার কারণে শারীরিক পরিশ্রম করিতে পারিতেন না। ফলে ইলম, যিকির ও ইবাদতেই তাঁহার অধিকাংশ সময় ব্যয় হইত। পক্ষান্তরে আমার আব্বা মাওলানা ইয়াহ্‌য়া ছাহেব ছিলেন অত্যন্ত কর্মব্যস্ত ও কষ্টসহিষ্ণু মানুষ। নিজস্ব বাণিজ্যিক কুতবখানার যাবতীয় কাজ তিনি একাই আঞ্জাম দিতেন। ইহাই ছিল দুই ভাইয়ের জীবিকার প্রধান অবলম্বন। কুতুবখানার ব্যবস্থাপক, যিনি মাওলানা ইয়াহ্‌য়া ছাহেবের খুব দরদী ও হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তিনি একদিন সহানুভূতি হিসাবে তাঁহাকে বলিলেন, মৌলভী ইলয়াসও তো কুতুবখানা হইতে উপকৃত হইতেছেন। অথচ তিনি তো কুতুবখানার কোন কাজে শরীক হন না। তাঁহাকেও কোন দায়িত্ব দিলে ভাল হয়। আমার আব্বা মাওলানা ইয়াহ্‌য়া ছাহেব এই কথায় খুবই মনক্ষুণ্ন হইলেন এবং হাদীছ উল্লেখ করিয়া বলিলেন, আমার তো বিশ্বাস যে, এই দুর্বল ও রুগ্ন বালকটির বরকতেই আমরা রিযিক পাইতেছি। সুতরাং তাহাকে যেন কাজের কথা কিছু না বলা হয়। যাহা বলিবার আমাকেই যেন বলা হয়।

এক পিতৃহীন অন্ধ তালিবুল ইলমের কথা জানি। তাহার বড় ভাই তাহার খুবই যত্ন করেন এবং নিজের সামান্য হালাল কামাই হইতে বড় উদারতার সহিত এতিম ভাইটির জন্য খরচ করেন। একদিন কথা প্রসংগে তিনি বড় আবেগের সহিত বলিলেন, আমি তো মনে করি, এই অন্ধ এতীম ভাইটির ওছীলায় আমি চলিতেছি। হাদীছের কথা তিনি জানিতেন না। যখন তাহাকে হাদীছটি তরজমাসহ শোনানো হইল তখন তাহার দুই চক্ষু হইতে ঝরঝর করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। সেই পবিত্র দৃশ্যটি আজও যেন চোখের সামনে ভাসিতেছে। আল্লাহ্‌ তাহাদের উভয়কে কবুল করুন। আমীন।

আরেকটি ঘটনা বলি। তালিবে ইলমী জীবনে এক সহপাঠী ছিলেন। বড়ই নেককার। কোন কারণে তাহার তিন ভাই তাহার খরচ বন্ধ করিয়া দিল। তিনি বলিলেন, আপনাদের খরচ করিবার প্রয়োজন নাই। আমার খরচ আল্লাহ্‌ চালাইবেন। তবে কোন দিন যদি আপনাদের খরচ

গ্রহণ করিবার অনুরোধ করেন তখন কিন্তু আর গ্রহণ করিব না। তখন দোষ ধরিতে পারিবেন না। আল্লাহর কি শান! তাহাই হইল। উক্ত তালিবে ইলমের খরচের ব্যবস্থা হইয়া গেল। কিন্তু ভাইদের সংসারে আশ্চর্য রকমের অভাব লাগিল। বড় ভাই অনুতপ্ত হইয়া আসিল এবং তালিবে ইলম ভাইকে পূর্বের মত খরচ গ্রহণের অনুরোধ করিল। কিন্তু তিনি বিনয়ের সহিত বলিয়া দিলেন, আমার প্রয়োজন নাই।

বস্তুতঃ এই দুনিয়ায় আল্লাহ্ পাকের দুইটি নিযাম চলিতেছে, জাহেরী নিযাম ও গায়বী নিযাম। তন্মধ্যে গায়বী নিযামই হইল আসল। জাহেরী নিযাম হইল গায়বী নিযামের উপর পর্দা স্বরূপ। জাহেরী নিযাম হিসাবে তো ইহাই মনে হয় যে, আমার মেহনতবলেই আমি উপার্জন করিতেছি। সুতরাং ইহাতে অন্যের কোন দখল থাকিতে পারে না। কিন্তু গায়বী নিযাম এই যে, যাহাদের প্রতিপালনের যিম্মাদারি আমার উপর বর্তাইয়াছে তাহাদের রিযিক আমার হাতে দেওয়া হইতেছে, যাহাতে আমার আমলের পরীক্ষা হইয়া যায়। সুতরাং আমাদের অবশ্যকর্তব্য, এই ধরণের ক্ষেত্রে হাদীছ হইতে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং তদনুযায়ী আমল করা। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

এখানে এই শিক্ষাও পাওয়া যায় যে, যে ব্যক্তি ইলম হাছিল করিবার উদ্দেশ্যে বাহির হইবে কিংবা আল্লাহর রাস্তায় নিজেকে সমর্পণ করিবে এবং আল্লাহর তদবিরের উপর ভরসা করিয়া নিজের তদবির ত্যাগ করিবে এবং আল্লাহর তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবে আল্লাহ্ পাক তাহার যাবতীয় প্রয়োজন নিজেই পুরা করিয়া দিবেন। হাদীছ শরীফে আছে–

تكفل الله لطالب العلم بالرزق *

আল্লাহ্ পাক তালিবুল ইলমের রিযিকের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। (অর্থাৎ সহজে রিযিক পৌঁছাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। কেননা সাধারণভাবে তো সমস্ত মাখলূকেরই রিযিকের যিম্মাদারি আল্লাহ্ পাকের)

অধ্যায় – ৮

ইস্‌তিকামাত বা অবিচলতা

ইমাম রাগিব (রহঃ) বলেন, الاستقامة অর্থ (শরীয়ত-প্রদর্শিত) সরল পথে অবিচল থাকা। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেন, ইস্‌তিকামাত (বা অবিচলতা) দুইটি বিষয়ের নাম। প্রথমতঃ আল্লাহর প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান। দ্বিতীয়তঃ যাহেরী ও বাতেনী উভয় দিক হইতেই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত শরীয়তের পরিপূর্ণ অনুসরণ। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, ইস্‌তিকামাত অর্থ এই যে, শরীয়তের প্রতিটি আদেশ নিষেধ তুমি পালন করিয়া যাইবে এবং ধূর্ত শৃগালের ন্যায় উহা হইতে পলায়নের চেষ্টা করিবে না।

আয়াতসমূহ

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ *

(হে নবী!) আপনি অবিচল থাকুন যেমন আপনাকে আদেশ করা হইয়াছে।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ * نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ * نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ *

নিঃসন্দেহে যাহারা বলে যে, আল্লাহ্ আমাদের প্রতিপালক! অতঃপর তাহারা (এই তাওহীদী বিশ্বাসের উপর) অবিচল থাকে (মৃত্যুর সময়) তাহাদের নিকট ফিরিশতা অবতরণ করেন (এবং তাহাদিগকে অভয় দিয়া বলেন,) তোমরা (মৃত্যু ও মৃত্যুপরবর্তী জীবন সম্পর্কে) ভয় করিও না এবং (দুনিয়াতে রাখিয়া যাওয়া পরিবার পরিজন সম্পর্কে) চিন্তিত হইও না। (কেননা আল্লাহ্ স্বয়ং তাহাদের তত্ত্বাবধান করিবেন) এবং সেই জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর যাহার প্রতিশ্রুতি তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল। দুনিয়ার জীবনে আমরা তোমাদের হিফাযতকারী ছিলাম এবং আখিরাতেও (জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত আমরা তোমাদের সংগে থাকিব, উহাতে (অর্থাৎ জান্নাতে) তোমাদের মনের চাহিদা মত সকল জিনিস রহিয়াছে এবং উহাতে তোমাদের ঐ সমস্ত জিনিসও রহিয়াছে যাহা তোমরা তলব করিবে। ইহা ক্ষমাময় ও দয়াময়। (আল্লাহর) পক্ষ হইতে (তোমাদের জন্য) মেহমানদারি।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ * اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ *

নিঃসন্দেহে যাহারা বলে যে, আল্লাহ্ আমাদের প্রতিপালক অতঃপর তাহারা (মৃত্যু পর্যন্ত এই তাওহীদী বিশ্বাস ও ঈমানের উপর) অবিচল থাকে তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা চিন্তাগ্রস্তও হইবে না। উহারাই হইবে জান্নাতবাসী এবং সেখানে তাহারা চিরকাল থাকিবে। ইহা (দুনিয়াতে) তাহাদের কৃত আমলের প্রতিদান।

ফায়দা ঃ

(যেমন আদেশ করা হইয়াছে) এই আয়াতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হইয়াছে। এই নির্দেশ নিছক তাকীদ প্রকাশের জন্য। কেননা তিনি তো অবিচলতার উপরই ছিলেন। উহা হইতে কখনও বিচ্যুত হন নাই। সুতরাং ইহা যেন দণ্ডায়মান ব্যক্তিকে বলা হইল قم حتى آتيك আমি ফিরিয়া আসা পর্যন্ত দাঁড়াও। অর্থাৎ দণ্ডায়মান অবস্থা অব্যাহত রাখ। তাফসীরে কুরতুবীতে আছে যে, সূরা হূদ-এর এই আয়াতটিই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্রুত বার্ধক্য ডাকিয়া আনিয়াছিল।

হযরত আবু আলী শানাবী (রহঃ) বলেন, আমি স্বপ্নযোগে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেয়ারত সৌভাগ্য লাভ করিলাম এবং আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার নিকট আপনার হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে যে, আপনি বলিয়াছেন, সূরা হূদ আমাকে বৃদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। তিনি ইরশাদ করিলেন, ঠিকই শুনিয়াছ। আমি আরয করিলাম, সূরার কোন্ বিষয়টি আপনাকে বৃদ্ধ করিল, নবীগণের ঘটনাবলী নাকি বিভিন্ন উম্মতের ধ্বংসের বিবরণ? তিনি ইরশাদ করিলেন, না, বরং فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ এই আয়াতটি।

সুতরাং বোঝা গেল যে, শরীয়তের উপর অবিচল থাকা কত কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ এবং এই বিষয়ে আমাদের কতখানি সচেষ্ট হওয়া উচিত।

(দ্বিতীয় আয়াত) (তাহাদের নিকট ফিরিশতা অবতরণ করেন) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর মতে ইহা মৃত্যুর সময় হইবে। এই মত অনুসারেই তরজমা করা হইয়াছে।

হযরত বারা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে আসিয়াছে, তিনি বলেন—

ان الملائكة تقول لروح المؤمن اخرجى ايتها الروح الطيبة فى الجسد الطيب كنت تعمرينه اخرجى الى روح و ريحان و رب غير غضبان *

ফিরিশতাগণ মুমিনের রূহকে বলেন, হে উত্তম দেহে অবস্থানকারী উত্তম রূহ! যে দেহকে তুমি সজীব রাখিয়াছিলে উহা হইতে বাহির হও এবং ফুলে ফলে সুশোভিত জান্নাতে এবং সন্তুষ্ট প্রতিপালকের সান্নিধ্যে চল।

হযরত ছাবিত বলেন, আমার নিকট এই হাদীছ পৌঁছিয়াছে যে, মুমিন বান্দাকে যখন আল্লাহ কবর হইতে উত্থিত করিবেন, তখন দুনিয়াতে যেই দুই ফিরিশতা (আমলনামা লিখিবার জন্য) তাহার সংগে ছিলেন তাঁহারা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এবং তাহাকে বলিবেন, ভয় করিও না এবং চিন্তা করিও না, বরং প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর। তখন মুমিন বান্দা খুশী হইয়া যাইবে।

হযরত যায়দ বিন আসলাম বলেন, ফিরিশতাগণ তাহাকে মৃত্যুর সময়, কবরের জিন্দেগী শুরু করিবার সময় এবং কবর হইতে পুনরুত্থানের সময় সুসংবাদ দান করিবেন। আল্লামা ইবনে কাছীর (রহঃ) বলেন, ইহা খুবই সুন্দর অভিমত যাহা অন্য সকল অভিমতকে বেষ্টনকারী এবং ইহাই বাস্তব।

(তোমাদের মনের চাহিদা মত সকল জিনিস রহিয়াছে) ইহার ব্যাখ্যা প্রসংগে ইবনে আবী হাতিম একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহঃ) একদিন হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তখন আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিলেন, আমি আল্লাহর নিকট দু'আ করি যেন তিনি আমাকে ও তোমাকে জান্নাতের বাজারে একত্র করেন। হযরত সাঈদ (রহঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, জান্নাতে কি বাজারও থাকিবে? তিনি বলিলেন, হাঁ, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে খবর দিয়াছেন যে, জান্নাতীগণ যখন জান্নাতে প্রবেশ করিবেন এবং নিজ নিজ আমল অনুযায়ী স্থান গ্রহণ করিবেন তখন তাহাদিগকে দুনিয়ার দিন হিসাবে জুমার দিন পরিমাণে একদিন অনুমতি প্রদান করা হইবে। ঐ সময় তাহারা আল্লাহর দীদার লাভ করিবেন। তাহাদের সামনে আরস প্রকাশ পাইবে এবং জান্নাতের এক বাগানে আল্লাহ তাহাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করিবেন।

তাহাদের জন্য নূরের বহু মিম্বর এবং যাবারজাদের বহু মিম্বর এবং স্বর্ণের বহু মিম্বর এবং চাঁদির বহু মিম্বর স্থাপন করা হইবে। তাহাদের মাঝে সর্বনিম্ন দরজার জান্নাতী মিশকের ও কাফুরের টিলায় বসিবে। তবে জান্নাতীদের মাঝে কেহ নীচ হইবে না এবং কুরসি ও মিম্বরওয়ালাদিগকে নিজেদের চাইতে উচ্চ মর্তবার মনে হইবে না।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি আমাদের প্রতিপালককে দেখিতে পাইব? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা কি সূর্য ও পূর্ণিমার চাঁদ দেখিবার ব্যাপারে সন্দেহ কর? আমরা বলিলাম, না। তিনি বলিলেন, তদ্রূপ তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে অবলোকন করিবার ব্যাপারে কোন সন্দেহ করিবে না।

ঐ মজলিসে এমন কেহ থাকিবে না যাহার সহিত আল্লাহ সরাসরি কথা বলিবেন না। এমন কি তাহাদের একজনকে তিনি বলিবেন, হে অমুকের পুত্র অমুক! ঐ দিনের কথা কি তোমার মনে পড়ে যেদিন তুমি এই এই কাজ করিয়াছ। আল্লাহ তাহাকে দুনিয়ায় তাহার কৃত পাপগুলি স্মরণ করাইয়া দিবেন। সে বলিবে, হে প্রতিপালক! আপনি কি আমাকে ক্ষমা করেন নাই। তিনি বলিবেন, অবশ্যই ক্ষমা করিয়াছি। আমার মাগফিরাতের প্রশস্ততার কারণেই তো তুমি তোমার এই মর্তবায় উপনীত হইয়াছ। (হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, তাহারা ঐ মজলিসে থাকা অবস্থায় একটি মেঘ তাহাদিগকে তাহাদের উপর হইতে ঢাকিয়া ফেলিবে এবং তাহাদের উপর এমন খুশবু বর্ষণ করিবে যাহার সুঘ্রাণের অনুরূপ কিছুই তাহারা (ইতিপূর্বে) পায় নাই। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমাদের প্রতিপালক বলিবেন, তোমাদের জন্য যে সম্মান আমি তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছি সেইখানে তোমরা যাও এবং তোমাদের যাহা কিছু ইচ্ছা হয় গ্রহণ কর। (হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, তখন আমরা এমন একটি বাজারে গমন করিব যাহাকে ফিরিশতাগণ বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছেন। সেইখানে এমন সকল নেয়ামত থাকিবে যাহার নমুনা কোন চক্ষু অবলোকন করে নাই। কোন কর্ণ শ্রবণ

করে নাই এবং কোন অন্তর চিন্তা করে নাই। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, তখন আমরা যাহা কিছু ইচ্ছা করিব তাহাই আমাদের জন্য বহন করা হইবে। সেইখানে কিছুই ক্রয় বিক্রয় করা হইবে না। ঐ বাজারে জান্নাতীগণ পরস্পর সাক্ষাৎ করিবে তখন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী জান্নাতী তাহার চাইতে কম দরজার জান্নাতীদের সহিত সাক্ষাৎ করিবে। অবশ্য তাহাদের মাঝে কেহই নিকৃষ্ট হইবে না। তখন কম দরজার জান্নাতী উচ্চ মর্তবার জান্নাতীর লেবাছ দেখিয়া চমৎকৃত হইবে। কিন্তু তাহার কথা শেষ হইবার পূর্বেই তাহার শরীরে উহার চাইতে উত্তম লেবাছ দেখিতে পাইবে। ইহা এই কারণে যে, জান্নাতে কেহ দুঃখিত হইতে পারিবে না।

অতঃপর আমরা আমাদের বাসস্থানে ফিরিয়া আসিব। তখন আমাদের স্ত্রীগণ আমাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়া বলিবে। আমাদের প্রিয়জনকে স্বাগতম। আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবার সময় তুমি যেমন ছিলে উহার চাইতে অধিক সৌন্দর্য ও খুশবুসহ ফিরিয়া আসিয়াছ। তখন সে বলিবে, আজ আমরা আমাদের মহাপরাক্রমশালী প্রতিপালকের মজলিসে বসিয়াছিলাম। সুতরাং যে অবস্থায় আমরা ফিরিয়া আসিয়াছি সেই অবস্থায় ফিরিয়া আসাই আমাদের জন্য শোভনীয় ছিল।

(যাহা তোমরা তলব করিবে) হাদীছ শরীফে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, জান্নাতে কোন পাখী উড়িতে দেখিয়া তোমাদের অন্তরে উহা খাইবার ইচ্ছা হইবে৷ তৎক্ষণাৎ উহা ভুনা অবস্থায় তোমাদের সামনে হাজির হইবে। আগুন ও ধোঁয়া কোন কিছুই উহাকে স্পর্শ করিবে না। আপনা আপনি রান্না হইয়া সামনে আসিয়া যাইবে। অন্য হাদীছে আছে, যদি জান্নাতী ব্যক্তি আপন গৃহে সন্তান লাভের ইচ্ছা করে তবে গর্ভধারণ, প্রসব, দুগ্ধপান ও যৌবনে পদার্পণ সমস্ত কিছু মুহূর্তে সম্পন্ন হইয়া যাইবে।

(মেহমানদারী) ইহা দ্বারা এই দিকে ইংগিত করা হইয়াছে যে, এমন বহু নেয়ামতও জান্নাতে থাকিবে যাহার আকাঙক্ষা বান্দার অন্তরে ছিল না। যেমন শাহী দস্তরখানে মেহমান হইলে এমন অনেক বস্তু সামনে আসে যাহা পূর্বে কল্পনাও করা হয় নাই।

(তৃতীয় আয়াত) (উহারাই জান্নাতবাসী, ইহা তাহাদের কৃত আমলের প্রতিদান।) যদিও বিভিন্ন আমলের প্রতিদান রূপে জান্নাতের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদের একটি আমলও এমন নহে যাহা আল্লাহর দরবারে কবুল হইতে পারে। সুতরাং আমল তো বাহানা মাত্র। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর রহম ও ফযল করমেই শুধু জান্নাত লাভ করা সম্ভব। তাই হাদীছ শরীফে আসিয়াছে–

لن يدخل احدكم الجنة بعمله *

তোমাদের কেহ তাহার আমল দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

অন্য হাদীছে এই দু'আ আসিয়াছে–

اَللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِنَا وَ رَحْمَتُكَ اَرْجٰى عِنْدَنَا مِنْ عَمَلِنَا *

হে আল্লাহ! তোমার মাগফিরাত আমাদের পাপসমূহ হইতে অধিক প্রশস্ত এবং তোমার রহমত আমাদের নিকট আমাদের আমল হইতে অধিক ভরসার বিষয়।

হাদীছসমূহ

৮৭। ঈমান ও ইস্‌তিকামাতই হইল পূর্ণাংগ শরীয়ত

وَعَنْ اَبِيْ عَمْرٍو، وَقِيْلَ: اَبِيْ عَمْرَةَ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ قُلْ لِيْ فِيْ الْاِسْلَامِ قَوْلًا لَا اَسْاَلُ عَنْهُ اَحَدًا غَيْرَكَ. قَالَ: «قُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ: ثُمَّ اسْتَقِمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٤).

হযরত আবু আমর (কিংবা আবু আমরাহ্) সুফিয়ান বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে এমন একটি (পূর্ণাংগ ও সুস্পষ্ট) কথা বলিয়া দিন যাহা সম্পর্কে আপনাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও আমি জিজ্ঞাসা করিব না। তিনি বলিলেন, তুমি বল, আমি আল্লাহর উপর ঈমান আনিলাম। অতঃপর ইহার উপর অবিচল থাক। (মুসলিম শরীফ)

ওলামায়ে কেরাম বলিয়াছেন, ইস্‌তিকামাতের অর্থ আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থাকা। ইহা অতি সারগর্ভ বাক্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত (এই ধরনের সুসংক্ষিপ্ত ও সুসমৃদ্ধ বাক্য রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান ছিল) এবং ইহারই উপর জীবনের সকল বিষয়ের শৃংখলা নির্ভর করে এবং আল্লাহই তাওফীকদাতা।

ফায়দা ঃ

(আমি আল্লাহর উপর ঈমান আনিলাম।) অর্থাৎ ঈমানের হাকীকত সম্পর্কে হাদীছে জিবরীলে যাহা কিছু বলা হইয়াছে ঐ গুলিকে অন্তরে জাগরূক কর। অতঃপর মুখে ইমানের কালিমা পুনরায় উচ্চারণ কর। অতঃপর মৃত্যু পর্যন্ত শরীয়তের যাবতীয় আদেশ পালন ও যাবতীয় নিষেধ পরিহার করিবার উপর অবিচল থাক। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, ইহা ঐ সকল হাদীছের একটি যাহাদের উপর পূর্ণাংগ ইসলাম কেন্দ্রীভূত।

আল্লাহ পাকের তাওফীক ছাড়া ইস্‌তিকামাত–এর গুণ অর্জন করা সম্ভব নহে। এই কারণেই হাদীছ শরীফে আসিয়াছে–

استقيموا و لن تطيقوا *

অর্থাৎ তোমরা ইস্‌তিকামাত অবলম্বন কর। অবশ্য পূর্ণভাবে তোমরা উহা কখনই পারিবে না। (তবে তোমাদের আন্তরিক চেষ্টাকে আল্লাহ খুশী হইয়া কবুল করিয়া লইবেন।)

৮৮। আমল দ্বারা কেহ নাজাত পাইবে না

وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «قَارِبُوْا وَسَدِّدُوْا، وَاعْلَمُوْا اَنَّهُ لَنْ يَّنْجُوَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ بِعَمَلِهِ»، قَالُوْا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: «وَلَا اَنَا اِلَّا اَنْ يَّتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَ«الْمُقَارَبَةُ»: الْقَصْدُ الَّذِيْ لَا غُلُوَّ فِيْهِ وَلَا تَقْصِيْرَ. وَ«السَّدَادُ»: الْاِسْتِقَامَةُ

وَالْإِصَابَةُ، وَ«يَتَغَمَّدَنِيْ»: يُلْبِسُنِيْ وَيَسْتُرُنِيْ.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَعْنَى الْإِسْتِقَامَةِ: لُزُوْمُ طَاعَةِ اللهِ تَعَالٰى؛ قَالُوْا: وَهِيَ مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ، وَهِيَ نِظَامُ الْأُمُوْرِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيْقُ.

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, মধ্যপন্থা অবলম্বন কর এবং অবিচল থাক। আর জানিয়া রাখ যে, তোমাদের কেহ তাহার আমল দ্বারা নাজাত পাইবে না। ছাহাবা কেরাম আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিও কি নহেন? তিনি বলিলেন, আমিও নহি, তবে যদি আল্লাহ আপন রহম ও ফযল দ্বারা আবৃত করিয়া নেন। (মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

ইমাম নববী (রহঃ) মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেন, আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের আকীদা এই যে, ছাওয়াব, শাস্তি ও হুকুম আহকাম ইত্যাদি বিষয়গুলি আকল ও যুক্তি প্রয়োগ দ্বারা সাব্যস্ত করা বৈধ নহে। ইহা শুধু শরীয়তের বাণী দ্বারা সাব্যস্ত হয়। তাহাদের আরও আকীদা এই যে, আল্লাহর উপর কোন কিছুই জরুরী ও বাধ্যতামূলক নহে। বরং দুনিয়া আখিরাতের সকল বিষয় তাঁহার কর্তৃত্বাধীন। তিনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন এবং যাহা ইচ্ছা আদেশ প্রদানের ক্ষমতা রাখেন। সুতরাং তিনি যদি সকল নেককার ও ফরমাবরদারদিগকে আযাব দিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করেন তবে ইহা তাঁহার ইনছাফই হইবে। তদ্রূপ যদি সকল কাফির মুশরিককে জান্নাতে দাখেল করেন তবে ইহা তাঁহার দয়া হইবে।

অবশ্য তিনি তাঁহার রাসূলের মাধ্যমে খবর দিয়াছেন এবং তাঁহার খবর চিরসত্য যে, তিনি এইরূপ করিবেন না। মুমিনদিগকে তিনি মাফ করিবেন এবং আপন রহমতে জান্নাতে দাখেল করিবেন এবং কাফিরদিগকে ইনছাফের কারণে আযাব দিবেন ও জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবেন।

আলোচ্য হাদীছ আমাদের এই বক্তব্যেরই সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, আপন আনুগত্য ও আমল দ্বারা কেহই ছাওয়াব ও জান্নাতের অধিকারী হইতে পারে না। যেই সকল আয়াত প্রমাণ করে যে, আমল দ্বারা মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করিবে। যেমন ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (তোমরা তোমাদের কৃত আমলের বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ কর) সেইগুলি আলোচ্য হাদীছের সহিত বিরোধপূর্ণ নহে। কেননা আয়াতের অর্থ হইল, আমল দ্বারা মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করিবে কিন্তু আমলের তাওফীক হওয়া, হিদায়াত লাভ করা, ইখলাছের সহিত আমল করা এবং সর্বোপরি আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়া এই সমস্তই আল্লাহ পাকের রহম ও ফযল করমের উপর নির্ভর করে।

মহান তত্ত্বজ্ঞানী ইবনে আবী জামরাহ (রহঃ) বলেন, আমল হইল জান্নাতে দাখেল হইবার বাহ্যিক উপায় ও সবব। আল্লাহ পাক তাঁহার খাছ হিকমতের কারণে ইহাকে উপায় ও সবব রূপে নির্ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা প্রকৃত কারণ নহে। প্রকৃত কারণ হইল আল্লাহ পাকের রহমত। আমলকে উহার উপর একটি আবরণ রূপে শুধু ব্যবহার করা হইয়াছে।

ইবনে আবী জামরাহ (রহঃ) আরও বলেন, الا ان يتغمدنى الله অংশটুকু হইতে ইহা

সুস্পষ্ট যে, আল্লাহর রাবুবিয়াতের হক আদায় করা কোন মানব সন্তানের পক্ষেই সম্ভব নহে। কেননা শ্রেষ্ঠমানব ও শ্রেষ্ঠরাসূল হযরত মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অক্ষমতা প্রকাশ করিতেছেন তখন অন্যদের তো কোন প্রশ্নই আসে না। যুক্তির আলোকে চিন্তা করিলেও এই সত্য পরিষ্কার হইয়া যাইবে। কেননা আল্লাহ পাক যদি আমাদের নিকট তাঁহার নেয়ামত সমূহের শুধু শোকর দাবী করেন তবেই আমরা অক্ষম হইয়া যাইব। কেননা আল্লাহ বলিতেছেন—

وَ اِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا *

তোমরা যদি আল্লাহর নেয়ামত গণনা করিতে চাহ তবে উহা গণনা করিতে পারিবে না।

শুধু নেয়ামতের শোকরের এই অবস্থা। অন্যান্য যাবতীয় হুকুম আহকাম তো রহিয়াই গেল। সুতরাং আল্লাহর রহমত ছাড়া আর কোন উপায় থাকিল না।

অধ্যায় – ৯

আল্লাহর বিরাট বিরাট সৃষ্টি, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়িত্ব, আখিরাতের ভয়াবহতা, দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করা এবং নফসের নিয়ন্ত্রণ ও সংশোধন এবং ইস্তিকামাত অর্জনে নফসকে উদ্বুদ্ধ করা।

বিরাট সৃষ্টি দ্বারা আরস, কুরসি, আসমান, যমীন ইত্যাদি বুঝানো হইয়াছে। আরসের বড়ত্ব সম্পর্কে হাদীছ শরীফে আসিয়াছে—

আসমান যমীন এবং উহাদের মধ্যবর্তী যাবতীয় বস্তুর পরিমাণ পৃথিবীর মরুভূমিতে ফেলিয়া রাখা একটি 'কড়ার' চাইতে বেশী নহে।

আর ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, সৃষ্টির বিরাটত্ব স্রষ্টার বিরাটত্ব ও পূর্ণত্ব প্রমাণ করে।

দুনিয়ার ক্ষণস্থায়িত্ব সম্পর্কে এই আয়াতটি প্রনিধানযোগ্য—

وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيٰوةِ كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ *

তাহাদের জন্য দুনিয়ার জীবনের (ক্ষণস্থায়িত্বের) উদাহরণ পেশ করুন। তাহা পানির ন্যায় যাহা আমি আসমান হইতে নাযিল করিয়াছি। ফলে তাহার সহিত ভূমিজ উদ্ভিদ সংমিশ্রিত হয় (এবং ঐ উদ্ভিদ সবুজ শ্যামল হয়) অতঃপর উহা এমন বিশুষ্ক ও চূর্ণবিচূর্ণ হয় যে, বাতাস উহাকে উড়াইয়া লইয়া যায়।

আখিরাতের ভয়াবহতা সম্পর্কে এই আয়াতটি প্রনিধানযোগ্য—

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ * يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا اَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَ تَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَ مَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَ لٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ

হে লোক সকল তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। নিঃসন্দেহে কেয়ামতের 'যালযালা' বিরাট ব্যাপার। যেদিন তোমরা উহা প্রত্যক্ষ করিবে সেইদিন প্রত্যেক স্তন্যদানকারিণী তাহার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বিস্মৃত হইবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তাহার গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ করিয়া ফেলিবে। আর মানুষকে তুমি দেখিতে পাইবে নেশাগ্রস্ত। অথচ প্রকৃতপক্ষে তাহারা নেশাগ্রস্ত নহে। কিন্তু (এমন হইবার কারণ এই যে,) আল্লাহর আযাব বড়ই কঠিন।

দুনিয়ার ক্ষণস্থায়িত্ব সম্পর্কে চিন্তাভাবনা মানুষকে দুনিয়াবিমুখ ও আখিরাতমুখী করে। হাদীছ শরীফে আসিয়াছে–

كونوا ابناء الاخرة و لا تكونوا ابناء الدنيا *

তোমরা আখিরাতের অভিলাষী হও; দুনিয়ার অভিলাষী হইও না।

এই চিন্তা ভাবনার মাধ্যমে আল্লাহ যদি বান্দার সামনে দুনিয়ার হাকীকত খুলিয়া দেন এবং গায়রুল্লাহর বেষ্টন হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাকে আপন সত্তার জন্য খালিছ করিয়া নেন তবে ইহাই তো চরম ও পরম লক্ষ্য।

তদ্রূপ কিয়ামত ও আখিরাতের ভয়াবহতা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা মানুষকে তাকওয়া অবলম্বনে এবং মাওলা পাকের আনুগত্যে আত্মনিয়োগ করিতে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে সে দুনিয়া আখিরাতের যাবতীয় পেরেশানী হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে।

(দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করা) অর্থাৎ এই চিন্তা করা যে, দুনিয়ার যাবতীয় বিষয় ক্ষণস্থায়ী এবং এই চিন্তা করা যে, আখিরাতের যাবতীয় বিষয় অতি ভয়াবহ।

(নফসের নিয়ন্ত্রণ) ইহার সহজ উপায় হইল মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ করা এবং মৃত্যুর হালাত সংক্রান্ত হাদীছ অধ্যয়ন করা। তখন নফস যাবতীয় লজ্জতের বিষয় ভুলিয়া যাইবে এবং দুনিয়ার বড় বড় আশা আকাঙক্ষা বর্জন করিয়া মৃত্যু ভয়ে ভীত হইয়া পড়িবে। এইভাবে লম্বা লম্বা আশার মাঝে ডুবিয়া থাকিবার বরবাদি হইতে নাজাত পাইবে। এই জন্য হাদীছ শরীফে বলা হইয়াছে–

اكثروا ذكر هاذم اللذات الموت *

তোমরা যাবতীয় স্বাদ বিনষ্টকারী মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর।

(নফসের নিয়ন্ত্রণ ও সংশোধন) নফসের সংশোধন অর্থ যাবতীয় মন্দ গুণ ও স্বভাব যথা হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার, কপটতা, মিথ্যা, কৃপণতা, লোভ-লালসা ও নীচতা হইতে নফসকে পবিত্র করা এবং যাবতীয় সৎগুণ যথা সত্যবাদিতা, বিনয়, দানশীলতা, পরহিতৈষণা ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত হওয়া। ইহা সম্ভব হইবে আল্লাহওয়ালাদের (ছোহবত ও) সংগলাভ এবং তাঁহাদের তারবিয়াত গ্রহণের মাধ্যমে।

(ইস্তিকামাত অর্জনে নফসকে উদ্বুদ্ধ করা) ইহার উপায় হইল আমলের ছাওয়াব ও ফযীলত এবং গোনাহের শাস্তি ও পরিণতিসম্পর্কিত আয়াত ও হাদীছ অধ্যয়ন করা এবং নেককারদের পুরস্কার ও বদকারদের শাস্তির ঘটনাবলী আলোচনা করা। বস্তুতঃ আল্লাহ যখন

বান্দাকে মদদ করেন এবং কিতাব ও সুন্নাহর অনুসরণের তাওফীক দান করেন তখনই সে ইস্তিকামাতের মর্তবা হাসিল করিতে পারে। আর আল্লাহ তাহাকেই দান করেন যে প্রার্থনা করে।

আয়াতসমূহ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

قُلْ اِنَّمَا اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰى وَ فُرَادٰى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا *

(হে নবী।) আপনি বলুন, আমি শুধু একটি বিষয়ে তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছি। তাহা এই যে, তোমরা দুইজন দুইজন করিয়া এবং একজন একজন করিয়া আল্লাহর জন্য উত্থিত হও। অতঃপর চিন্তা ভাবনা কর।

আল্লাহা তা'আলা আরও ইরশাদ করেন–

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ * اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ *

নিঃসন্দেহে আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে এবং রাত্র ও দিনের পরিক্রমায় জ্ঞানবানদের জন্য বিভিন্ন নিদর্শন রহিয়াছে; যাহারা দাঁড়ানো অবস্থায়, বসা অবস্থায় এবং পার্শ্বশয়ন করা অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে (এবং বলে,) হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি ইহা অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই। আমরা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি। (সুতরাং আপনি আমাদিগকে জাহান্নামের আযাব হইতে রক্ষা করুন।)

আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন–

اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ * وَ اِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ * وَ اِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ * وَ اِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ * فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ *

তাহারা কি উটের দিকে তাকায় না, কিভাবে উহা সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং আসমানের দিকে তাকায় না, কিভাবে উহা উচ্চ করা হইয়াছে এবং পর্বতমালার দিকে তাকায় না, কিভাবে উহা স্থাপন করা হইয়াছে এবং যমিনের দিকে তাকায় না, কিভাবে উহা সমতল করা হইয়াছে। সুতরাং উপদেশ দান করুন। আপনি তো উপদেশদানকারী মাত্র।

এই বিষয়ে প্রচুর আয়াত রহিয়াছে।

ফায়দা ঃ

(একটি বিষয়ে উপদেশ দিতেছি) অর্থাৎ সত্যের সন্ধান লাভের জন্য এবং হক না হক বুঝিবার জন্য একটি সহজ পথ তোমাদিগকে বলিয়া দিতেছি।

এখানে 'উত্থিত হইবার' অর্থ কাজের জন্য প্রস্তত হওয়া। অর্থাৎ পূর্ববর্তী ধ্যানধারণাকে চিন্তা হইতে দূরে সরাইয়া আল্লাহর ওয়াস্তে নিরপেক্ষ মনে একটু চিন্তা করিবার জন্য প্রস্তুত হও।

(দুইজন দুইজন করিয়া) এখানে নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা বলা উদ্দেশ্য নহে। বরং ইহা বলা উদ্দেশ্য যে, যে চিন্তাভাবনার আহ্বান তোমাদিগকে জানানো হইতেছে উহা দুইভাবে করা যায়। প্রথমতঃ একান্তে ও নির্জনতায় নিজে নিজে চিন্তাভাবনা করা। দ্বিতীয়তঃ অন্যদের সহিত আলাপ আলোচনা ও মতবিনিময়ের মধ্যেমে চিন্তাভাবনা করা। তোমরা এই উভয় পন্থায় কিংবা তোমাদের পছন্দ মত কোন একটি পন্থায় চিন্তাভাবনা কর।

চিন্তাভাবনার বিষয় হইল আসমান যমীনের সৃষ্টি। যেমন অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে– বিশ্ব জগতের সৃষ্টিকুশলতায় নিরপেক্ষ মনে চিন্তাভাবনা করিলেই তোমরা বুঝিতে পারিবে যে, ইহার পিছনে একজন কুশলী স্রষ্টা অবশ্যই রহিয়াছেন এবং তিনি এক ও লা-শরীক।

অন্য তাফসীর মতে চিন্তাভাবনার বিষয় সামনে বর্ণনা করা হইয়াছে–

ما بصاحبكم من جنة ان هو الا نذير لكم بين يدى عذاب شديد *

অর্থাৎ তোমরা মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাহার দাওয়াত সম্পর্কে চিন্তাভাবনা কর। চিন্তার পন্থা এই যে, সহায় সম্বলহীন একা এক ব্যক্তি যদি স্বজাতির বিরুদ্ধে কিংবা সমগ্র মানবজাতির বিরুদ্ধে এবং যুগ যুগব্যাপী বদ্ধমূল বিশ্বাস ও সংস্কারের বিপরীতে কোন দাওয়াত ঘোষণা করেন তবে দুইটি অবস্থা হইতে পারে। হয় তিনি বদ্ধ পাগল। ফলে নিজের হিতাহিত চিন্তা না করিয়া সমগ্র জাতিকে শত্রুতে পরিণত করিতেছেন। নয়ত তাহার ঘোষণা চিরসত্য এবং তিনি আল্লাহর রাসূল। তাই আল্লাহর আদেশ পালনে তিনি একান্ত নির্ভয়।

এখন তোমরা চিন্তা করিয়া দেখ, এই দুই অবস্থার মধ্যে বাস্তব কোনটি।

এইভাবে চিন্তা করিলে তোমরা অবশ্যই বলিতে বাধ্য হইবে যে, কিছুতেই তিনি নির্বোধ বা পাগল নহেন। কেননা তাঁহার জীবনের চল্লিশটি বৎসর মক্কায় স্বজাতির মাঝেই অতিবাহিত হইয়াছে।

তাওহীদের দাওয়াত ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত তাঁহার জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা, এমন কি তাহার মানবদরদ সম্পর্কে সকলেই একমত ছিল। সকলেই তাঁহার প্রতি মুগ্ধ ছিল।

صاحبكم (তোমাদের সংগী) শব্দটি দ্বারা এই দিকে ইংগিত করা হইয়াছে যে, গোত্রপরিচয়হীন বাহিরাগত কোন ব্যক্তি হঠাৎ এইরূপ ঘোষণা দিলে তাহাকে পাগল আখ্যায়িত করিবার সুযোগ ছিল। কিন্তু তিনি তো তোমাদের দীর্ঘ জীবনের সংগী। তাঁহার কোন কিছুই তোমাদের অগোচরে নহে। সুতরাং দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হইয়া গেল যে, তাঁহার মস্তিষ্কবিকৃতি নাই। সুতরাং দ্বিতীয় অবস্থাটাই নির্ধারিত হইয়া গেল। অর্থাৎ নিঃসন্দেহে তিনি অনাগত কঠিন আযাব সম্পর্কে তোমাদিগকে সতর্ককারী আল্লাহর রাসূল। আল্লাহর উপর ভরসার কারণেই তিনি এত নির্ভীক।

(দ্বিতীয় আয়াত)

(বিভিন্ন নির্দশন) অর্থাৎ স্রষ্টার অস্তিত্ব তাঁহার একত্ব এবং তাহার ইলম ও কুদরত তথা জ্ঞান ও শক্তির সুস্পষ্ট প্রমাণ।

(... পার্শ্ব শয়ন করা অবস্থায়) অর্থাৎ সর্বাবস্থায়

(সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে) বস্তুতঃ স্রষ্টাকে চিনিবার জন্য সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করা অতীব জরুরী। হযরত আয়েশা (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন,

ويل لمن قرأها و لم يفكر فيها * (رواه ابن حبان)

যে ব্যক্তি এই আয়াত পড়িল কিন্তু ইহাতে চিন্তা ফিকির করিল না সে বরবাদ হউক।

এই চিন্তা ফিকির সকল ইবাদতের চাইতে উত্তম ইবাদত। হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لا عبادة كالتفكر *

চিন্তা ফিকিরের সমতুল্য কোন ইবাদত নাই।

কেননা চিন্তা ফিকিরের সম্পর্ক হইল কলবের সহিত এবং ইহাই বিশ্বজগতের সৃষ্টির উদ্দেশ্য।

এক যয়ীফ সনদে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, এক লোক বিছানায় চিত হইয়া শুইয়াছিল। এমন সময় সে মাথা তুলিয়া আসমান ও তারকারাজি দেখিয়া বলিল, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, তোমার একজন প্রতিপালক ও স্রষ্টা অবশ্যই আছেন।

হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন। তখন আল্লাহ তাহার প্রতি করুণাদৃষ্টি করিলেন এবং তাহাকে ক্ষমা করিলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত আবু দারদা (রাঃ) হইতে বর্ণিত

فكرة ساعة خير من قيام ليلة *

কিছু সময়ের চিন্তা ভাবনা সারা রাত্রির ইবাদতের চাইতে উত্তম।

(অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই) অর্থাৎ এই সকল বিষয়ে চিন্তা ভাবনার পর তাহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, আল্লাহ পাক এইগুলি অযথা সৃষ্টি করেন না। বরং এই গুলির পিছনে অসংখ্য হিকমত রহিয়াছে। দুই একটি আমরা অনুমান করিতে পারি। যেমন মানব জাতির অস্তিত্ব লাভ ও বসবাসের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং আল্লাহর পরিচয় লাভের জন্য নির্দশন হওয়া ইত্যাদি। আরও বহু হিকমত রহিয়াছে যাহা আমাদের জানা নাই।

আর হাদীছ হিসাবে পূর্ব বর্ণিত الكيس من دان نفسه। এই হাদীছ উল্লেখযোগ্য। অর্থ-বিচক্ষণ সে-ই যে, আপন নফসকে সর্বদা পর্যবেক্ষণে রাখে।

অধ্যায় – ১০

নেক কাজের প্রতিযোগিতায় উদ্বুদ্ধ করা।

আয়াতসমূহ

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ *

তোমরা নেক কাজে প্রতিযোগিতা কর।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন–

وَ سَارِعُوا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَ الْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ *

তোমরা প্রতিযোগিতামূলকভাবে অগ্রসর হও আপন প্রতিপালকের মাগফিরাতের দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে যাহার প্রস্থের ব্যাপ্তি হইল আসমান ও যমীনের সমান যাহা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে।

ফায়দা ঃ

(মাগফিরাতের দিকে) অর্থাৎ শরীয়তের যাবতীয় আহকাম ও ফারায়েয আদায় করিবার দিকে অগ্রসর হও যাহাতে আল্লাহ্ তোমাদিগকে মাগফিরাত করিবেন।

(যাহার প্রস্থের ব্যাপ্তি হইল) জান্নাতের শুধু প্রস্থের কথা বলা হইয়াছে। কেননা দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ প্রস্থের চাইতে বেশী হয়। সুতরাং ইহা অনিবার্য রূপেই জানা গেল যে, জান্নাতের দৈর্ঘ্য আসমান যমীনের প্রশস্ততার চাইতে বেশী হইবে। তবে জান্নাতের দৈর্ঘ্য কত, তাহা আল্লাহ্ ছাড়া কাহারও জানা নাই। তদুপরি প্রস্থের বিষয়টি আসমান যমীনের প্রস্থের সহিত তুলনা করা হইয়াছে বান্দাকে বুঝাইবার জন্য। কেননা বান্দার সামনে ইহার চাইতে অধিক প্রস্থবিশিষ্ট অন্য কোন বস্তু উপস্থিত নাই।

হাদীছসমূহ

৮৯। ফিতনা দেখা দিবার পূর্বে নেক আমল করিয়া লও

فَالْأَوَّلُ: عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «بَادِرُوْا بِالْأَعْمَالِ فتنا كَقِطَعِ اللَّيْلِ المظلِم يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِيْ كَافِرًا أَوْ يُمْسِيْ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيْعُ دِيْنَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা দ্রুত নেক আমল করিয়া লও। কেননা অতিসত্ত্বর রাত্রির বিভিন্ন অন্ধকার অংশের ন্যায় (কঠিন ও ভয়াবহ) ফিতনা দেখা দিবে। (তখন নেক আমল করা সম্ভব তো হইবেই না বরং) মানুষ তখন সকালে মুমিন থাকিবে। কিন্তু সন্ধ্যায় কাফির

হইয়া যাইবে। আবার সন্ধ্যায় মুমিন থাকিবে। কিন্তু সকালে কাফির হইয়া যাইবে। মানুষ দুনিয়ার তুচ্ছ জিনিসের বিনিময়ে নিজের দ্বীন (ঈমান) বিক্রয় করিয়া ফেলিবে।

(মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

এই হাদীছ দ্বারা বোঝা যায় যে, শেষ যামানায় লাগাতার ফিতনা দেখা দিতে থাকিবে এবং প্রতিটি পরবর্তী ফিতনা পূর্ববর্তী ফিতনা হইতে ভয়াবহ হইবে, যেমন রাত্রের পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তী অংশ হইতে অধিকতর অন্ধকার হয়। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে তাঁহার অসীম রহমতের ওছিলায় যাবতীয় ফিতনা ফাসাদ হইতে হিফাযত করুন। আমীন।

(কাফির হইয়া যাইবে) কুফুরির অর্থ হইতে পারে গোনাহ ও নাফরমানিতে লিপ্ত থাকিবার কারণে নেয়ামত সমূহের হক আদায় না হওয়া এবং শোকর না করা। আবার হাকীকী কুফুর তথা আল্লাহকে অস্বীকার করিবার অর্থও হইতে পারে। আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) বলেন, ইহা অসম্ভব নহে। কেননা ফিতনার আধিক্য কলবকে কাঠিন্য ও গাফলত পয়দা করিবার মাধ্যমে মুর্দা করিয়া ফেলে। তখন কলব হইতে ঈমান সহজেই বিদায় লয়। তাহাছাড়া পরবর্তী বাক্যে বলা হইয়াছে যে, তাহাদের অন্তরে দুনিয়ার মুহব্বত ও লোভ এত বেশী হইবে যে, দুনিয়ার সামান্য কিছুর বিনিময়ে শরীয়তের বিধান বিসর্জন দিতে কিংবা ঈমান ত্যাগ করিতে তাহারা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিবে না।

৯০। সোনা চান্দির কারণে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অস্থিরতা

الثَّانِي : عَنْ اَبِيْ سِرْوَعَةَ - بِكَسْرِ السِّيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِهَا - عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ الْعَصْرِ ، فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطّٰى رِقَابَ النَّاسِ اِلٰى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ ، فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ ، فَرَاٰى اَنَّهُمْ قَدْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ ، قَالَ : «ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا ، فَكَرِهْتُ اَنْ يَحْبِسَنِيْ ، فَاَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ : «كُنْتُ خَلَّفْتُ فِي الْبَيْتِ تِبْرًا مِنَ الصَّدَقَةِ ، فَكَرِهْتُ اَنْ اُبَيِّتَهُ» .

«اَلتِّبْرُ» : قِطَعُ ذَهَبٍ اَوْ فِضَّةٍ .

হযরত ওকবা ইবনুল হারিছ (রাঃ) বলেন, আমি মদীনায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে আছরের নামায পড়িলাম। তিনি সালাম ফিরাইলেন। অতঃপর মানুষের কাঁধ ডিংগাইয়া অতিদ্রুত কোন এক স্ত্রীর হুজরার দিকে তাশরীফ লইয়া গেলেন। তাঁহার এমন দ্রুততার কারণে মানুষ ঘাবড়াইয়া গেল। পরে তিনি ছাহাবা কেরামের নিকট ফিরিয়া আসিলেন এবং দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার দ্রুততার কারণে তাহারা অবাক হইয়াছেন। তখন তিনি বলিলেন, আমার নিকট পড়িয়া থাকা কিছু স্বর্ণের কথা স্মরণ হইয়াছিল। আর আমার খুবই অপছন্দ হইল যে, ইহা আমার (ইবাদত নিমগ্নতায়) বাধাদান করিবে। তাই আমি (ঘরে গিয়া) উহা বন্টন করিবার আদেশ দিলাম।

অন্য রিওয়ায়াতে আছে, আমি ঘরে ছাদাকার কিছু স্বর্ণ রাখিয়াছিলাম। উহা রাত্রিভর আপনার নিকট রাখিয়া দেওয়া আমার অপছন্দ হইল।

ফায়দা ঃ

(তাঁহার এমন দ্রুততার কারণে মানুষ ঘাবড়াইয়া গেল।) কেননা তাঁহার পবিত্র অভ্যাস ছিল ধীর গতিতে ভাবগম্ভীরতার সহিত হাঁটা। আর ছাহাবা কেরামও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামন্যতম অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ করিলেই ঘাবড়াইয়া যাইতেন। কেননা তাঁহাদের আশংকা হইত যে, হয়ত তাঁহাদের অজান্তে কষ্টদায়ক কোন আচরণ হইয়া গিয়াছে, যাহার ফলে তিনি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। কিংবা হয়ত কোন কঠিন আয়াত নাযিল হইতে যাইতেছে। বস্তুতঃ মুহব্বত যত অধিক হয় আশংকা ও উৎকণ্ঠাও তত অধিক হয়।

(বাধাদান করিবে) কেহ কেহ ইহার এই মতলব লইয়াছেন যে, ছাদাকা ও যাকাত আদায়ে বিলম্ব করিলে কেয়ামতে উহা বান্দাকে দীর্ঘ সময় হিসাব কিতাবের মাঝে আটকাইয়া রাখিবে।

এই ছিল দোজাহানের সরদারের অবস্থা। নিজের সম্পদ হিসাবে তো কিছুই তিনি নিকটে রাখিতেন না। এমন কি মুসলমানদের মাঝে বন্টন করিবার জন্য যাকাত ছাদাকার যে সমস্ত মাল আসিত তাহাও অতিরিক্ত এক মুহূর্ত আপনার নিকট রাখা তিনি পছন্দ করিতেন না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উহা বিদায় করিবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িতেন।

এখন আমরা যাহারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিথ্যা মুহব্বতের দাবীদার, আমাদের সকলেরই উচিত নিজ নিজ অবস্থা যাচাই করিয়া দেখা এবং নিজেরাই নিজেদের সম্পর্কে বিচার করা যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের সামনে আমাদের কি অবস্থা হইবে! কিভাবে আমরা মুখ দেখাইব!

অবশ্য এই শেষ যামানায়ও আল্লাহর এমন কতিপয় বান্দা আছেন, যাহারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সুন্নতের উপর আমল করিয়া দেখাইয়াছেন এবং আমাদের জন্য বাস্তব নমুনা রাখিয়া গিয়াছেন।

হায়! আমাদেরও যদি নছীব হইত আল্লাহর এই নেককার বান্দাদের পদাংক অনুসরণ করিবার! অন্ততঃপক্ষে সামান্য আফসোসও যদি অন্তরে পয়দা হইত!

৯১। জান্নাতের শাওক। শাহাদাতের আকাঙক্ষা

اَلثَّالِثُ: عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ اُحُدٍ: اَرَاَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فَاَيْنَ اَنَا؟ قَالَ: «فِيْ الْجَنَّةِ» فَاَلْقٰى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِيْ يَدِهٖ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتّٰى قُتِلَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত জাবির (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, অহুদ যুদ্ধের দিন জনৈক ছাহাবী নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি যদি নিহত হই তবে আমার স্থান কোথায় হইবে বলুন? তিনি বলিলেন, (তোমার স্থান হইবে) জান্নাতে। তখন তিনি

হাতের অল্প কয়েকটি খেজুর ফেলিয়া দিলেন, অতঃপর লড়াই করিতে করিতে শহীদ হইয়া গেলেন। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

খেজুর গুলি ফেলিয়া দিবার কারণ এই যে, শাহাদাত লাভের মাধ্যমে জান্নাতে দাখেল হইবার আকাঙক্ষা তাঁহার এমনই ব্যাকুল হইয়াছিল যে, সামান্য কয়েকটি খেজুর খাইবার বিলম্বও তাঁহার বরদাশত ছিল না। অন্য এক রিওয়ায়াতে তাঁহার এই মন্তব্য বর্ণিত হইয়াছে–

لئن انا حييت حتى آكل تمراتى هذه انها لحياة طويلة *

এই খেজুরগুলি খাওয়া পর্যন্ত যদি বাঁচিয়া থাকি তবে তো ইহা বড় দীর্ঘ জীবন হইবে।

অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে– বদর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক খীমায় অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি ছাহাবা কেরামকে উৎসাহ দিয়া বলিলেন, উঠ এবং আগে বাড় এমন জান্নাতের দিকে যাহার প্রস্থ হইল আসমান যমীনের অনুরূপ, যাহা মুত্তাকীদের জন্য তৈয়ার করা হইয়াছে। ছাহাবী হযরত ওমায়র বিন হাম্মাম ইহা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন, বাহবা! হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, কিসের উপর বাহবা বলিতেছ? তিনি আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার বড় আকাঙক্ষা, আমিও যদি তাহাদের মধ্যে গণ্য হইতাম! তিনি বলিলেন, তুমিও তাহাদের মধ্যে গণ্য আছ।! এই কথা শুনিবামাত্র তিনি হাতের খেজুর ফেলিয়া যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং শহীদ হইলেন।

জীবন উৎসর্গকারী ছাহাবা কেরামের এমন কোরবানীর বদৌলতেই আজ আমরা দ্বীন ও ঈমানের দৌলত এত সহজে হাছিল করিতে পারিয়াছি। তাই উম্মতের উপর তাঁহাদের ইহ্সান ও ঋণ কখনই শোধ হইবে না।

বস্তুতঃ ছাহাবা কেরামের অন্তরে শাহাদাতের আকাঙক্ষা এমনই সুতীব্র ছিল যে, দীর্ঘ সময় বাঁচিয়া থাকাও তাঁহাদের নিকট কঠিন মনে হইত। অহুদ যুদ্ধে রওয়ানা হইবার পূর্বে হযরত আমর বিন জামুহ (রাঃ) কিবলামুখী হইয়া দু'আ করিয়াছিলেন–

اللهم لا تردنى الى اهلى *

হে আল্লাহ! আমাকে আমার পরিবার পরিজনের নিকট ফিরাইয়া আনিও না।

এমনই হইল। যুদ্ধের পর তাঁহার স্ত্রী তাঁহার জানাযা উটের পিঠে করিয়া মদীনায় আনিতে চাহিলেন। কিন্তু উট কিছুতেই মদীনার পথে অগ্রসর হইল না। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে অহুদের মাঠেই তাঁহাকে দাফন করা হইল।

অহুদ যুদ্ধের পূর্বদিন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ) এই বলিয়া দু'আ করিয়াছিলেন–

হে আল্লাহ আগামীকাল যখন লড়াই শুরু হইবে তখন আমার মোকাবেলা যেন এক বড় বাহাদুরের সহিত হয়। আমরা পরস্পরকে প্রচণ্ডরূপে আক্রমণ করিব। আর সে আমাকে কতল করিবে। অতঃপর আমার নাক কান কাটিয়া ফেলা হইবে। অতঃপর কিয়ামতের দিন যখন আপনার দরবারে হাজির হইব তখন আপনি জিজ্ঞাসা করিবেন। হে আব্দুল্লাহ! তোমার নাক

কান কাটা কেন? আমি আরয করিব, আয় আল্লাহ! আপনার এবং আপনার রাসূলের রাস্তায় ইহা কাটা হইয়াছে। আপনি তখন বলিবেন, হে বান্দা, তুমি সত্যই বলিতেছ।

পরবর্তী দিন যুদ্ধ শেষে দেখা গেল; নাক কান কাটা অবস্থায় তাঁহার শহীদী লাশ অহুদের মাঠে ধূলাবালুর মাঝে পড়িয়া আছে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা 'মুতা' যুদ্ধে রওয়ানা হইলেন। আপন জনেরা দু'আ করিল যেন তিনি নিরাপদে বিজয়ী বেশে ফিরিয়া আসেন। আর জওয়াবে তিনি তাঁহার সেই অমর কবিতাটি বলিয়া উঠিলেন–

ولكنى اسأل الرحمن مغفرة + و ضربة ذات فرع تقذف الزبدا *

কিন্তু আমি তো দয়াল মাওলার নিকট মাগফিরাত প্রার্থনা করি। আর প্রার্থনা করি তরবারির এমন একটি আঘাত যাহাতে প্রবাহিত হইবে রক্তের ফোয়ারা।

او طعنة تبدى حران مجهرة + بحربة تنفذ الاحشاء و الكبدا

কিংবা এমন এক বর্শাঘাত যাহা আঁতুড়ি ও কলিজা ফাঁড়িয়া বাহির হইয়া যাইবে।

حتي يقال اذا مروا على جدثي + يا ارشد الله من غاز و قد رشدا

যাহাতে মানুষ আমার কবরের নিকট দিয়া যাইতে সময় বলে, তোমার মত মুজাহিদকে আল্লাহ কামিয়াব করুন। সত্যই তুমি কামিয়াব ছিলে।

তাঁহার আকাঙক্ষাও আল্লাহ পূরণ করিয়াছিলেন। এই তো ছিল ছাহাবায়ে কেরামের অবস্থা। পক্ষান্তরে আমাদের অবস্থা কি উহা তো নিজেদেরই জানা আছে। তাহাসত্ত্বেও অনেককেই আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে শোনা যায় যে, বর্তমান যুগে কাফিরদের হাতে মুসলমানদের এত দুর্গতি হইতেছে কেন? আল্লাহ উম্মতে মুহাম্মদিয়াকে মদদ করিতেছেন না কেন?

কিন্তু কাদেসিয়ার যুদ্ধে শত্রুসেনাপতির নামে প্রেরিত হযরত সা'আদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ)-এর পত্রের একটি মাত্র বাক্যই আমাদের সমস্ত অভিযোগের জওয়াবের জন্য যথেষ্ট। তিনি বলিয়াছিলেন–

ان معى قوما يحبون الموت كما يحب الاعاجم الخمر *

আমার সংগে রহিয়াছে এমন কাওম যাহারা মৃত্যুকে তেমন ভালবাসে যেমন ভালবাসে অনারবরা মদকে।

বলুন দেখি, মওতের সহিত বর্তমান মুসলমানদের সম্পর্ক কিরূপ! মওতের সহিত এইরূপ মুহব্বতের সম্পর্ক যেদিন আমাদের হাছিল হইবে সেইদিন দুনিয়াতে এমন কোন শক্তি থাকিবে না যাহারা মুসলমানদের দিকে চক্ষু তুলিয়া তাকাইতে সাহস করিবে।

ইমাম হাকিম হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, জনৈক হাবশী ছাহাবী নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাজির হইয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কালো কুৎসিত ও দুর্গন্ধযুক্ত একজন মানুষ। আমার কোন ধন সম্পদও নাই। এমতাবস্থায় যদি আমি ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হই তবে আমার স্থান কোথায় হইবে? তিনি

বলিলেন, তোমার স্থান হইবে জান্নাতে। এই কথা শুনিয়া তিনি লড়াই করিতে করিতে নিহত হইলেন। তখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া বলিলেন, আল্লাহ তোমার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করুন এবং তোমার ঘ্রাণ সুগন্ধময় করুন এবং তোমার সম্পদ অঢেল করুন।

৯২। ছাদাকা করিবার সঠিক সময়

اَلرَّابِعُ : عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اَيُّ الصَّدَقَةِ اَعْظَمُ اَجْرًا؟ قَالَ: «اَنْ تَصَدَّقَ وَاَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ، وَتَأْمُلُ الغِنٰى، وَلَا تُمْهِلْ حَتّٰى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ. قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

«اَلْحُلْقُوْمُ»: مَجْرَى النَّفَسِ . وَ«الْمَرِيءُ»: مَجْرَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ.

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, এক লোক নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাজির হইয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্ ছাদাকায় অধিক পরিমাণ ছাওয়াব? তিনি বলিলেন, এমন অবস্থায় ছাদাকা করা যে, তুমি সুস্থ সবল আছ এবং সম্পদের লোভ ও দারিদ্র্যের ভয় এবং সচ্ছলতার আকাঙ্ক্ষা তোমার অন্তরে আছে। (ছাদাকা করিবার ক্ষেত্রে) এমন গড়িমসি করিও না যে, রূহ হলক পর্যন্ত আসিয়া গেল (এবং মৃত্যুর গরগরা শুরু হইয়া গেল) আর তুমি বলিতে লাগিলে যে, অমুকের জন্য এত, অমুকের জন্য এত। অথচ মাল তো অমুকের হইয়া গিয়াছে। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

সুস্বাস্থ্যের সময় যেহেতু মানুষের অন্তরে বাঁচিয়া থাকিবার আশাবাদ জাগ্রত থাকে এবং অনাগত দারিদ্র্যের ভয়ে অর্থ সঞ্চয়ের আকাঙ্ক্ষা থাকে সেহেতু ঐ সময়ের ছাদাকা আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়। কেননা এই দান আল্লাহর মুহব্বতের প্রমাণ। পক্ষান্তরে জীবন সম্পর্কে হতাশ হইয়া এবং মাল ওয়ারিছদের হাতে চলিয়া যাইবার সম্ভাবনা দেখিয়া যে ছাদাকা করা হয় উহা প্রকৃতপক্ষে মালের প্রতি মুহব্বতেরই প্রমাণ। সুতরাং আল্লাহর নিকট উহা তত প্রিয় নহে।

(এক লোক নবী ছাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে) হাফিয ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন, উক্ত ছাহাবীর নাম আমি জানিতে পারি নাই। তবে তিনি হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) হইতে পারেন। কেননা মুসনাদে আহমদ-এর এক বর্ণনায় আছে; তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন– **اي الصدقة افضل** কোন ছাদাকা সর্বোত্তম?

(দারিদ্র্যের ভয়) অর্থাৎ শয়তান তোমার অন্তরে এই ওয়াসওয়াসা পয়দা করে যে, এখন যদি উদ্বৃত্ত মাল দান ছাদাকা করিয়া ফেল তবে ভবিষ্যতে নিজেই বা খাইবে কি এবং সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনকেই বা খাওয়াইবে কি? তখন তো হাতে পয়সা নাও থাকিতে পারে? সুতরাং বুদ্ধিমানের কাজ হইল এখন হইতে সঞ্চয় করিয়া রাখা যাহাতে ভবিষ্যতে অভাব ও দারিদ্র্যের মুখ দেখিতে না হয়। শয়তানের এই ওয়াসওয়াসা সম্পর্কে মুমিনদিগকে সতর্ক করিয়া আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন–

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ *

শয়তান তোমাদিগকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং তোমাদিগকে অশ্লীল কাজের আদেশ করে।

وَ اللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَ فَضْلًا *

অর্থাৎ আল্লাহ ওয়াদা করিতেছেন যে, তোমরা যদি দান কর তবে দরিদ্র হইবে না। বরং (আখিরাতে) মাগফিরাত লাভ করিবে এবং (দুনিয়াতে উহার বিনিময়ে) রিযিক লাভ করিবে।

(রূহ হলক পর্যন্ত আসিয়া গেল) অর্থাৎ হলক পর্যন্ত আসিয়া পড়িবার এবং গরগরা শুরু হইবার উপক্রম করিল। এখনো আসিয়া পড়ে নাই এবং গরগরা শুরু হয় নাই। কেননা তখন তো মালের মধ্যে তাহার কোন ধরনের হস্তক্ষেপ গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(অমুকের জন্য) ফাতহুল মুলহিম কিতাবে বলা হইয়াছে যে, আল্লামা খাত্তাবী (রহঃ) বলেন, প্রথম ও দ্বিতীয় অমুক দ্বারা যাহাদের জন্য মালের অছিয়ত করা হইতেছে তাহারা উদ্দেশ্য। আর তৃতীয় অমুক দ্বারা ওয়ারিছ উদ্দেশ্য এবং দৃশ্যতঃ ইহা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য। (অবশ্য) প্রথম দুইটি অমুকের একটি দ্বারা ঐ ব্যক্তি উদ্দেশ্য হইতে পারে। যাহার অনুকূলে ঋণের কথা স্বীকার করা হইয়াছে। অর্থাৎ অমুক আমার নিকট এত পাইবে। আর অপরটি দ্বারা দানের অছিয়ত হইতে পারে। অর্থাৎ অমুককে এত দান করা হইল।

(অথচ তাহা অমুকের হইয়া গিয়াছে) মৃত্যুশয্যায় মানুষ তাহার মালের এক তৃতীয়াংশ সম্পর্কে ইচ্ছামত হস্তক্ষেপ করিতে পারে। কিন্তু অবশিষ্ট দুই তৃতীয়াংশ-এর সহিত ওয়ারিছের হক যুক্ত হইয়া যায়। উহাতে সে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। করিলেও উহা ঝুলন্ত থাকিবে। ওয়ারিছ অনুমোদন করিলে উহা কার্যকর হইবে। আর সে বাতিল করিলে বাতিল হইবে। সুতরাং এই বাক্যের অর্থ এই যে, তুমি সমগ্র সম্পদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেছ। অমুককে দান করিতেছ, অমুকের অনুকূলে ঋণ স্বীকার করিতেছ। সুস্থ অবস্থায় তো কর নাই। এখন করিলে কি লাভ হইবে। সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ তো ওয়ারিছের মালিকানায় চলিয়া গিয়াছে। এখন তো বরং অপরের মালে হস্তক্ষেপের গোনাহ হইবে। যেমন ওলামায়ে কেরাম বলিয়াছেন যে, দুনিয়াদাররা তাহাদের সম্পদের ব্যাপারে দুই বার আল্লাহর নাফরমানি করে। সুস্থ অবস্থায় কৃপণতা করিয়া আল্লাহর রাস্তায় দান করে না। পাওনাদারদের হক আদায় করে না। অথচ মাল যখন তাহাদের হাতছাড়া হইয়া যায় (অর্থাৎ মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া যায়) তখন ওয়ারিছদিগকে বঞ্চিত করিবার জন্য অপচয়মূলক দান করে।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) হইতে মরফু হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে–

مثل الذى يعتق و يتصدق عند موته كمثل الذى يهدى اذا شبع

যে ব্যক্তি মৃত্যুর সময় (গোলাম) আযাদ করে এবং (মাল) ছাদকা করে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে পেট ভরিয়া খাইবার পর হাদিয়া পাঠায়।

তদ্রূপ হযরত আবু ছাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে মরফু হাদীছ বর্ণিত আছে–

لان يتصدق الرجل فى حياته و صحته بدرهم خير له من ان يتصدق عند موته بمأة *

জীবনের সুস্থ অবস্থায় কাহারও একটি মাত্র দিরহাম দান করা মৃত্যুর সময় তাহার একশত দিরহাম দান করিবার চাইতে উত্তম।

ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন যে, তবু আল্লাহর রাস্তায় দান করিবার এই সুযোগ হাতছাড়া করিবে না। ওয়ারিছদিগকে ঠকাইবার নিয়ত না করিয়া অতীতের কৃপণতার কাফ্ফারা হিসাবে আল্লাহর ওয়াস্তে সম্পদের এক তৃতীয়াংশ আল্লাহর পথে খরচ করিবার অছিয়ত করিয়া যাইবে। ইনশাআল্লাহ ইহাও ফায়দা হইতে খালি যাইবে না।

৯৩। নেক কাজে প্রতিযোগিতা

اَلْخَامِسُ: عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اَخَذَ سَيْفًا يَوْمَ اُحُدٍ فَقَالَ: «مَنْ يَاْخُذُ مِنِّيْ هٰذَا؟ فَبَسَطُوا اَيْدِيَهُمْ، كُلُّ اِنْسَانٍ مِنْهُمْ يَقُوْلُ: اَنَا اَنَا. قَالَ: «فَمَنْ يَاْخُذُهٗ بِحَقِّهٖ؟»، فَاَحْجَمَ الْقَوْمُ، فَقَالَ اَبُوْ دُجَانَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: اَنَا آخُذُهٗ بِحَقِّهٖ، فَاَخَذَهٗ فَفَلَقَ بِهٖ هَامَ الْمُشْرِكِيْنَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(١).

اِسْمُ اَبِيْ دُجَانَةَ: سِمَاكُ بْنُ خَرْشَةَ. قَوْلُهٗ: «اَحْجَمَ الْقَوْمُ»: اَيْ تَوَقَّفُوا. وَ«فَلَقَ بِهٖ»: اَيْ شَقَّ، «هَامَ الْمُشْرِكِيْنَ»: اَيْ رُؤُوْسَهُمْ.

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, অহুদের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি তলোয়ার হাতে লইয়া বলিলেন, কে আমার নিকট হইতে ইহা গ্রহণ করিবে? সকলেই হাত বাড়াইয়া বলিল, আমি। আমি। তিনি বলিলেন, কে ইহার হক আদায় করিবার শর্তে গ্রহণ করিবে? ইহা শুনিয়া সকলে পিছাইয়া গেল। তখন আবু দোজানা (রাঃ) বলিলেন, আমি ইহার হক আদায় করিবার শর্তে গ্রহণ করিব। অতঃপর তিনি উহা গ্রহণ করিলেন, এবং উহা দ্বারা মুশরিকদের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিলেন। (মুসলিম শরীফ)

আবু দোজানার আসল নাম সিমাক বিন খারশাহ।

ফায়দা ঃ

হযরত আবু দোজানা তাঁহার উপনামেই খ্যাত হইয়াছেন। অহুদের যুদ্ধে তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিফাযতের জন্য জানবাজি রাখিয়া লড়াই করিয়াছিলেন। ফলে তাঁহার সমস্ত দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছিল। ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি শহীদ হইয়াছিলেন।

তরবারির হক আদায় করিবার অর্থ ছিল এই যে, মুসলমানদের বিজয় লাভ হওয়া পর্যন্ত কিংবা শহীদ হওয়া পর্যন্ত উহা দ্বারা লড়াই চালাইয়া যাইতে হইবে। এক বর্ণনায় আছে, আবু দোজানা (রাঃ) নিজেই প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, ইহার হক কি? তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহার হক এই যে, শত্রুকে হটাইয়া দেওয়া পর্যন্ত ইহা দ্বারা আঘাত করিতে থাকিবে।

হযরত যোবায়র (রাঃ) বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমার চাওয়া

সত্ত্বেও তরবারিটি আমাকে না দিয়া আবু দোজানাকে দান করিলেন তখন আমার মনে খটকা হইল। তাই আমি মনে মনে বলিলাম, আল্লাহর কসম! আমি দেখিব, আবু দোজানা এই তরবারি লইয়া কি করে। আমি তাহার পশ্চাতে অনুসরণ করিলাম। তিনি একটি লাল কাপড় মাথায় পেঁচাইলেন। আনসারগণ বলিতে লাগিলেন, আবু দোজানা মৃত্যুর নিশান লাগাইয়াছে। তখন আবু দোজানা এই কবিতা বলিয়া বাহির হইলেন—

انا الذى عاهدنى خليلى + و نحن بالسفح لدى النخيل

الا اقوم الدهر فى الكيول + اضرب بسيف الله و الرسول

অতঃপর তিনি যাহাকেই সামনে পাইলেন তাহাকেই হত্যা করিলেন।

৯৪। পরবর্তী যামানা পূর্ববর্তী যামানার তুলনায় মন্দ

- اَلسَّادِسُ: عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ: اَتَيْنَا اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَشَكَوْنَا اِلَيْهِ مَا نَلْقٰى مِنَ الْحَجَّاجِ . فَقَالَ: «اِصْبِرُوْا فَاِنَّهُ لَا يَاْتِيْ زَمَانٌ اِلَّا وَالَّذِيْ بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتّٰى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ» سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ ﷺ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

হযরত যোবায়র বিন আদী (রহঃ) বলেন, আমরা হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ)-এর নিকট গিয়া হাজ্জাজের জুলুম অত্যাচারের অভিযোগ করিলাম। তিনি বলিলেন, অপেক্ষা কর। এমন এক যামানা আসিতেছে যখন পরবর্তী যামানা পূর্বের তুলনায় মন্দই হইবে। এমনকি তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সহিত মিলিত হইবে। ইহা আমি তোমাদের নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে শুনিয়াছি। (বুখারী শরীফ)

ফায়দা ঃ

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ছাকাফী এই উম্মতের মশহুর জালিম ছিলেন। বহু ছাহাবী ও তাবেয়ী তাহার নির্দয় হাতে শহীদ হইয়াছেন। তিনি উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের পক্ষ হইতে প্রথমে হিজাযের ও পরবর্তীতে ইরাকের প্রশাসক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তবে পূর্ববর্তী যামানার জালিমরা বর্তমান যামানায় জালিমদের তুলনায় শতগুণে উত্তম ছিল। তাই অসংখ্য দুষ্কৃতির পাশাপাশি হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সুকৃতিও ছিল প্রচুর। বহু গুরুত্বপূর্ণ জিহাদ তিনি পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং বহু ইসলামী দেশ তাহার দ্বারা জয় হইয়াছিল।

(পূর্বের তুলনায় মন্দই হইবে) অর্থাৎ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যামানা ক্রমশঃ দূরে সরিয়া যাইবার কারণে প্রত্যেক পরবর্তী যামানা পূর্ববর্তী যামানা হইতে অধিক ফিতনা-ফাসাদ ও বালা-মুছিবতপূর্ণ হইবে। সুতরাং মানুষের কর্তব্য হইল শান্তিপূর্ণ সময়ের অপেক্ষায় বসিয়া না থাকিয়া বর্তমান সময়ের বাস্তবতাকে স্বীকার করিয়া লওয়া এবং সমস্ত দুঃখ দুর্দশার মুখে ছবরের সহিত আখিরাতের জন্য কাজ করিয়া যাওয়া।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর যামানা তো পূর্ববর্তী হাজ্জাজের যামানা হইতে উত্তম ছিল। হযরত হাছান বছরী (রহঃ)-কেও এই প্রশ্ন করা হইয়াছিল। তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন, কখনও কখনও একটা খণ্ডকালীন সময়ের প্রয়োজন দেখা

দেয়, যাহাতে মানুষ কিঞ্চিৎ স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িতে পারে। হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর যামানা ছিল সেই খণ্ডকালীন সময়। অধিকাংশ ওলামা কেরামের মতে আলোচ্য হাদীছে সাধারণ নিয়মের কথা বলা হইয়াছে। সুতরাং এক দুইটি ব্যতিক্রম ধর্তব্য নহে। আবার কোন কোন মতে হাদীছে সামগ্রিক অবস্থার কথা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ প্রত্যেক পরবর্তী যুগের সামগ্রিক অবস্থা পূর্ববর্তী যুগের সামগ্রিক অবস্থার চাইতে উত্তম হইবে। সেই হিসাবে হাজ্জাজের আমলে যেহেতু বহু ছাহাবা বাঁচিয়া ছিলেন অথচ ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ)–এর আমলে তাঁহারা সকলে আখিরাতবাসী হইয়া গিয়াছিলেন সেহেতু সামগ্রিক বিচারে হাজ্জাজের যামানাই উত্তম ছিল। কেননা ছাহাবা কেরামের যামানা পরবর্তী যামানার চাইতে নিঃসন্দেহে অধিক বরকতপূর্ণ ছিল।

(এমন কি তোমরা তাহাদের প্রতিপালকের সহিত মিলিত হইবে।) অর্থাৎ মুমিনের আসল শান্তি হইবে তখনই যখন সে আপন প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভ করিবে। দুনিয়ার জীবন তাহাকে ছবর শোকরের মাধ্যমেই কাটাইতে হইবে। বিভিন্ন ফিতনা মুছীবতের মধ্য দিয়াই তাহাকে সুন্নতের ইত্তেবা করিয়া চলিতে হইবে। অতঃপর যখন সে আপন প্রতিপালকের সহিত মিলিত হইবে তখন তিনি তাহাকে ইহার সর্বোত্তম বিনিময় দান করিবেন। মাওলার দীদার ও মিলনের সেই মহাশান্তির কথা দুনিয়াতে বসিয়া বান্দা কিভাবে কল্পনা করিতে পারে!

আরও প্রশ্ন হইতে পারে যে, নাসাঈ শরীফে বর্ণিত এক হাদীছে আছে–

امتی کالمطر لا یدری اولها خیر ام آخرها *

আমার উম্মত বৃষ্টিতুল্য। বলা যায় না যে, উহার প্রথমাংশ উত্তম না শেষাংশ।

সুতরাং কিভাবে বলা যায় যে, পরবর্তী যুগ পূর্ববর্তী যুগ হইতে নিকৃষ্ট? ইহার উত্তর আগে দেওয়া হইয়াছে যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের যে পার্থক্য করা হইয়াছে উহা সময়ের সাধারণ গতিধারা হিসাবে। অন্যথায় আল্লাহর ফযল ও করম এবং দান ও অনুগ্রহ বিশেষ কোন সময়ের সহিত আবদ্ধ নহে।

সুতরাং ঈমান, তাকওয়া, নেক আমল ও মেহনত মুজাহাদার ক্ষেত্রে যিনি যত অগ্রসর হইবেন তিনি ততই উন্নতি লাভ করিবেন এবং হইতে পারে যে, আল্লাহর দান ও অনুগ্রহ লাভের ক্ষেত্রে বহু পরবর্তী ব্যক্তি বহু পূর্ববর্তী ব্যক্তিকে ছাড়াইয়া যাইবেন। আইম্মা মুজতাহিদীন, ছুফিয়ায়ে ছালেহীন ও আওলিয়া কেরামের মাঝে এমন নযীর পাওয়া যায়। সুতরাং এই বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিবর্গের বিশেষ উন্নতি ও অগ্রগামিতার প্রতি ইংগিত করিয়াই উপরোক্ত হাদীছে এই কথা বলা হইয়াছে। বাকি সামগ্রিক বিচারে পূর্ববর্তী যুগ পরবর্তী যুগের তুলনায় অবশ্যই উত্তম।

৯৫। নেক আমলে বিলম্বের ক্ষতি

اَلسَّابِعُ: عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «بَادِرُوْا بِالْاَعْمَالِ سَبْعًا، هَلْ تَنْتَظِرُوْنَ اِلاَّ فَقْرًا مُنْسِيًا، اَوْغِنًى مُطْغِيًا، اَوْمَرَضًا مُفْسِدًا، اَوْ هَرَمًا مُفْنِدًا اَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا اَوِ الدَّجَالَ فَشَرٌّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ، اَوِ السَّاعَةَ فَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ!» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, সাতটি জিনিসের আগে আগে নেক আমলের দিকে ধাবিত হও। তোমরা কি অপেক্ষা করিতেছ এমন দারিদ্র্যের যাহা সমস্ত কিছু ভুলাইয়া দেয়, কিংবা এমন অর্থ প্রাচুর্যের যাহা স্বেচ্ছাচারী করিয়া দেয়, কিংবা এমন রোগ-ব্যাধির যাহা (শরীর ও মস্তিষ্কের কার্যকারিতা) নষ্ট করিয়া দেয়, কিংবা এমন বার্ধক্যের যাহা বুদ্ধিবিভ্রম ঘটায় কিংবা এমন মৃত্যুর যাহা আকস্মিক উপস্থিত হয়। কিংবা দাজ্জালের। দাজ্জাল তো নিকৃষ্টতম অনাগত বিষয় যাহার অপেক্ষা করা হয়। কিংবা (তোমরা কি) কেয়ামতের (অপেক্ষা করিতেছ?) কিয়ামত তো (দুনিয়ার আযাবের তুলনায়) আরও ভয়াবহ ও তিক্ত।

(তিরমিযি শরীফ)

ফায়দা ঃ

অর্থাৎ এই সাতটি অবস্থার কোন একটি দ্বারা আক্রান্ত হইবার আগে আগে যতটা পার নেক আমল করিয়া লও। কেননা তখন আর আমল করিবার তাওফিক হইবে না। যাহারা সময়ের মত মহামূল্যবান নিয়ামতকে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী ছাড়া অযথা নষ্ট করে তাহাদিগকে আল্লাহ পাক এই সাতটি মুছিবতের কোন একটি দ্বারা অথবা কয়েকটি দ্বারা আক্রান্ত করিয়া থাকেন। তখন আর আমল করিবার কোন উপায় থাকে না।

এই ধরণের আরেকটি হাদীছ হইল—

اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك و صحتك قبل سقمك و غنائك قبل فقرك و فراغك قبل شغلك و حياتك قبل موتك *

পাঁচটি বিষয়ের পূর্বে পাঁচটি বিষয়কে গনীমত মনে কর। তোমার যৌবনকে বার্ধক্যের পূর্বে এবং সুস্বাস্থ্যকে অসুস্থতার পূর্বে এবং অর্থ প্রাচুর্যকে দারিদ্র্যের পূর্বে এবং অবসর সময়কে কর্মব্যস্ততার পূর্বে এবং জীবনকে মৃত্যুর পূর্বে।

(এমন দারিদ্র্যের) দারিদ্র্য যদি সাধারণ পর্যায়ে হয় তবে তো ইহা নেয়ামত। তদ্রূপ আল্লাহর সহিত বান্দার তা'আল্লুক বা সম্পর্ক যেই পরিমাণ গভীর হইবে সেই পরিমাণ উচ্চস্তরের দারিদ্র্য তাহার জন্য নেয়ামত হইবে। আর ঐ দারিদ্র্য সর্বদা বরকতপুর্ণ হয়। ফলে উহা বান্দার পেরেশানির কারণ হয় না বরং অধিকতর আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপান হয়। যে সমস্ত হাদীছে দারিদ্র্যের প্রশংসা আসিয়াছে সেইখানে এই প্রকার দারিদ্র্যই উদ্দেশ্য এবং এই দারিদ্র্যই হইল রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মুহব্বতের আলামত। যেমন বর্ণিত আছে যে, জনৈক ছাহাবী আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে মুহব্বত করি। তিনি বলিলেন, চিন্তা করিয়া দেখ কি বলিতেছ? ছাহাবী পুনরায় একই কথা আরয করিলেন। তখন তিনি বলিলেন, যদি তুমি আমাকে ভালবাসিয়া থাক তবে কঠিন দারিদ্র্যের জন্য প্রস্তুত হও। কেননা যে আমাকে ভালবাসে দারিদ্র্য তাহার দিকে এমনভাবে ছুটিয়া আসে যেমন ঢলের পানি উপর হইতে নীচের দিকে ছুটিয়া আসে।

পক্ষান্তরে যে দারিদ্র্য সীমা অতিক্রম করিয়া যায় এবং যাহা তা'আল্লুক মা'আল্লাহসহ না হয় ঐ দারিদ্র্য মানুষকে এমনই পেরেশানিতে নিক্ষেপ করে যে, মানুষ আপন সন্তান-সন্ততি ও

পরিবার পরিজনকে পর্যন্ত ভুলিয়া যায়। আমল ইবাদতের কথা ভুলিয়া যায় এমন কি আল্লাহকে পর্যন্ত ভুলিয়া কাফির হইয়া যায়।

এই ধরণের দারিদ্র্যের কথাই আলোচ্য হাদীছে বলা হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও ইহা হইতে পানাহ চাহিয়াছেন এবং উম্মতকে পানাহ চাহিতে বলিয়াছেন।

(এমন অর্থ প্রাচুর্য যাহা স্বেচ্ছাচারী করিয়া দেয়) এই জন্যই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি তোমাদের জন্য দারিদ্র্যের আশংকা করি না বরং দুনিয়ার প্রাচুর্যের আশংকা করি, যাহা তোমাদিগকেও পূর্ববর্তীদের ন্যায় ধ্বংস করিয়া ছাড়িবে। বস্তুতঃ প্রয়োজন পরিমাণ হইলে দারিদ্র্যের ন্যায় সম্পদও নেয়ামত। কিন্তু অতিরিক্ত পরিমাণ হইলে উহা পরীক্ষার বিষয়। খুব কম মানুষই এই পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়। এই কারণেই কোরআন শরীফে মালকে ফিতনা বলা হইয়াছে। সম্পদপ্রাচুর্য একদিকে অহংকার পয়দা করে অপরদিকে কলবকে আখিরাতের চিন্তা হইতে এবং আবদিয়াতের হক সমূহ আদায় করা হইতে গাফেল করিয়া দেয়।

(এমন রোগ ব্যাধি যাহা) অসুস্থতা মানুষের শারীরিক শক্তি যেমন নষ্ট করে তেমনি মানসিক বৈকল্যও সৃষ্টি করে। আবার কর্মোদ্যম ও কর্মস্পৃহাও শেষ করিয়া দেয়। তখন ইবাদত করিতেই পারে না। কিংবা ইবাদতের পূর্ণ হক আদায় করিতে পারে না।

মোটকথা মানবসৃষ্টির উদ্দেশ্য হইল ইবাদত। আর ইবাদতের জন্য স্বাস্থ্য ও সুস্থতা হইল অপরিহার্য। সুতরাং বোঝা গেল যে, স্বাস্থ্য ও সুস্থতা আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে প্রদত্ত অতি বড় এক নেয়ামত, যাহার শোকর আদায় করা অবশ্যকর্তব্য। আর শোকর হইল ইহাকে পরিপূর্ণ রূপে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যের কাজে ব্যয় করা। নাফরমানির কাজে বরবাদ না করা। কেহ যদি তাহার স্বাস্থ্যকে আল্লাহর ইবাদতে ব্যয় করে তবে অসুস্থতার সময় ইবাদত করিতে না পারিলেও আল্লাহ পাক তাহার আমলনামায় ঐ সকল ইবাদত লিখিয়া দিবেন যাহা সে সুস্থ অবস্থায় করিত। কিন্তু আফসোসের বিষয় এই যে, মানুষ তাহার সুস্থতার কোন হকই আদায় করে না। গাফলতের মাঝেই পুরা সময় কাটাইয়া দেয়। আর যখন রোগ-ব্যাধি ও অসুস্থতা ঘিরিয়া ধরে তখন তো ফরয ইবাদতই ছুটিয়া যায়। এই জন্যই হাদীছ শরীফে আসিয়াছে–

نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة و الفراغ *

দুইটি নেয়ামত, যাহার ব্যাপারে বহু মানুষ ধোকায় পড়িয়া আছে। উহা হইল সুস্থতা ও অবসর।

যখন বে-কদরি ও না-শোকরির কারণে আল্লাহ পাক এই দুই নিয়ামত ছিনাইয়া লন তখন তো কদর বুঝে আসে এবং হুঁশ হয় কিন্তু কিছুই করিবার থাকে না। সুতরাং সুযোগ থাকিতেই সাবধান হওয়া উচিত।

এই আলোচনা হইতে বোঝা যায় যে, যাহারা সুস্থতার হক আদায় করে তাহাদের জন্য অসুস্থতাও এক প্রকার নেয়ামত। কেননা ঐ সময় ইবাদত করিতে না পারিলেও সুস্থতার সময় কৃত আমলগুলি তখনও আমলনামায় লেখা হইতে থাকে। আবার ছবর করিবার বরকতে

গোনাহ মাফ হইতে থাকে এবং দরজা বুলন্দ হইতে থাকে। তবে যেহেতু ইহা মুজাহাদার ব্যাপার সেহেতু আল্লাহ পাকের নিকট সুস্থতাই চাওয়া উচিত। আর অসুস্থতা আসিলে খুশি মনে ছবর করা উচিত।

(এমন বার্ধক্য যাহা বুদ্ধিবিভ্রম ঘটায়) তখন মানুষ কোন আমল করিবার যোগ্যতাই হারাইয়া ফেলে। কি করে, কি বলে তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারে না। এমন কি অযু করাইয়া নিয়ত বাঁধাইয়া দিলেও সে নিয়ত ছাড়িয়া দেয়। কোরআন শরীফে ইহাকেই ارذل। বলা হইয়াছে এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ধরনের বার্ধক্য হইতেই পানাহ চাহিয়াছেন। অবশ্য এই বার্ধক্যের জন্য বয়সের নির্দিষ্ট কোন সীমা নাই। কাহারও পঁচাত্তর বৎসর বয়সেও হইতে পারে, কাহারো একশত বৎসরেও হইতে পারে। আবার আল্লাহ পাক মেহেরবানীপূর্বক হিফাযত করিলে আরও অধিক বয়সেও মানুষ ইবাদতনিমগ্নতায় বহু যুবকের চাইতেও সক্ষম থাকে। হযরত ইকরামা (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি নিয়মিত কোরআন তিলাওয়াত করে তাহাকে আল্লাহ পাক এইরূপ বার্ধক্য হইতে হিফাযত করিবেন। ইনশাআল্লাহ।

(আকস্মিক মৃত্যু) মউতের অর্থ অনন্ত জীবনের পথে যাত্রা শুরু। মউতের সময় মুমিন বান্দা এই মহাযাত্রার জন্য বিভিন্ন রকম প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়া থাকে। শেষ বারের মত তাওবা ইস্তিগফার করে এবং খাতিমা বিল-খায়রের জন্য দু'আ করিতে থাকে যাহা আকস্মিক মৃত্যুর সময় হয় না। তাই আকস্মিক মৃত্যু একটি ফিতনা এবং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা হইতে পানাহ চাহিয়াছেন।

অবশ্য মুসনাদে ইবনে আবী শায়বা কিতাবে নিম্নোক্ত হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে–

موت الفجأة راحة للمؤمن و اسف على الفاجر *

আল্লামা আইনী (রহঃ) ইহার ব্যাখ্যা প্রসংগে বলিয়াছেন যে, ইহা ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে যিনি পূর্ব হইতে মৃত্যুর জন্য প্রস্তত ছিলেন।

অন্য এক ব্যাখ্যামতে আকস্মিক মৃত্যু অর্থ যৌবনকালের মৃত্যু। অল্প বয়সে মারা গেলে আমলের সুযোগ কম হয়। অথচ দীর্ঘ বয়স লাভ করিলে অধিক আমলের সুযোগ হয়। আর গোনাহ হইয়া গেলে তাওবা দ্বারা উহার মোচন হইয়া যায়। যেহেতু যুবক বয়সেও মউত আসিয়া যাইতে পারে সেহেতু ভবিষ্যতের অপেক্ষায় না থাকিয়া এখনই ইবাদতে লাগিয়া যাওয়া উচিত।

(দাজ্জাল তো নিকৃষ্টতম অনাগত বিষয়) কেননা দাজ্জালের ফিতনা এমনই ভয়ংকর হইবে যে, যাহারা উহার সম্মুখীন হইবে তাহাদের মাঝে খুব কম মানুষই নিজের দ্বীন ঈমান রক্ষা করিতে পারিবে। এইজন্য প্রত্যেক নবী তাঁহার উম্মতকে দাজ্জালের ফিতনা সম্পর্কে সতর্ক করিয়াছেন।

৯৬। দ্বীনী ইয্যত লাভের আকাঙক্ষা

اَلثَّامِنُ: عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ: «لَاُعْطِيَنَّ هٰذِهِ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ، يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلٰى يَدَيْهِ»، قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: مَا اَحْبَبْتُ الْاِمَارَةَ اِلَّا

يَوْمَئِذٍ، فَتَسَاوَرْتُ لَهَا رَجَاءَ أَنْ أُدْعَى لَهَا، فَدَعَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا، وَقَالَ: «امْشِ وَلَا تَلْتَفِتْ حَتَّى يَفْتَحَ اللهُ عَلَيْكَ» فَسَارَ عَلِيٌّ شَيْئًا، ثُمَّ وَقَفَ وَلَمْ يَلْتَفِتْ؛ فَصَرَخَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، عَلَى مَاذَا أُقَاتِلُ النَّاسَ؟ قَالَ: «قَاتِلْهُمْ حَتَّى يَشْهَدُوْا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، فَإِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ فَقَدْ مَنَعُوْا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

«فَتَسَاوَرْتُ» هُوَ بِالسِّيْنِ الْمُهْمَلَةِ: أَيْ وَثَبْتُ مُتَطَلِّعًا.

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার যুদ্ধের দিন বলিলেন, (আগামীকাল) এই ঝাণ্ডা অবশ্যই আমি এমন এক লোকের হাতে দিব যে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকে ভালবাসে। তাহার হাতে আল্লাহ্ বিজয় দান করিবেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, সেই দিন ছাড়া আর কোনদিন আমি নেতৃত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা করি নাই। এই আশায় আমি মাথা উঁচাইয়া দাঁড়াইতেছিলাম যে, হয়ত নেতৃত্বের জন্য আমাকে ডাকা হইবে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী বিন আবু তালিব (রাঃ)-কে ডাকিলেন এবং ঝাণ্ডা তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন, অগ্রসর হও এবং আল্লাহ্ তোমাকে বিজয় দান করিবার পূর্বে কোন দিকে তাকাইও না। আলী (রাঃ) কিছু দূর অগ্রসর হইলেন। অতঃপর থামিলেন এবং না ফিরিয়া উচ্চ স্বরে বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কিসের ভিত্তিতে মানুষের বিরুদ্ধে লড়াই করিব। তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং মুহম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল-- এই কথার সাক্ষ্য দেওয়া পর্যন্ত তাহাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর। যদি তাহারা এই সাক্ষ্য দেয় তবে তাহারা নিজেদের জান-মাল তোমার হাত হইতে নিরাপদ করিয়া ফেলিল, তবে 'হকের' প্রশ্ন আলাদা। আর তাহাদের হিসাব কিতাবের যিম্মাদারি আল্লাহর উপর। (মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

খায়বার যুদ্ধ সপ্তম হিজরীর ঘটনা। মদীনা হইতে কিছু দূরে খায়বার নামক স্থানে ইহুদীদের বসতি ছিল। তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তিবিধানের জন্য এই যুদ্ধ পরিচালিত হইয়াছিল।

প্রথমে দুইজন বিশিষ্ট ছাহাবীর হাতে যুদ্ধের ঝাণ্ডা দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা সুরক্ষিত খায়বার দুর্গ জয় করা সম্ভব হয় নাই। পরে হযরত আলী (রাঃ)-এর হাতে ঝাণ্ডা দেওয়া হইল এবং রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁহার হাতেই খায়বার দুর্গের পতন ঘটিয়াছিল।

(এই আশায় মাথা উচাইয়া দাঁড়াইতেছিলাম।) ইহা নেতৃত্বের প্রতি মোহের কারণে নহে। বরং এই কারণে যে, উক্ত নেতৃত্ব লাভের অর্থ ছিল নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি তাঁহার ভালবাসা প্রমাণিত হওয়া।

(কোনদিকে তাকাইও না) যাহাতে পূর্ণ আধ্যাত্মিক মনোযোগ হইতে তিনি বিচ্যুত না হন।

(না ফিরিয়া উচ্চস্বরে বলিলেন,) সম্বোধন করিবার জন্য ফিরিয়া তাকাইবার প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও হযরত আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে ফিরিয়া তাকান নাই। কেননা তিনি চাহিতেছিলেন যেন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিষেধাজ্ঞার বিন্দুমাত্র নড়চড় না হয়। ইহারই নাম ইত্তেবায়ে সুন্নাতে রাসূল। ছাহাবা কেরাম পরবর্তী উম্মতকে বাস্তব নমুনা দেখাইয়া গিয়াছেন যে, কিভাবে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ নিষেধের হুবহু ইত্তেবা করিতে হইবে।

এই হাদীছ হইতে বুঝা গেল যে, অমুসলমানদের সহিত যুদ্ধ করিবার পূর্বে তাহাদিগকে ইসলামের দাওয়াত দিতে হইবে। তবে যদি ইতিপূর্বে দাওয়াত তাহাদের নিকট পৌঁছিয়া থাকে তবে নতুন করিয়া দাওয়াত দেওয়া ওয়াজিব নহে, মুস্তাহাব।

(তবে হক্কের প্রশ্ন আলাদা) হক্কের অর্থ এই যে, যদি এমন কোন কাজ করিয়া বসে যাহাতে তাহাকে হত্যা করা ওয়াজিব হয়, যেমন ইচ্ছাকৃতভাবে কাহাকেও হত্যা করিল। তখন তাহাকেও কিছাছ রূপে হত্যা করা হইবে। পক্ষান্তরে অনিচ্ছাকৃত হত্যা করিলে তখন দিয়ত ওয়াজিব হইবে।

(তাহাদের হিসাব কিতাবের যিম্মাদারি আল্লাহর উপর) অর্থাৎ শুধু মুখের উচ্চারণ দ্বারাই তাহাদিগকে মুসলমান ধরিতে হইবে। যদি অন্তরেও তাহারা ঈমান আনিয়া থাকে তবে দুনিয়াতে যেমন ইহা ফলদায়ক হইয়াছে তেমনি আখিরাতেও ফলদায়ক হইবে এবং আযাব হইতে নাজাত দিবে। অন্যথায় আখিরাতে ইহা কোন কাজে আসিবে না বরং মুনাফিকরূপে তাহারা চিরজাহান্নামী হইবে। তবে দুনিয়াতে মুসলমান হিসাবে সমান সুযোগ সুবিধা লাভ করিবে।

بسم الله الرحمن الرحيم

ছাহাবা পরিচিতি

আবু তাহের মিছবাহ্

ছাহাবা পরিচিতি

যেহেতু ছাহাবা কেরাম দ্বীন ও শরীয়তের প্রথম ধারক ও বাহক এবং উম্মত ও তাহার নবীর মাঝে একমাত্র যোগসূত্র সেহেতু ছাহাবা কেরামের প্রতি প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরে অশেষ আযমত ও মুহব্বত থাকা জরুরী। এমন কি ছাহাবা কেরামের প্রতি মুহব্বতকে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মুহব্বতের প্রমাণ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। তিনি ইরশাদ করিয়াছেন—

من احبهم فبحبى احبهم *

যে তাহাদিগকে ভালবাসিবে সে আমার প্রতি ভালবাসার কারণেই তাহাদিগকে ভালবাসিবে।

কোন ব্যক্তির প্রতি মুহব্বত পয়দা হইবার একটি বড় মাধ্যম তাহার জীবন ও চরিত্র সম্পর্কে অবগত হওয়া। এই হিসাবে আমাদের উচিত অতি সংক্ষেপে হইলেও ছাহাবা কেরামের জীবনচরিত সম্পর্কে অবগত হওয়া। সেই জন্য এখানে আমরা পাঠকবর্গের সামনে ঐ সকল ছাহাবা কেরামের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলিয়া ধরিতেছি যাহাদের বর্ণিত হাদীছ আলোচ্য গ্রন্থে স্থান লাভ করিয়াছে। ইনশাআল্লাহ প্রত্যেক খণ্ডে উহাতে সংকলিত হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবীগণের পরিচয় পেশ করা হইবে। আল্লাহ আমাদের অন্তরকে ছাহাবা কেরামের প্রতি মুহব্বতে পরিপূর্ণ করিয়া দিন এবং তাঁহাদের জীবনাদর্শ অনুসরণ করিবার তাওফিক দান করুন। কেননা তাহাদের সকলেই ছিলেন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত ও জীবনাদর্শের বাস্তব নমুনা। আল্লাহুম্মা আমীন।

১। হযরত ওমর (রাঃ)

উম্মতের পক্ষ হইতে তাঁহাকেই সর্বপ্রথম আমীরুল মুমিনীন (বা মুমিনগণের নেতা) লকব ও উপাধি দান করা হয়। তাঁহার কুনিয়াত বা উপনাম হইল আবু হাফছ (অর্থ সিংহের পিতা) তাঁহার অতুলনীয় সাহস ও বীরত্বের জন্য স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে এই কুনিয়াত দান করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম খাত্তাব। কা'আব বিন লুআই পর্যন্ত গিয়া তাঁহার ও নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশ-তালিকা অভিন্ন হইয়া যায়।

এই বিষয়ে কাহারও দ্বিমত নাই যে, প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর পরে তিনিই উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এইভাবে দু'আ করিয়াছিলেন, হে আল্লাহ! ওমর ইবনুল খাত্তাব অথবা আবুল হাকাম [১] এই দুইজনের একজনকে মুসলমান করিয়া ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করুন। তাঁহার এই দু'আ হযরত ওমর (রাঃ)-এর

১। অর্থ্যাৎ আবু জাহ্ল

শানেই কবুল হইয়াছিল। তাই তিনি আল্লাহর রাসূলকে কতল করিবার নিয়তে খোলা তলোয়ার লইয়া বাহির হইলেন। কিন্তু আল্লাহর এমনই কুদরত যে, পথেই তাঁহার ভাবান্তর হইল এবং দরবারে রিসালতে হাযির হইয়া তিনি ইসলাম গ্রহণ করিলেন।

তাঁহার ইসলাম গ্রহণ দ্বারা মুসলমানদের হিম্মত ও মনোবল এতটা বৃদ্ধি পাইল যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতিক্রমে তিনি মুসলমানদের জামা'আতসহ প্রকাশ্যে বাইতুল্লাহ শরীফের সামনে নামায আদায় করিলেন।

মুসলমানগণ অতি সংগোপনে মদীনায় হিজরত করিতেন। কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) বাইতুল্লাহ শরীফে হাযির হইয়া প্রথমে তাওয়াফ করিলেন। অতঃপর কুরায়শদের প্রত্যেক মজলিসে গিয়া ঘোষণা করিলেন, আমি মক্কা ত্যাগ করিয়া মদীনায় হিজরত করিতেছি। সুতরাং কাহারো যদি সাধ জাগে আপন মাতাকে পুত্রহারা এবং আপন সন্তানকে এতীম এবং আপন স্ত্রীকে বিধবা করিবার তবে সে যেন এই উপত্যকার পিছনে আমার মুকাবেলায় হাযির হয়।

কিন্তু আল্লাহর কসম! আপন সন্তানকে এতীম এবং আপন স্ত্রীকে বিধবা করিবার সাহস কাহারো হয় নাই এবং কেহ তাঁহাকে বাধা প্রদানের হিম্মত করে নাই।

তবুক যুদ্ধের সময় তিনি তাঁহার অর্ধেক সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দান করিয়াছিলেন।

খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি এমনই ইনছাফপূর্ণ ও আদর্শ রাষ্ট্র পরিচালনা করিয়াছিলেন যে, ইসলামের শত্রু-মিত্র সকলেই অকুণ্ঠ ভাষায় স্বীকার করেন যে, পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁহার কোন তুলনা নাই। রাত্রের অন্ধকারে পথে পথে ঘুরিয়া তিনি প্রজাসাধারণের খবর লইতেন। একবারের ঘটনা-- গভীর রাত্রে মদীনার বাহিরে তিনি একটি আলো দেখিতে পাইয়া সেই স্থানে গিয়া হাযির হইলেন এবং দেখিলেন, এক স্ত্রীলোক চুলার উপর পানি জ্বাল দিতেছে আর তাহার চারিপাশে ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে কান্নাকাটি করিতেছে। হযরত ওমর (রাঃ) অবস্থা জানিতে চাহিলে স্ত্রী লোকটি বলিল, সন্তানগুলি ক্ষুধায় কাঁদিতেছে। খাবার কিছুই নাই। তাই চুলায় পানি জ্বাল দিয়া তাহাদিগকে মিথ্যা সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিতেছি, যাহাতে তাহারা ঘুমাইয়া যায়। হযরত ওমর (রাঃ) সব কথা শুনিয়া মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। বাইতুল মাল হইতে প্রয়োজনীয় খাদ্য নিজে বহন করিয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং নিজ হাতে রান্না করিয়া ক্ষুধার্ত শিশুদিগকে খাবার খাওয়াইলেন।

এইরূপ আরও বহু ঘটনা বর্ণিত আছে।

তাঁহার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিলো আল্লাহর বিধান ও আহকাম পালনে ও প্রয়োগে অসাধারণ কঠোরতা। তাঁহার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন—

اشدهم فى امر الله عمر *

আল্লাহর আদেশ নিষেধের ব্যাপারে ছাহাবা কেরামের মাঝে কঠোরতম হইলেন ওমর।

তিনি আরও বলিয়াছেন—

ان الشيطان ليخاف منك يا عمر!

হে ওমর! নিঃসন্দেহে শয়তান তোমাকে ভয় করে।

আরও বলিয়াছেন–

رحم الله عمر يقول الحق و ان كان مرا *

আল্লাহ ওমরকে রহম করুন। তিক্ত হইলেও তিনি সত্য বলেন।

দশ বৎসর পাঁচ মাস একুশ দিন খিলাফতের দায়িত্ব পালনের পর তিনি এক গুপ্তঘাতকের হাতে শাহাদাত বরণ করেন এবং হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর হুজরায় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর পাশে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে হযরত ওমর (রাঃ)-এর সনদে সর্বমোট পাঁচশত সাইত্রিশটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে একত্রে ছাব্বিশটি হাদীছ এবং এককভাবে বুখারী শরীফে চৌত্রিশটি এবং মুসলিম শরীফে একুশটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে।

২। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)

হিজরতের তিন বৎসর পূর্বে মাত্র ছয় বৎসর বয়সে মক্কা শরীফে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে বিবাহ করেন এবং দ্বিতীয় হিজরীতে বদর যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর শাওয়াল মাসে নয় বৎসর বয়সে তাঁহার সংগে বাসর যাপন করেন। তাঁহার আঠার বৎসর বয়সে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াফাত লাভ করেন। ইহার পর তিনি দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর জীবিত ছিলেন এবং সাতান্ন কিংবা আটান্ন হিজরীর ৭ই রমযান রাত্রে বিতরের নামাযের পর ইন্তিকাল করিয়াছেন। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) তাঁহার জানাযা পড়াইয়াছেন।

তাঁহার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁহার পবিত্রতার সাক্ষ্য দান করিয়া আল-কোরআনের আয়াত নাযিল করিয়াছেন। হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর পরে তাঁহাকেই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব চাইতে বেশী ভালবাসিতেন। হাদীছ, আরবী সাহিত্য, কবিতা, আরবদের বংশ-ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে তিনি বিশেষ পারদর্শিণী ছিলেন। ফিকাহ শাস্ত্রে তাঁহার জ্ঞান ছিল অতি গভীর। বিশিষ্ট ছাহাবাগণও তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ ও ফতোয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

তাঁহার দানশীলতার অবস্থা ছিল এই যে, একবার তিনি রোযা অবস্থায় ছিলেন। তাঁহার নিকট একলক্ষ দিরহাম হাদিয়া আসিল। তিনি উহা দান করিতে শুরু করিলেন। এমন কি একটি দিরহামও অবশিষ্ট রহিল না। সন্ধ্যার সময় দেখা গেল, ইফতার করিবার মত কিছুই নাই। তখন খাদেমা অনুযোগ করিয়া বলিল, একটি দিরহাম রাখিয়া দিলে তো গোশত ক্রয় করিয়া ইফতারের ব্যবস্থা করা যাইত। তিনি বলিলেন, এখন বলিলে কি লাভ হইবে। তখন স্মরণ করাইয়া দিলে না হয় রাখিয়া দিতাম।

তিনি যখন আল্লাহর ভয়ে কাঁদিতেন তখন চোখের পানিতে তাঁহার দোপাট্টা ভিজিয়া যাইত। আল্লাহ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হউন।

বর্ণিত হাদীছ সংখ্যা ঃ তাঁহার সূত্রে সর্বমোট দুই হাজার দুইশত দশটি হাদীছ বর্ণিত

হইয়াছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে একত্রে একশত চুয়াত্তরটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। আর এককভাবে বুখারী শরীফে চৌষট্টিটি এবং মুসলিম শরীফে আটষট্টিটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে।

৩। হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ)

তিনি বিশিষ্ট আনছারী ছাহাবী ছিলেন। নিজের সম্পর্কে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আমি উনিশটি গাযওয়ায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলাম। বদর ও অহুদ যুদ্ধে আমার আব্বা আমাকে অংশ গ্রহণ করিতে বাধা দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি শহীদ হইবার পর আর কোন গাযওয়ায় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগ হইতে পিছনে থাকি নাই। তিনি আরও বলেন, আমি, আমার আব্বা এবং আমার মামা বাই'আতুল আকাবায় শরীক ছিলাম। উক্ত বাই'আতে তাঁহার আব্বা হযরত আব্দুল্লাহ আনছারীদের নকীব বা প্রতিনিধিদের একজন ছিলেন। বয়সের দিক হইতে হযরত জাবির (রাঃ) ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ ছাহাবী। ছাহাবা কেরামের মাঝে তাঁহার বিশেষ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য ছিল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মুহব্বতে তাঁহার অন্তর ছিল পরিপূর্ণ।

তাঁহার আব্বা আব্দুল্লাহ (রাঃ) বেশ ঋণ রাখিয়া শহীদ হইয়াছিলেন। তাঁহার ছোট ছোট কয়েকটি বোন ছিল। তিনি পিতার ঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন এবং বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়া বোনদের লালন পালন করিয়াছিলেন। এই জন্য রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার প্রতি অতীব সন্তুষ্ট ছিলেন।

শেষ বয়সে তাঁহার দৃষ্টিশক্তি লোপ পাইয়াছিল। তেহাত্তর হিজরীতে চৌরানব্বই বৎসর বয়সে মদীনায় তিনি মৃত্যু বরণ করেন। তিনি ছিলেন মদীনায় মৃত্যু বরণকারী সর্বশেষ ছাহাবী।

বর্ণিত হাদীছ সংখ্যা ঃ তাঁহার সূত্রে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে সর্বমোট একহাজার পাঁচশত চল্লিশটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে একত্রে ষাটটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে এককভাবে বুখারী শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ষোলটি হাদীছ এবং মুসলিম শরীফে একশত চব্বিশটি হাদীছ।

৪। হযরত আবু ইয়াযীদ মা'আন বিন ইয়াযীদ (রাঃ)

বর্ণিত আছে যে, হযরত মা'আন হযরত ইয়াযীদ ও হযরত আখনাস (রাঃ) ইঁহারা পিতা, পুত্র ও নাতি তিনজনই বদর যুদ্ধে শরীক হইয়াছিলেন। এই মহাসৌভাগ্য আর কোন পরিবারের ভাগ্যে জুটে নাই।

হযরত মা'আন (রাঃ) যথাক্রমে কুফা, মিশর ও সিরিয়াতে বসবাস করিয়াছেন এবং চৌষট্টি হিজরীতে মারওয়ানের রাজত্বকালে নিহত হইয়াছেন। আল্লামা ইবনে জাওযী (রহঃ)-এর মতে তাঁহার সূত্রে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাঁচটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে।

৫। হযরত সা'আদ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ)

ইনি জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ ছাহাবার অন্যতম। চারিজন কিংবা ছয়জনের পরেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। তখন তাঁহার বয়স ছিল সতের বৎসর। তিনি নিজেই বলিলেন যে, নামায ফরয হইবার আগেই আমি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলাম।

নিজের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে তিনি বলেন, একরাত্রে স্বপ্নে দেখিলাম, যেন আমি অন্ধকারে আছি। কিছু দেখা যাইতেছে না। এমন সময় উজ্জ্বল চাঁদ দেখা দিল। আর আমি সেই চাঁদকে অনুসরণ করিতে লাগিলাম। কিন্তু যায়দ বিন হারিছা, আলী বিন আবু তালিব ও আবু বকর আমার পূর্বেই চাঁদটির নিকটে পৌঁছিয়া গিয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনারা কখন এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন? তাহারা বলিলেন, এই মাত্র। এই স্বপ্ন দেখিবার পর আমি খবর পাইলাম যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোপনে ইসলামের দাওয়াত দিতেছেন। তখন আমি আজয়াদ গিরিপথে তাঁহার সহিত দেখা করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিলাম।

তিনি আরও বলেন, এই আয়াতটি আমার সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে–

و ان جاهداك على ان تشرك بى ما ليس لك به علم *

যদি তাহারা (মা-বাবা) এমন জিনিসকে আমার সহিত শরীক করিতে তোমাকে চাপ দেয় যাহার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নাই। তবে তুমি তাহাদের আনুগত্য করিও না। অবশ্য দুনিয়াতে তাহাদের সংগে সদাচরণপূর্বক বাস করিবে।

তিনি বলেন, আমি আমার আম্মার খুবই ফরমাবরদার ছিলাম। তাই ইসলাম গ্রহণের খবর শুনিয়া তিনি পণ করিয়া বসিলেন যে, হয় তুমি তোমার নূতন ধর্ম ত্যাগ করিবে নতুবা মৃত্যু পর্যন্ত আমি পানাহার স্পর্শ করিব না। তাহার ধারণা ছিল যে, তাহার কষ্ট আমি কিছুতেই বরদাশত করিতে পারিব না। ফলে বাধ্য হইয়া ধর্ম ত্যাগ করিব। কিন্তু আমি তাহাকে সাফ বলিয়া দিলাম, আল্লাহর কসম! তোমার যদি এক হাজার প্রাণ থাকে আর একটি একটি করিয়া প্রাণ বাহির হইতে থাকে তবু কোন কিছুর জন্য আমি আমার দ্বীন ত্যাগ করিব না। আমার এই অনড় মনোভাব দেখিয়া একদিন পর তিনি পানাহার করিলেন। তখন এই আয়াত নাযিল হইল।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তাঁহাকে দেখাইয়া বলিলেন, ইনি আমার মামা। কেহ তাহার এমন মামা দেখাউক দেখি! উল্লেখ্য, তিনি ছিলেন হযরত আমেনা (রাঃ)-এর চাচাত ভাই।

বদর, অহুদ ও অন্য সকল যুদ্ধে তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত শরীক ছিলেন। সকল যুদ্ধে তিনি তাঁহাকে পাহারা দিতেন। তাঁহাকে বলা হইত فارس الاسلام বা ইসলামের শাহ-সওয়ার। অহুদ যুদ্ধে তিনি অতুলনীয় শৌর্যবীর্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে এই বলিয়া উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন ارم فداك ابى و امى আমার আম্মা আব্বা তোমার প্রতি উৎসর্গ হউন। তুমি তীর নিক্ষেপ করিতে থাক।

এইভাবে পিতা-মাতা উৎসর্গ করিবার কথা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর কাহারও বেলায় বলেন নাই। অহুদের যুদ্ধে তিনি এক হাজার তীর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার দু'আ কবুল হইবার জন্য এইভাবে দু'আ করিয়াছিলেন।

اللهم استجب لسعد اذا دعاك *

হে আল্লাহ। সা'আদ যখন তোমার নিকট দু'আ করে তখন তুমি তাহার দু'আ কবুল কর।

এই জন্য তিনি দু'আ করিবা মাত্র তাহা কবুল হইত। মানুষও ইহা জানিত। তাই তাঁহার দু'আকে খুব ভয় করিত।

ইসলামের ইতিহাসে তিনিই সর্বপ্রথম শত্রুর শরীর হইতে রক্ত ঝরাইয়াছিলেন এবং শত্রুকে লক্ষ্য করিয়া প্রথম তীর ছুঁড়িয়াছিলেন এবং তিনিই ছিলেন কাদেসিয়া যুদ্ধের বিজয়ী সেনাপতি, যে যুদ্ধে পারস্য সম্রাজ্যের শক্তি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

হযরত ওমর (রাঃ) মৃত্যু শয্যায় যে ছয়জনকে তাঁহাদের মধ্য হইতে কোন একজনকে খলীফা রূপে নির্বাচন করিবার দায়িত্ব প্রদান করিয়াছিলেন, হযরত সা'আদ ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার সম্পর্কে অন্যান্যদিগকে তিনি এই উপদেশ দান করিয়াছিলেন, যদি তিনি খলীফা নির্বাচিত হন তবে তো ভাল আর যদি অন্য কেহ নির্বাচিত হয় তবে আমার পরবর্তী খলীফাকে আমি অছীয়ত করিয়া যাইতেছি যেন, তাঁহাকে কোন অঞ্চলের প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়।

বীরত্ব ও সাহসিকতা, আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে কঠোরতা, সুন্নাতের ইত্তেবা, দুনিয়াবিমুখতা, সত্যবাদিতা ও বিনয় সম্পর্কে তাঁহার বহু ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে।

আটান্ন কিংবা পঞ্চান্ন হিজরীতে মদীনা হইতে সাত মাইল দূরবর্তী আকীক অঞ্চলে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। পরে কাঁধে করিয়া তাঁহার জানাযা মদীনায় আনা হয়। মদীনার প্রশাসক মারওয়ান ইবনুল হাকাম তাঁহার জানাযা পড়াইয়াছেন। তিনি ছিলেন মদীনায় মৃত্যুবরণকারী সর্বশেষ মুহাজির।

মৃত্যুর সময় তিনি তাঁহার একটি পুরাতন ও জীর্ণ জুব্বা আনাইয়া বলিলেন, আমাকে ইহাতে করিয়া কাফন দিও। কেননা আমি এই জুব্বা পরিয়াই বদর যুদ্ধের দিন মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছিলাম। আর আজিকার এই দিনটির জন্যই ইহাকে যত্ন করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলাম।

বর্ণিত হাদীছ সংখ্যা ঃ তাঁহার সূত্রে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে দুইশত সত্তরটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে একত্রে পনেরটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে এককভাবে বুখারী শরীফে বর্ণিত হইয়াছে পনেরটি এবং মুসলিম শরীফে আঠারটি।

৬। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)

তাঁহার আসল নাম কি? এই সম্পর্কে প্রায় ৩৫টি মত রহিয়াছে। তবে বিশুদ্ধতম মত এই যে, তাঁহার আসল নাম ইসলাম পূর্বযুগে আবদুস সামস ছিল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা পরিবর্তন করিয়া আব্দুর রহমান রাখিয়াছেন।

আবু হোরায়রা হইল তাঁহার উপনাম। ইহার অর্থ- বিড়ালছানার পিতা। এই উপনামের কারণ তিনি নিজে এইভাবে বর্ণনা করেন যে, একবার আমি একটি বিড়ালছানা জামার হাতার ভিতরে করিয়া লইয়া আসিলাম। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি? আমি বলিলাম, বিড়াল। তিনি বলিলেন, انت ابو هريرة (তবে তুমি

বিড়ালছানার পিতা।) তখন হইতে এই উপনামে তিনি এমনই পরিচিত হইলেন যে, আসল নাম একেবারেই চাপা পড়িয়া গেল।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) আপন গোত্র 'দাওস'-এর নেতা হযরত তোফায়ল বিন আমর দাওসী (রাঃ)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

হযরত তোফায়ল (রাঃ) বলেন, আমি মক্কা শরীফে আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতের বিষয় জানিতে পারিলাম এবং তাঁহার হাতে হাত রাখিয়া ইসলাম গ্রহণ করিলাম। অতঃপর আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার কাওমের নিকট ফিরিয়া তাহাদিগকে ইসলামের দাওয়াত দিব। ....অতঃপর আমি দাওস গোত্রকে দাওয়াত দিলাম। কিন্তু আবু হোরায়রা ছাড়া সকলেই পিছাইয়া থাকিল। আবু হোরায়রা সকলের আগে ইসলাম গ্রহণ করিল।.......

হিজরতের ছয় বৎসর পর খায়বর যুদ্ধের সময় দাওস গোত্রের আশিটি পরিবারের সহিত হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) মদীনা শরীফে আগমন করেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) স্থায়ী ভাবেই আছহাবে ছুফফার সদস্য ছিলেন। যাহারা মসজিদে নববীর এক কোণায় পড়িয়া থাকিয়া সর্বক্ষণ নববী ইলম ও ফয়য হাছিল করিতেন। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) সারাক্ষণ ছায়ার ন্যায় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে থাকিতেন। ফলে হাদীছ হিফয করিবার ক্ষেত্রে তিনি ছাহাবা কেরামের সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছিলেন। এই জন্য তাহাকে এমন কষ্ট সহ্য করিতে হইত যে, অনেক সময় মসজিদের দরজার সামনে পড়িয়া যাইতেন এবং ছটফট করিতেন। তিনি বলেন, আমার এই অবস্থা দেখিয়া অনেকে আমাকে মৃগিরোগী ভাবিত। কিন্তু আল্লাহর কসম! ইহা মৃগিরোগ ছিল না। ইহা ছিল ক্ষুধা।

এই ধরনের আরও বহু ঘটনা তাঁহার সম্পর্কে বর্ণিত আছে।

অনেক পরে ইসলাম গ্রহণ করিয়াও সর্বাধিক সংখ্যক হাদীছের বর্ণনাকারী তিনি কিভাবে হইতে পারিলেন এই সম্পর্কে তিনি নিজেই বর্ণনা করেন, "মানুষ বলে যে, আবু হোরায়রা অতিমাত্রায় হাদীছ বর্ণনা করে।........(আসল বিষয় এই যে,) আমাদের মুহাজির ভাইগণ বাজারে ব্যবসায়ে ব্যস্ত থাকিতেন, আর আমাদের আনছারী ভাইগণ তাহাদের কৃষিকাজে ব্যস্ত থাকিতেন। অথচ আবু হোরায়রা পেটেভাতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে লাগিয়া থাকিতো। ফলে তাহারা যে সকল মজলিসে অনুপস্থিত থাকিতেন আবু হোরায়রা সেইগুলিতে উপস্থিত থাকিত।[১]

ইহাছাড়া হযরত যায়দ বিন ছাবিত (রাঃ) বলেন, একবার আমি, আমার এক সাথী ও আবু হোরায়রা– আমরা এই তিনজন দু'আ করিতেছিলাম। আমি এবং আমার সাথী দু'আ করিলাম। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমীন বলিলেন। অতঃপর আবু হোরায়রা বলিলেন, হে আল্লাহ! আমার দুই সাথী যাহা চাহিয়াছে আমিও তাহা চাহিতেছি আর এমন ইলম চাহিতেছি যাহা কখনও ভুলিব না। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমীন বলিলেন,

১। এবং তাহারা যাহা মুখস্থ করিতে পারিতেন না আবু হোরায়রা তাহা মুখস্থ করিত।

তখন আমরা দুইজনও এই দু'আ করিলাম, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন। দাওসী যুবক এই বিষয়ে তোমাদের আগে চলিয়া গিয়াছে।

এই দু'আর বরকতেই তিনি কখনো কোন হাদীছ ভুলিতেন না। ফলে তাঁহার মাধ্যমে উম্মত পাঁচ হাজার তিনশত চুয়াত্তরটি হাদীছ লাভ করিয়াছে, বলাবাহুল্য যে, এত অধিক পরিমাণ হাদীছ আর কাহারও সূত্রে বর্ণিত হয় নাই।

যখন বিজয় অভিযান শুরু হইল এবং মুসলমানদের দিকে সম্পদের ঢল প্রবাহিত হইল তখন হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) সম্পদশালী হইলেন। কিন্তু তাঁহার জীবন ও চরিত্রে ইহার কোন প্রভাব পড়িতে পারে নাই। বর্ণিত আছে যে, মদীনার প্রশাসক হইবার পর একবার তিনি রেশমী রুমাল দ্বারা নাক ঝারিতেছিলেন। তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন, বাহ! আবু হোরায়রার কথা কি বলিব! একদিন তো তাহার অবস্থা এই ছিল যে, ক্ষুধার কারণে সে উপুড় হইয়া পড়িয়া থাকিত। ....

এমন কি মদীনার প্রশাসক থাকা অবস্থায়ও বাজার হইতে ঘরের জন্য লাকড়ী নিজেই বহন করিয়া আনিতেন।

তাঁহার তাকওয়া ও আমলের অবস্থা ছিল এই যে, সারাদিন রোযা রাখিতেন এবং ইলম চর্চায় নিমগ্ন থাকিতেন। আবার রাত্রের এক তৃতীয়াংশ নামাযে ও ইবাদতে কাটাইতেন। অতঃপর স্ত্রীকে দ্বিতীয়ভাগের জন্য জাগাইয়া দিতেন। আর তৃতীয়ভাগে তাঁহার কন্যা আয়েশা জাগ্রত থাকিতেন।

মৃত্যুশয্যায় হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহাকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, দেখ, আমি তোমাদের এই তুচ্ছ দুনিয়ার জন্য কাঁদিতেছি না। আমি তো কাঁদিতেছি (আখিরাতের) দীর্ঘ সফর এবং অল্প পাথেয়র কথা চিন্তা করিয়া। এখন আমি এমন এক পথের মাথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি যাহা আমাকে হয় জান্নাতে কিংবা জাহান্নামে লইয়া যাইবে। কিন্তু আমার জানা নাই যে, কোন পথের আমি পথিক হইব!

শেষ মুহূর্তে তিনি এই কথা বলিলেন–

اللهم انى احب لقائك فاحب لقائى و عجل لى فيه *

হে আল্লাহ! আমি তোমার সংগে মিলন ভালবাসী। সুতরাং তুমিও আমার সংগে মিলন ভালবাস এবং দ্রুত মিলনের ব্যবস্থা কর। এই কথার পর পরই তাঁহার পবিত্র রূহ অনন্তের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিল।

উনষট্টি হিজরীতে ৭৮ বৎসর বয়সে তিনি মদীনায় মৃত্যু বরণ করেন এবং জান্নাতুল বাকীতে সমাধিস্থ হন।

৭। হযরত আবু মুছা আশ'আরী (রাঃ)

ইনি ইয়ামানের সুবিখ্যাত আশ'আর গোত্রের সদস্য। মক্কা শরীফে আল্লাহর নবীর আগমন সংবাদ পাইয়া তিনি দেশ ত্যাগ করিয়া মক্কায় আগমন করিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে ইসলাম গ্রহণ করিলেন। অতঃপর হাবশায় হিজরত করিলেন। অতঃপর খাইবার যুদ্ধের সময় হযরত জাফর বিন আবু তালিব (রাঃ)-এর সংগে জাহাজযোগে

মদীনায় হিজরত করিলেন। এইভাবে তিনি তিনটি হিজরত করিয়াছিলেন। ইয়ামান হইতে মক্কায়, মক্কা হইতে হাবশায়, অতঃপর হাবশা হইতে মদীনায়।

তিনি অতি বড় যোদ্ধা ও সাহসী বীর ছিলেন। এমন কি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সম্পর্কে বলিয়াছেন–

سيد الفوارس ابو موسى

আবু মুসা হইল শ্রেষ্ঠ ঘোড়সাওয়ার।

পারস্য সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে পরিচালিত জিহাদে হযরত আবু মূসা (রাঃ) অসাধারণ ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন। পারস্য সেনাপতি হরমুযান তাঁহার হাতেই বন্দী হইয়াছিলেন।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে বিশেষ মর্যাদা দিতেন এবং সম্মান করিতেন। তাঁহার কুরআন তিলাওয়াত এত সুন্দর ছিল যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সম্পর্কে বলিতেন–

لقد اوتيت مزمارا من مزامير آل داود *

হযরত দাউদ (আঃ)-এর খান্দানের একটি বাঁশী আমাকে দান করা হইয়াছে।

প্রচণ্ড গরমের সময় তিনি রোযা রাখিতেন আর বলিতেন, তাপদগ্ধ দুপুরের পিপাসা হয়ত কিয়ামতের দিন আমাদের জন্য পিপাসা নিবারণের কারণ হইবে।

চৌচল্লিশ হিজরীতে ষাট বৎসর বয়সে তিনি মক্কায় (মতান্তরে কুফায়) মৃত্যু বরণ করেন।

বর্ণিত হাদীছ সংখ্যা ঃ তাঁহার সূত্রে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে সর্বমোট তিনশত ষাটটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে একত্রে ৪৯টি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে এককভাবে বুখারী শরীফে চারিটি এবং মুসলিম শরীফে পনেরটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে।

৮। হযরত আবু বাকরাহ নোফায় ইবনুল হারিছ ছাকাফী (রাঃ)

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তায়েফ অবরোধের সময় তায়েফ দুর্গ হইতে যে তেইশজন নির্যাতিত গোলাম পালাইয়া আসিয়াছিলেন তাঁহাদের অন্যতম হইলেন হযরত আবু বাকরাহ (রাঃ)। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছাহাবা কেরামের মাঝে ইনি বহু বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। ৫১ কিংবা ৫২ হিজরীতে বসরায় ইন্তিকাল করিয়াছেন।

বর্ণিত হাদীছ সংখ্যা ঃ তাঁহার সূত্রে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে একশত বত্রিশটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে একত্রে আটটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে এককভাবে বুখারী শরীফে পাঁচটি এবং মুসলিম শরীফে একটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে।

৯। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)

তাঁহার পিতা হইলেন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ)। সুতরাং হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) হইলেন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

পিতৃব্য-পুত্র। হিজরতের তিন বৎসর পূর্বে যখন বনু হাশেম গোত্র কোরায়শ কর্তৃক পূর্ণ অবরুদ্ধ ছিল এবং শিআবে আবী তালিব নামক স্থানে অসহনীয় অবরোধের জীবন যাপন করিতেছিল তখন সেই কঠিন মুহূর্তে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াফাতের সময় তাঁহার বয়স ছিল মাত্র তের বৎসর।

জন্মের পর তাঁহার আম্মা তাঁহাকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির করিলেন, আর তিনি তাহার মুখে থুথু দিলেন। এইভাবে তাঁহার পেটে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র থুথু প্রবেশ করিয়াছিল। ফলে তাঁহার অন্তরে জ্ঞান ও হিকমত এবং ইলম ও প্রজ্ঞার অন্তহীন স্রোতধারা জারি হইয়াছিল। তাঁহাকে বলা হইত রাঈসুল মুফাসসিরীন (শ্রেষ্ঠ মুফাসসির) এবং হিবরুল উম্মাহ (উম্মতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী) এবং রাব্বানীয়্যুল উম্মাহ (উম্মতের শ্রেষ্ঠ আল্লাহওয়ালা)

এত অল্প বয়সে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পরিচয় পাইয়া রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে বিশেষভাবে দু'আ দান করিয়াছিলেন। আর তিনিও ছায়ার মত তাঁহার সংগে থাকিতেন এবং পূর্ণ সজাগ ও সতর্ক অবস্থায় তাঁহার প্রতিটি আচরণ ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতেন এবং নিজের আমলে সেইগুলিকে বাস্তবায়ন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন।

অযুর সময় তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অযুর পানি ও মিসওয়াক আগাইয়া দিতেন। এই খিদমতে খুশী হইয়া তিনি তাঁহাকে এই বলিয়া দু'আ দিতেন–

اللهم فقهه فى الدين و علمه الكتاب *

হে আল্লাহ। তাহাকে দ্বীনের সমঝ এবং কোরআনের ইলম দান কর।

একদিন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নফল নামাযে দাঁড়াইবার সময় হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়া ইকতিদা করিতে বলিলেন। কিন্তু তিনি পাশে না দাঁড়াইয়া পিছনে দাঁড়াইলেন। নামায হইতে ফারিগ হইয়া রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আব্দুল্লাহ! আমার পাশে দাঁড়াইয়া নামায পড়িতে তোমার কি অসুবিধা ছিল? তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার পাশে দাঁড়াইয়া নামায পড়িব, আমার দৃষ্টিতে আপনার মর্যাদা ইহার চাইতে অনেক বড়।

তাঁহার এই প্রজ্ঞাপূর্ণ উত্তরে খুশী হইয়া রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে দু'আ দিয়া বলিলেন, اللهم آته الحكمة হে আল্লাহ! তাহাকে হিকমত ও প্রজ্ঞা দান করুন।

এই দু'আর এমন বরকত হইয়াছিল যে, হযরত ওমর (রাঃ) খেলাফতের জটিল জটিল বিষয়ে পরামর্শের জন্য বড় বড় ছাহাবা কেরামের সহিত তাঁহাকেও ডাকিতেন এবং তাঁহাকে আলাদা মর্যাদার সহিত বসাইতেন।

তাঁহার দানশীলতার বহু ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে। ইলম হাছিল করিবার জন্য যে কোন কষ্ট স্বীকার করিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সান্নিধ্যে থাকিয়া তিনি যে পরিমাণ ইলম ও ফয়েয লাভ করিয়াছিলেন তাহা তো বলাইবাহুল্য। কিন্তু তাঁহার ওয়াফাতের পর বিশিষ্ট আহলে ইলম ছাহাবা কেরামের খিদমতেও তিনি হাযির

হইতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে ইলম হাছিল করিতেন। নিজের সম্পর্কে তিনি বলেন, যখন আমি জানিতে পারিতাম যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অমুক ছাহাবীর নিকট একটি হাদীছ আছে তখন আমি তাঁহার বাড়ীর দরওয়াজায় গিয়া হাযির হইতাম এবং দুপুরের আরামের সময় হইলে তাঁহার দরওয়াজার নিকটে চাদর বিছাইয়া অপেক্ষা করিতাম। ফলে বাতাস ধূলাবালু উড়াইয়া আমাকে একাকার করিয়া দিত। অবশ্য আমি সেই মুহূর্তে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলে তিনি অবশ্যই অনুমতি দিতেন। কিন্তু আমি তাঁহার মনোরঞ্জনের জন্য অপেক্ষাই করিতাম। যখন তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া আমাকে এই অবস্থায় দেখিতেন তখন (সংকোচিত হইয়া) জিজ্ঞসা করিতেন, হে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতৃব্য-পুত্র! কি প্রয়োজনে তাশরীফ আনিয়াছেন? খবর পাঠাইলেন না কেন? আমি নিজেই হাযির হইতাম! উত্তরে আমি বলিতাম, আপনার খিদমতে আমার নিজের আসাই অধিক বাঞ্ছনীয়। কেননা ইলমের নিকট আগমন করিতে হয়। ইলম কাহারও নিকট গমন করে না। অতঃপর তাঁহাকে উক্ত হাদীছ জিজ্ঞাসা করিতাম।

ইবাদতের অবস্থা এই ছিল যে, দিনে রোযা রাখিতেন আর রাত্রি জাগরণ করিয়া নামায পড়িতেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবী মোলায়কা (রহঃ) বলেন, মক্কা হইতে মদীনার পথে এক সফরে আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সংগে ছিলাম। দিনভর সফরের পর রাত্রে সকলেই যখন ক্লান্তিতে ভাংগিয়া পড়িয়া ঘুমে অচেতন হইত তখন তিনি নামাযে দাঁড়াইয়া যাইতেন। এক রাত্রে তাঁহাকে দেখিলাম এই আয়াতটি বারবার পড়িতেছেন আর উচ্চস্বরে কাঁদিতেছেন। এমন কি এক সময় ভোর হইয়া গেল–

و جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد *

মৃত্যুযন্ত্রণা সত্য সত্যই উপস্থিত হইল, ইহা তো ঐ জিনিস যাহা হইতে তুমি গাফেল থাকিতে।

আল্লাহর ভয়ে, মৃত্যুর স্মরণে এবং কবর ও হাশরের চিন্তায় তিনি এত কাঁদিতেন যে, চক্ষুদ্বয় হইতে নির্গত অশ্রুধারায় দুই গণ্ডদেশে দাগ পড়িয়া গিয়াছিল। এই কারণে শেষ জীবনে তাঁহার দৃষ্টিশক্তি পর্যন্ত লোপ পাইয়াছিল।

আটান্ন হিজরীতে হযরত ইবনে যোবায়র (রাঃ)-এর খেলাফতকালে তায়েফে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল এবং তায়েফেই তিনি সমাধিস্থ হইয়াছেন। হযরত আলী (রাঃ)-এর পুত্র মুহম্মদ ইবনুল হানাফিয়া তাঁহার জানাযা পড়াইয়াছিলেন।।

বর্ণিত হাদীছ সংখ্যা ঃ তাঁহার সূত্রে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে সর্বমোট এক হাজার ছয়শত ষাটটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে একত্রে পঁচানব্বইটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে এককভাবে বুখারী শরীফে রহিয়াছে আটাশটি হাদীছ এবং মুসলিম শরীফে উনচল্লিশটি।

১০। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)

হিজরতের এক বৎসর পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন এবং শৈশবেই পিতার সহিত মক্কা হইতে মদীনায় হিজরত করিয়াছেন। বদর ও অহুদ যুদ্ধে অল্প বয়স্কতার কারণে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে সংগে নেন নাই। পরিখা যুদ্ধের সময় তাঁহার বয়স ছিল

পনের বৎসর। সেই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে শরীক হইবার অনুমতি দিয়াছিলেন। ইহার পর হইতে কোন যুদ্ধে তিনি অনুপস্থিত ছিলেন না।

তাঁহার আপন বোন উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফছা (রাঃ)-কে একবার রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার ভাই সৎ লোক যদি সে রাত্রে তাহাজ্জুদ পড়ে (তবে ভাল হয়।)

ইহার পর হইতে জীবনে কোনদিন তিনি তাহাজ্জুদ ছাড়েন নাই। না ঘরে, না সফরে।

তিনি ফতোয়াদানের যোগ্যতাসম্পন্ন ফকীহ ছাহাবী ছিলেন। কিন্তু আখিরাতের ভয় এমনই প্রবল ছিল যে, তৃতীয় খলীফা হযরত উছমান (রাঃ)-এর বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন–

আমি শুনিয়াছি যে, বিচারকদের শ্রেণী তিনটি। প্রথম শ্রেণী হইল তাহারা যাহারা অজ্ঞতার সহিত বিচার করে। তাহারা জাহান্নামী। দ্বিতীয় শ্রেণী তাহারা যাহারা খেয়ালখুশি মত বিচার করে। তাহারাও জাহান্নামী। তৃতীয় শ্রেণী তাহারা যাহারা ইজতিহাদের মাধ্যমে হক বিচার করে। তাহারা সমান সমান অবস্থায় থাকিবে। গোনাহও নাই, ছাওয়াবও নাই। সুতরাং আমি আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিয়া বলিতেছি, এই দায়িত্ব হইতে আমাকে মাফ করুন।

তিনি এমন দুনিয়াবিমুখ ছিলেন যে, মুসলমানদের সেই প্রাচুর্যের সময় তাঁহার নিকট বিপুল পরিমাণে সম্পদ আসিত। কিন্তু কিছুই তাঁহার ঘরে স্থির হইতে পারিত না। আইয়ুব বিন ওয়াঈল বাসেবী বর্ণনা করেন, একদিন হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-এর নিকট চারি সহস্র দিরহাম ও একটি মূল্যবান চাদর হাদিয়া আসিল। কিন্তু পরবর্তী দিন তাঁহাকে দেখিলাম, বাজারে বাকীতে ঘোড়ার জন্য চারা খরিদ করিতেছেন। খোঁজ নিয়া জানিলাম যে, ঐ গুলি তিনি সংগে সংগেই হাদিয়া দিয়া দিয়াছেন।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, এমন কি শরীয়তের সহিত সম্পর্কিত নহে এমন ক্ষেত্রেও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ ছিল তাঁহার বৈশিষ্ট্য। একবার তিনি মক্কার পথে সফর করিতেছিলেন। একস্থানে পৌঁছিয়া তিনি তাঁহার উটনীকে দুইবার চক্কর দেওয়াইলেন। অতঃপর সেইখানে অবতরণ করিয়া দুই রাক'আত নফল পড়িলেন। কেহ তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন, এই স্থানে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার উটনী হইতে নামিয়া দুই রাক'আত নফল পড়িয়াছিলেন। আর তাঁহার উটনী বসিবার পুর্বে দুইবার চক্কর দিয়াছিল। তাই আমার ইচ্ছা হইল যে, আমার উটনী যেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটনীর অনুসরণ করে।

জনৈক ব্যক্তি একবার একটি ঔষধপূর্ণ কৌটা তাঁহার খিদমতে হাদিয়া পেশ করিয়া বলিল, ইহা অত্যন্ত দামী ও কার্যকর ঔষধ। আপনার জন্য ইহা ইরাক হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি কাজ করে? সে বলিল, খাদ্য হজমে সাহায্য করে। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) তখন হাসিয়া বলিলেন, খাবার হজম করে? কিন্তু ভাই! আমি তো চল্লিশ বৎসর যাবৎ পেট পুরিয়া কখনো খাই না।

বহুবার তাঁহাকে খিলাফতের পদ গ্রহণের জন্য চাপাচাপি করা হইয়াছে। এমন কি একদল

উগ্রলোক তাঁহাদের প্রস্তাবে রাজী না হইলে হত্যা করিবারও হুমকি দিয়াছিল। কিন্তু তিনি ফিতনার ভয়ে তাহা গ্রহণে রাজী হন নাই।

জীবনে ষাটবার তিনি হজ্জ করিয়াছেন এবং এক হাজার বার ওমরা করিয়াছেন।

তেহাত্তর হিজরীতে ছিয়াশি বৎসর বয়সে মক্কা শরীফে তিনি ইন্তিকাল করিয়াছেন এবং মুহাজিরদের কবরস্থান 'যী-তোয়া'তে সমাধিস্থ হইয়াছেন।

তাঁহার বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা এক হাজার ছয়শত ত্রিশটি। বুখারী ও মুসলিম শরীফে যুগ্মভাবে একশত সত্তরটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে এককভাবে বুখারী শরীফে আশিটি এবং মুসলিম শরীফে একত্রিশটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে।

১১। হযরত আগার বিন ইয়াসার আলমুযানী (রাঃ)

এই ছাহাবী সম্পর্কে নাম ও গোত্র পরিচয়টুকু ছাড়া আর বিশেষ কিছুই জানা যায় না। আল্লাহ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হউন এবং তাঁহাকে সন্তুষ্ট করুন।

১২। হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ)

ইনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ খাদেম রূপে পরিচিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করিবার পর তাঁহার আম্মা হযরত উম্মে সোলায়ম (রাঃ) তাহাকে তাঁহার খিদমতে পেশ করিলেন এবং আপন খাদিম রূপে কবুল করিবার আবেদন করিলেন। তখন হইতে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াফাত পর্যন্ত তিনি তাঁহার খিদমতে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনা শরীফে আগমন করেন তখন আমার বয়স ছিল দশ বৎসর আর তাঁহার ওয়াফাতের সময় আমার বয়স ছিল বিশ। অন্য হাদীছে তিনি বলেন, আমি দশ বৎসর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমত করিয়াছি কিন্তু কখনও তিনি আমাকে এই বলিয়া তিরস্কার করেন নাই যে, অমুক কাজটি কেন কর নাই বা কেন করিয়াছ?

তাঁহার আম্মা উম্মে সোলায়মের ঘরে একবার নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনিলেন। তখন হযরত উম্মে সোলায়ম তাঁহাকে বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার খাদিম আনাস-এর জন্য দু'আ করুন। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, তখন তিনি আমার জন্য এমন দু'আ করিলেন যে, দুনিয়া ও আখিরাতের কোন কল্যাণের বিষয় বাদ দিলেন না। তিনি বলিলেন–

اللهم ارزقه مالا و ولدا و بارك له *

হে আল্লাহ! তাঁহাকে সম্পদ ও সন্তান দান করুন এবং তাঁহাকে বরকত দান করুন।

ফল এই হইল যে, তাঁহার ঔরসজাত সন্তান-সন্ততির সংখ্যা ছিল একশত পঞ্চাশ এবং তাঁহার জমিতে বৎসরে দুইবার ফসল হইত এবং ফলবাগান হইতে মিশকের ঘ্রাণ পাওয়া যাইত। একইদিনে তাঁহার আশিজন সন্তানের মৃত্যু হইয়াছিল। কিন্তু তিনি ধৈর্যের পাহাড়রূপে ছবর করিয়াছিলেন। তেরানব্বই হিজরীতে একশতেরও বেশী বৎসর বয়সে তিনি বছরায় ইন্তিকাল করেন। দুনিয়াতে তিনিই ছিলেন মৃত্যু বরণকারী সর্বশেষ ছাহাবী। তাঁহার পর এই পৃথিবী ছাহাবা কেরামের বরকতপূর্ণ অস্তিত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়া গিয়াছিল।

তাই হযরত মাওরূক আল আজালী (রহঃ) তাঁহার মৃত্যুতে বলিয়াছিলেন, আজ অর্ধেক ইলম চলিয়া গেল। কেননা বিদ'আত পন্থীরা যখনই কোন হাদীছের ব্যাপারে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করিত তখন আমরা তাহাদিগকে বলিতে পারিতাম যে, চল ঐ ব্যক্তির নিকট যিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে নিজ কানে শুনিয়াছেন।

বর্ণিত হাদীছ সংখ্যা ঃ তাঁহার সূত্রে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা সর্বমোট দুই হাজার দুইশত ছিয়াশি। বুখারী ও মুসলিম শরীফে একত্রে একশত আটষট্টিটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে এককভাবে বুখারী শরীফে আটটি এবং মুসলিম শরীফে সত্তরটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে।

১৩। হযরত ছাফওয়ান বিন আসসান (রাঃ)

তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত বারটি গাযওয়ায় শরীক ছিলেন। তাঁহার একটি গৌরব এই যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার সূত্রে একুশটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে।

এক হাদীছে ছাফওয়ান বিন আসসান (রাঃ) বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে আমি হাযির হইলাম। তিনি একটি লাল চাদর গায়ে দিয়া হেলান দেওয়া অবস্থায় মসজিদে বসা ছিলেন। আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ইলম তলব করিতে আসিয়াছি। তিনি বলিলেন, তালিবে ইলমের জন্য মারহাবা! ফিরিশতাগণ তালিবে ইলমের জন্য তাঁহাদের ডানা বিছাইয়া দেন।

১৪। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)

তাঁহার পিতা অহুদের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, অহুদের যুদ্ধে আমার আব্বা শহীদ হইলেন এবং আমাদিগকে নিঃস্ব অবস্থায় রাখিয়া গেলেন। আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু চাহিবার উদ্দেশ্যে আসিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন, যে ব্যক্তি নিজেকে অমুখাপেক্ষী রাখিয়া চলে আল্লাহ পাক তাহাকে অমুখাপেক্ষী (ও সচ্ছল) করিয়া দেন এবং যে পবিত্রতা রক্ষা করিয়া চলে আল্লাহ তাহাকে পবিত্র রাখেন। আমি মনে মনে বলিলাম, তিনি আমাকেই উদ্দেশ্য করিয়াছেন। তখন আমি (প্রয়োজনের কথা না বলিয়াই) ফিরিয়া আসিলাম।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে তাহার প্রথম যুদ্ধ ছিল খায়বার যুদ্ধ। ইহার পর বারটি যুদ্ধে তিনি তাঁহার সংগে শরীক ছিলেন।

ওলামায়ে কেরাম বলিয়াছেন, যুবক ছাহাবাগণের মাঝে তাঁহার ন্যায় ফকীহ আর কেহ ছিলেন না। তাঁহার বহু গুণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণিত আছে।

চৌচল্লিশ হিজরীতে মদীনায় তাঁহার মৃত্যু হয় এবং জান্নাতুল বাকীতে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

বর্ণিত হাদীছ সংখ্যা ঃ তাঁহার সূত্রে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এক হাজার একশত সত্তরটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে একত্রে ছয়চল্লিশটি

হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে এককভাবে বুখারী শরীফে ষোলটি এবং মুসলিম শরীফে বাহান্নটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে।

১৫। হযরত কা'আব বিন মালিক (রাঃ)

তিনি মদীনা শরীফের খাযরাজ গোত্রের আনছারী ছাহাবী ছিলেন, আকাবার বাই'আতে তিনি শরীক ছিলেন এবং বদর ও তাবুক ছাড়া অন্য সকল যুদ্ধে শরীক ছিলেন। অহুদের যুদ্ধে তাঁহার শরীরে এগারটি জখম হইয়াছিল। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিন কবির অন্যতম, যাহারা হাত ও জিহ্বা উভয় শক্তি দ্বারা জিহাদ করিতেন। সেই তিনজন হইলেন, হযরত হাসসান, কা'আব ও ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাঁহার মুহব্বত কি পরিমাণ ছিল তাহা কিছুটা হইলেও আন্দায করা যায় তবুক যুদ্ধের অনুপস্থিতি সম্পর্কে তাঁহার প্রদত্ত বিবরণ হইতে।

পঞ্চাশ হিজরীতে মদীনা শরীফে তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

বর্ণিত হাদীছ সংখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে তাঁহার বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা হইল আশি। বুখারী ও মুসলিম শরীফে একত্রে তিনটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে এককভাবে বুখারী শরীফে একটি এবং মুসলিম শরীফে দুইটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে।

১৬। হযরত ইমরান বিন হোছায়ন (রাঃ)

খায়বার যুদ্ধের বৎসর তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন এবং বিভিন্ন গাযওয়ায় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত শরীক ছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাঁহাকে বছরার লোকদিগকে ফিকাহ ও শরীয়তের আহকাম শিক্ষাদান করিবার জন্য বছরায় পাঠাইয়াছিলেন। মুহম্মদ বিন সীরীন (রহঃ) বলেন, বছরায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছাহাবা কেরামের মাঝে ইমরান বিন হোছায়নের চাইতে শ্রেষ্ঠ কাহাকেও আমরা দেখি নাই। তিনি মকবুল দু'আর অধিকারী ছিলেন। বহু বৎসর তিনি অত্যন্ত ছবর ও ধৈর্যের সহিত কঠিন রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন। এই সময় ফিরিশতাগণ তাহাকে সালাম করিতেন। বাহান্ন হিজরীতে বছরায় তিনি ইন্তিকাল করেন।

বর্ণিত হাদীছ সংখ্যা ঃ তাঁহার সূত্রে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে মোট একশত আশিটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে একত্রে আটটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে এককভাবে বুখারী শরীফে বর্ণিত হইয়াছে চারিটি এবং মুসলিম শরীফে নয়টি।

১৭। হযরত আবু মালিক হারিছ বিন 'আছিম (রাঃ)

তাঁহার নাম সম্পর্কে এগারটি মতামত রহিয়াছে। তন্মধ্যে এইটি হইল বিশুদ্ধতম। খায়বার যুদ্ধের সময় হযরত আবু মুসা আশ'আরী (রাঃ)-এর সংগে ইয়ামানের আশ'আরী গোত্রের যে সকল লোক মদীনায় হিজরত করিয়া আসিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে তিনিও ছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ)-এর যামানায় সিরিয়া অঞ্চলে তিনি প্লেগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যু বরণ করেন। তিনি, হযরত মুআয বিন জাবাল, হযরত আবু ওবায়দা ও হযরত শোরাহবিল ইবনে ওৎবা (রাঃ) একই দিনে প্লেগাক্রান্ত হইয়াছিলেন।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে তিনি সর্বমোট সাতাশটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে মুসলিম শরীফে শুধু দুইটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে।

১৮। হযরত আবু ইয়াহয়া ছোহায়ব বিন সিনান (রাঃ)

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং তাঁহাকে আবু ইয়াহয়া উপাধি দান করিয়াছিলেন। তবে তিনি ছোহায়ব রুমী নামে অধিক পরিচিত ছিলেন। তাঁহাকে রূমী বলিবার কারণ এই যে, রোমকরা শৈশবে তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিল। অতঃপর কালব গোত্রের লোকেরা তাহাদের নিকট হইতে তাঁহাকে খরিদ করিয়া মক্কায় লইয়া আসিয়াছিল। তখন আব্দুল্লাহ বিন জাদ'আন তাহাদের নিকট হইতে তাঁহাকে খরিদ করিয়া আযাদ করিয়া দিয়াছিলেন। তবে আব্দুল্লাহ বিন জাদ'আনের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাহার সংগেই থাকিতেন। কোন কোন মতে বড় হইবার পর তিনি রোম হইতে পলাইয়া মক্কায় আসিয়াছিলেন এবং ইবনে জাদ'আনের আশ্রিত রূপে বাস করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়ত লাভ করিলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়া ধন্য হইলেন। প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন ছিলেন তিনি। ওয়াকিদী বলেন, ছোহায়ব ও আম্মার (রাঃ) একই দিন ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যার দিক হইতে ত্রিশ ও চল্লিশের মাঝেই ছিল তাঁহাদের অবস্থান। তিনি মক্কার সেই সকল লোকবলহীন অসহায় মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাহাদের উপর কোরাইশের যাবতীয় অমানবিক নির্যাতন নামিয়া আসিয়াছিল।

তাঁহার পিতা ছিলেন পারস্য সম্রাটের পক্ষ হইতে উবুল্লাহ শহরের প্রশাসক। ছোহায়বের পরিবার ইসলামের বহু পূর্বে ইরাকে বসতি স্থাপনকারী আরব বংশোদ্ভূত ছিল। এইভাবে সুখ সচ্ছলতার মাঝেই তাঁহার শৈশব কাটিতেছিল। কিন্তু সেই সময় উক্ত পারসিক অঞ্চলে রোমকদের হামলা হয়। তখন অন্যান্যদের সংগে শিশু ছোহায়বও রোমকদের হাতে বন্দী হন।

উভয়ের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ) বলেন, দারুল আরকামের দরওয়াজার সামনে ছোহায়বের সংগে আমার দেখা হইল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ভিতরেই ছিলেন। আমি ছোহায়বকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কি চাহ? তিনি পাল্টা প্রশ্ন করিলেন, তুমি কি চাহ? আমি বলিলাম, মুহম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট গিয়া তাঁহার কথা শুনিতে চাহি। ছোহায়ব বলিলেন, আমিও ইহাই চাহি। অতঃপর আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির হইলাম। তিনি আমাদের সামনে ইসলাম পেশ করিলেন। আর আমরা মুসলমান হইয়া গেলাম। এইভাবে সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করিলাম। অতঃপর সংগোপনে আমরা উভয়ে সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিলাম।

তাঁহার হিজরতের ঘটনা এই যে, তিনি অতি গোপনে মক্কা হইতে বাহির হইলেন। কিন্তু পথে কোরায়শদের একদল ধাওয়াকারী তাঁহাকে প্রায় ধরিয়া ফেলিল। তখন তিনি চিৎকার করিয়া বলিলেন, হে কোরায়শ গোত্র! তোমরা জান যে, আমি তোমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ তিরন্দাজ। আল্লাহর কসম! তোমরা কিছুতেই আমার নিকটে পৌঁছিতে পারিবে না, যতক্ষণ না আমি আমার তুণীরের শেষ তীরটি নিক্ষেপ করি এবং হাতের শক্তি নিঃশেষ হওয়া পর্যন্ত তোমাদের উপর তলোয়ার চালাইতে থাকি। সুতরাং সাহস থাকিলে আগে বাড়।

অবশ্য তোমরা চাহিলে আমাকে ছাড়িয়া দিবার বিনিময়ে তোমাদিগকে আমার গোপন সম্পদের কথা বলিয়া দিব। এই শর্তে তাহারা রাজী হইল। আর তিনিও তাহাদিগকে মক্কায় তাঁহার লুকাইয়া রাখা সম্পদের খোঁজ বলিয়া দিলেন।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করিয়া আসিয়া তখনও কোবায় অবস্থান করিতেছিলেন। এমন সময় হযরত ছোহায়ব (রাঃ) সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উৎফুল্ল কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন−

ربح البيع ابا يحيى! ربح البيع ابا يحيى *

হে আবু ইয়াহয়া! বেচা-কিনা লাভজনক হইয়াছে।

তাঁহারই সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল হইয়াছে।

و من الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رءوف بالعباد *

মানুষের মাঝে এমন লোকও রহিয়াছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে (অর্থের বিনিময়ে) নিজেকে ক্রয় করিয়া লয়। আর আল্লাহ বান্দাদের প্রতি অতি সদয়।

তাঁহার দানশীলতা এমন ছিল যে, হযরত ওমর (রাঃ) একবার তাঁহাকে বলিতে বাধ্য হইলেন যে, মনে হইতেছে, তুমি অপব্যয়ের পর্যায়ে আহার দান করিয়া থাক।

তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি−

خياركم من اطعم الطعام *

তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম সে যে খাবার দান করে।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে বিশেষ মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখিতেন। একবার তিনি ইরশাদ করিলেন−

السباق اربعة، انا سابق العرب و صهيب سابق الروم و سلمان سابق فارس و بلال سابق الحبش *

অগ্রগামী ব্যক্তি চারি জন। আমি আরবদের মাঝে অগ্রগামী ব্যক্তি। ছোহায়ব রোমকদের মাঝে অগ্রগামী ব্যক্তি। সালমান পারসিকদের মাঝে অগ্রগামী ব্যক্তি। আর বেলাল হাবশীদের মাঝে অগ্রগামী ব্যক্তি।

হযরত ওমর (রাঃ)ও তাঁহার সম্পর্কে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। আহত হইবার পর মৃত্যুশয্যা হইতে তিনি অছিয়্যত করিয়াছিলেন যে, আমার জানাযা ছোহায়ব পড়াইবেন এবং ছয় সদস্যের মজলিসে শুরা (খিলাফতের ব্যাপারে) কোন একজনের উপর একমত হইবার পূর্ব পর্যন্ত তিনিই মুসলমানদের জামা'আতের ইমামতি করিবেন।

এই মহান ছাহাবী আটত্রিশ হিজরীতে তেহাত্তর বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করিয়াছেন এবং মদীনায় সমাধিস্থ হইয়াছেন।

তাঁহার সূত্রে বর্ণিত হাদীছ সংখ্যা ত্রিশ। মুসলিম শরীফে তিনটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু বুখারী শরীফে কোন হাদীছ বর্ণিত হয় নাই।

১৯। হযরত উসামা বিন যায়দ (রাঃ)

হযরত যায়দ (রাঃ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পালকপুত্র। তিনি এবং তাঁহার পিতা যায়দ এবং তাহার দাদা হারিছ সকলেই ছাহাবী ছিলেন। তাঁহার সম্পর্কে বলা হইত যে, তিনি রাসূলের প্রিয়তম এবং রাসূলের প্রিয়তমের পুত্র। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, সকল মানুষের মাঝে উসামা আমার প্রিয়তম। আমি আশা করি যে, সে তোমাদের সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হইবে। সুতরাং তাঁহার সহিত তোমরা উত্তম আচরণ করিও।

উসদুল গাবাহ কিতাবে আছে, হযরত ওমর (রাঃ) যখন ভাতা নির্ধারণ করিলেন তখন আপন পুত্র হযরত আব্দুল্লাহর জন্য দুই হাজার আর হযরত উসামার জন্য পাঁচ হাজার দিরহাম নির্ধারণ করিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) এই সম্পর্কে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, দেখ; তাঁহাকে অগ্রাধিকার প্রদানের কারণ এই যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তোমার চাইতে বেশী প্রিয় ছিলেন আর তাঁহার পিতা তোমার পিতার চাইতে প্রিয় ছিলেন।

তাঁহার আরেকটি বৈশিষ্ট্য এই যে, হযরত ওমর (রাঃ) ও অন্যান্য বিশিষ্ট ছাহাবী যে সেনাবাহিনীর সদস্য ছিলেন ঐ বাহিনীর সেনাপতি রূপে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উসামা (রাঃ)কে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মৃত্যুশয্যা হইতেও বারবার তিনি উপদেশ দিতেছিলেন انفذوا جيش اسامة (উসামার বাহিনীকে রওয়ানা করাও।) তাই নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াফাতের পর সর্বপ্রথম ইসলামী বাহিনী হযরত উসামার নেতৃত্বেই রওয়ানা হইয়াছিল।

তাঁহার সূত্রে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে একশত আটাশটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বুখারী ও মুসলিম শরীফে একত্রে পনেরটি আর এককভাবে বুখারী শরীফে দুইটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে।

চুয়ান্ন কিংবা আটান্ন কিংবা ঊনষাট হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করিয়াছেন এবং মদীনায় সমাধিস্থ হইয়াছেন।

২০। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)

তাঁহার কুনিয়াত হইল আবু আবদির রহমান। পাঁচজনের পরেই ষষ্ঠ ব্যক্তি হিসাবে তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা এই যে, বালক বয়সে তিনি কোরায়শী সরদার উকবা বিন মুআইতের বকরী চরাইতেন। একদিন তিনি মক্কার বাহিরে বকরী চরাইতেছিলেন। এমন সময় হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ) ক্লান্ত শ্রান্ত অবস্থায় সেখানে আসিলেন এবং তাঁহাকে সালাম দিয়া বলিলেন, হে বালক! এই পাল হইতে কোন একটি বকরী দোহন করিয়া আমাদিগকে কিছু দুধ দাও। আমরা উহা পান করিয়া পিপাসা নিবারণ করি।

বালক আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিলেন, ইহা আমি করিতে পারি না। কেননা বকরীগুলি আমার নহে। আমি এইগুলির আমানতদার মাত্র।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার কথায় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, আচ্ছা!

আমাকে এমন একটি বকরী দেখাইয়া দাও যাহার দুধ হয় নাই। বালক আব্দুল্লাহ একটি ছোট বকরী দেখাইয়া দিলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিসমিল্লাহ বলিয়া উহার ওলানে হাত দিলেন আর সংগে সংগে আল্লাহর কুদরতে উহাতে দুধ আসিয়া গেল। ঐ দুধ তাহারা নিজেরাও তৃপ্তি ভরিয়া পান করিলেন এবং বালক আব্দুল্লাহকেও পান করাইলেন। এই মু'জিযা দেখিয়া বালক আরয করিলেন আমাকেও এই কালাম শিক্ষা দিন যাহা আপনি বলিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে বলিলেন–

انك غلام معلم *

তুমি তো (আল্লাহর পক্ষ হইতে) ইলমপ্রাপ্ত বালক।

ইসলাম গ্রহণের পর তিনি প্রথমে হাবশায় এবং পরে মদীনায় হিজরত করিয়াছেন এবং বদর ও বাই'আতুর রিযওয়ানসহ সকল যুদ্ধে শরীক ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে এতই স্নেহ করিতেন যে, তাঁহার জন্য অনুমতি ছিল, যখন ইচ্ছা তখনই তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুজরায় প্রবেশ করিতে পারিতেন। ছাহাবা কেরামের মাঝে তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভেদের কথা জানিতেন বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি তাঁহার মিসওয়াক, লাঠি ও জুতা বহন করিতেন।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন–

رضيت لامتى ما رضى لها ابن ام عبد و سخطت لها ما سخط لها ابن ام عبد *

আমার উম্মতের জন্য আমি ঐ জিনিসে সন্তুষ্ট যাহাতে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ সন্তুষ্ট এবং আমার উম্মতের জন্য আমি ঐ জিনিসে অসন্তুষ্ট যাহাতে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ অসন্তুষ্ট।

একরাত্রে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ) এক সংগে বাহির হইলেন। তখন তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ মসজিদে নামায পড়িতেছেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়াইয়া তাঁহার কোরআন তিলাওয়াত শুনিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন–

من سره ان يقرأ القرآن رطبا كما نزل فليقرأه على قراءة ابن ام عبد *

যে ব্যক্তি কোরআনকে তেমন সজীবভাবে পড়িতে চাহে যেমন উহা নাযিল হইয়াছে সে যেন উহা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের ক্বেরাত অনুযায়ী পড়ে।

অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ নামায শেষ করিয়া মুনাজাত করিতে লাগিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিতে লাগিলেন–

سل تعطه ، سل تعطه *

প্রার্থনা কর, দান করা হইবে। প্রার্থনা কর, দান করা হইবে।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, সকালে আব্দুল্লাহকে আমি এই সুসংবাদ দিব যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার মুনাজাতে আমীন বলিয়াছেন।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতের যামানায় তিনি কুফায় বিচারকের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। অতঃপর তিনি মদীনায় ফিরিয়া আসেন এবং ষাটোর্ধ্ব বয়সে ৩২ হিজরীতে সেখানে মৃত্যু বরণ করেন।

বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা ঃ তাঁহার সূত্রে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আটশত আটচল্লিশটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বুখারী ও মুসলিম শরীফে একত্রে চৌষট্টিটি এবং এককভাবে বুখারী শরীফে একুশটি এবং মুসলিম শরীফে পঁয়ত্রিশটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে।

২১। হযরত আবু আব্দুল্লাহ্ খাব্বাব ইবনুল আরাত (রাঃ)

অধিকাংশের মতে তিনি তামীম গোত্রের ছাহাবী। শুরুর দিকে ছয় সাতজনের পরেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আল্লাহর পথে তাঁহার নির্যাতন ভোগের অবস্থা এই ছিল যে, হযরত ওমর (রাঃ) তাঁহার খিলাফতকালে একবার হযরত খাব্বাবকে মুশরিকদের হাতে তাঁহার নির্যাতন ভোগের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, ইয়া আমীরাল মুমিনীন! মুখে কি আর বলিব। আমার পিঠের অবস্থা দেখুন। হযরত ওমর (রাঃ) তাঁহার পিঠ দেখিয়া শিহরিত হইয়া বলিলেন, কোন মানুষের এমন পিঠ আমি আর দেখি নাই। অতঃপর হযরত খাব্বাব (রাঃ) বলিলেন, জ্বলন্ত অংগারের উপর আমাকে শোয়াইয়া দেওয়া হইত। আর আমার পিঠের চর্বি গলিয়া গলিয়া সেই আগুন নিভিত।

বদরসহ সকল যুদ্ধেই তিনি অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। হযরত কায়স বিন আবু হাযিম (রাঃ) বলিলেন, আমরা হযরত খাব্বাবকে দেখিতে গেলাম। (চিকিৎসা হিসাবে) তাঁহাকে সাতটি দাগ দেওয়া হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি আমাদিগকে মৃত্যু কামনা করিতে নিষেধ না করিতেন তবে অবশ্যই আমি মৃত্যু কামনা করিতাম।

তিনি কুফায় বসবাস অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং সেখানেই মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন। তিনিই কুফায় মৃত্যু বরণকারী প্রথম ছাহাবী। সাইত্রিশ হিজরী হইল তাঁহার মৃত্যুকাল। তাঁহার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছিলেন–

আল্লাহ খাব্বাবকে রহম করুন। স্বেচ্ছায় তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। স্বেচ্ছায় হিজরত করিয়াছেন এবং মুজাহিদ অবস্থায় জীবন ধারণ করিয়াছেন এবং শারীরিকভাবে বহু কষ্ট ভোগ করিয়াছেন। আর আল্লাহ ইখলাছের সহিত আমলকারীর প্রতিদান নষ্ট করেন না।

মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল তেহাত্তর বৎসর।

তাঁহার সূত্রে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বত্রিশটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বুখারী ও মুসলিম শরীফে একত্রে তিনটি এবং এককভাবে বুখারী শরীফে দুইটি ও মুসলিম শরীফে একটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে।

২২। হযরত সোলায়মান বিন ছোরাদ (রাঃ)

ইনি খোজা'আ গোত্রের ছাহাবী। জাহেলী যুগে তাঁহার নাম ছিল ইয়াসার। রাসূলুল্লাহ

ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা পরিবর্তন করিয়া তাহার নাম সোলায়মান রাখিয়াছিলেন। তিনি বহু গুণের অধিকারী এবং নেক আমলের প্রতি অনুরাগী মানুষ ছিলেন। স্ব-গোত্রে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। কুফা শহরের পত্তনের সময় হইতেই তিনি কুফায় বাস করিতেন। সকল যুদ্ধে তিনি হযরত আলী (রাঃ)-এর পক্ষে লড়াই করিয়াছেন। তেরানব্বই বৎসর বয়সে এক যুদ্ধে তিনি নিহত হন।

তাঁহার সূত্রে পনেরটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বুখারী ও মুসলিম শরীফে একত্রে আলোচ্য হাদীছটি শুধু বর্ণিত হইয়াছে। আর এককভাবে বুখারী শরীফে একটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে।

২৩। হযরত মুআয বিন আনাস (রাঃ)

তিনি জাহানিয়া গোত্রের ছাহাবী। পরবর্তী যুগে তিনি মিশরে বাস করিয়াছেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ ও অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ তাঁহার সূত্রে প্রায় ত্রিশটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার সম্পর্কে ইহার অধিক বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। আল্লাহ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হউন।

২৪। আবু ইয়াহয়া উসায়দ বিন হোযায়র (রাঃ)

তিনি আওস গোত্রের আনসারী ছাহাবী। হিজরতের পূর্বে প্রথম আকাবার বাই'আতের পরে তিনি হযরত মুছ'আব বিন ওমায়র (রাঃ)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) তাঁহাকে খুব সম্মান করিতেন। দ্বিতীয় 'আকাবার বাই'আতে তিনি শরীক ছিলেন এবং বনু আবদুল আশহাল গোষ্ঠীর মুখপাত্র রূপে ভূমিকা পালন করিয়াছেন। তাঁহার বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ সম্পর্কে মতানৈক্য রহিয়াছে। তবে অহুদ ও পরবর্তী সকল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার ও যায়দ বিন হারিছার মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন। সুকণ্ঠে কোরআন তিলাওয়াতকারী ছাহাবা কেরামের মাঝে তিনি অন্যতম ছিলেন। অত্যন্ত বিচক্ষণ ও সুচিন্তার অধিকারী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন–

نعم الرجل اسيد بن حضير *

উসায়দ বিন হোযায়র উত্তম ব্যক্তি।

তাঁহার বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা মোট আঠারটি। বুখারী ও মুসলিম শরীফে একত্রে এই একটি মাত্র হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। আর এককভাবে শুধু বুখারী শরীফে অন্য একটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে।

বিশ হিজরীর শাবান মাসে তিনি ইন্তিকাল করিয়াছেন। ওমর (রাঃ) জান্নাতুল বাকী পর্যন্ত তাঁহার জানাযা বহন করিয়াছিলেন এবং নামায পড়াইয়াছিলেন।

২৫। হযরত আবু ইবরাহীম আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ)

হযরত আব্দুল্লাহ এবং তাঁহার পিতা আবু আওফা উভয়ে ছাহাবী ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ বাই'আতুর রিযওয়ানে শরীক ছিলেন এবং খায়বার ও পরবর্তী যুদ্ধগুলিতে শরীক ছিলেন এবং

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াফাত পর্যন্ত মদীনা শরীফে অবস্থান করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি কুফায় চলিয়া যান।

তাঁহার সুত্রে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে পঁচানব্বইটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বুখারী ও মুসলিম শরীফে একত্রে দশটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে এককভাবে বুখারী শরীফে পাঁচটি এবং মুসলিম শরীফে একটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে।

শেষ জীবনে তাঁহার দৃষ্টিশক্তি লোপ পাইয়াছিল। তিনি সাতাশি হিজরীতে কুফায় ইন্তিকাল করিয়াছেন।

২৬। হযরত আবু মুহম্মদ হাসান বিন আলী (রাঃ)

হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর পুত্র এবং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় দৌহিত্র। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং তাঁহার নাম হাসান এবং উপনাম আবু মুহম্মদ রাখিয়াছেন।

বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ পাক হাসান হোসায়ন নাম দুইটি আড়াল করিয়া রাখিয়াছিলেন। অবশেষে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার প্রিয় দৌহিত্রদ্বয়ের নাম হাসান ও হোসায়ন রাখিলেন। ইতিপূর্বে কাহারও এই নাম ছিল না।

ইহার চাইতে সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে যে, তাঁহার আম্মা ফাতেমাতুযযাহরা (রাঃ) হইলেন জান্নাতী নারীদের সরদার আর তিনি ও তাঁহার ভাই হযরত হোসায়ন (রাঃ) হইলেন জান্নাতী যুবকদের সরদার। একবার নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হাসান (রাঃ)-কে কাঁধে করিয়া চলিতেছিলেন। জনৈক ছাহাবী ইহা দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, হে বালক! বড় উত্তম সাওয়ারীতে আরোহন করিয়াছ। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আর সওয়ারও কতই না উত্তম।

বুখারী শরীফের ছহী হাদীছে আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার মিম্বরে বয়ান করিতেছিলেন। এমন সময় হযরত হাসান (রাঃ) সেখানে উপস্থিত হইলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন–

ان ابنى هذا سيد و لعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين *

আমার এই পুত্র সাইয়েদ ও নেতৃসুলভ গুণের অধিকারী। সম্ভবতঃ আল্লাহ্ পাক তাঁহার মাধ্যমে মুসলমানদের দুই বিরাট দলের মাঝে সন্ধি ও সমঝোতা সৃষ্টি করিবেন।

পরবর্তীতে তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হইল। তাঁহার পিতা হযরত আলী (রাঃ)-এর শাহাদাতের পর যখন তিনি খলীফা নির্বাচিত হইলেন, তখন প্রায় চল্লিশ হাজার যোদ্ধা তাঁহার হাতে মৃত্যুর শপথ গ্রহণ করিল। এই মৃত্যু-পিপাসু বিরাট বাহিনী লইয়া তিনি হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে লড়াই করিতে বাহির হইলেন। অন্যদিকে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)ও বিরাট বাহিনী লইয়া বাহির হইলেন। এমতাবস্থায় হযরত হাসান (রাঃ) দেখিলেন যে, উভয় পক্ষে বিপুল রক্তক্ষয় ছাড়া কেহ বিজয়ী হইতে পারিবে না। তখন তিনি প্রিয় নানার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে মুসলমানদের জান-মালের হিফাযতের

উদ্দেশ্যে খিলাফতের দাবী ত্যাগ করিলেন। এইভাবে তাঁহার আত্মত্যাগ ও কোরবানীর ওছিলায় মুসলিম উম্মাহ অব্যাহত রক্তক্ষয় হইতে বাঁচিয়া গেল। হে আল্লাহ! আপন রহমতের ওছিলায় আমাদিগকে জান্নাতে জান্নাতী যুবকদের সরদার হযরত হাসান হোসায়ন (রাঃ)–এর সান্নিধ্য প্রথম হইতে নছীব করিও। আমীন।

২৭। হযরত আবু সুফয়ান ছাখর বিন হরব (রাঃ)

আবরাহার হস্তিবাহিনীর ঘটনা যেই বৎসর ঘটিয়াছিল তাহার দশ বৎসর পূর্বে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মক্কা বিজয়ের রাত্রে তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি কোরায়শ গোত্রের নেতা হিসাবে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছেন। পরবর্তীতে ইসলামী বাহিনীর সদস্য রূপে হোনায়ন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। তায়েফ যুদ্ধে তাহার একটি চক্ষু আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হইয়াছিল। আর অপর চক্ষু শহীদ হইয়াছিল ইয়ারমুকের যুদ্ধে। হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার বেশ মনোর ন করিতেন। হোনায়ন যুদ্ধে তাঁহাকে একশত উট ও চল্লিশ উকিয়া স্বর্ণ দান করিয়াছিলেন। ইহাতে অবিভূত হইয়া হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিয়া উঠিলেন, “আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হউক। আল্লাহর কসম! আপনি অতি মহৎপ্রাণ। যখন আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছি তখন আপনি আদর্শ যোদ্ধা ছিলেন আর যখন আপনার সহিত সমঝোতা করিলাম তখন আপনি আদর্শ সমঝোতাকারী হইলেন। সুতরাং আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।”

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে নাজরানের শাসক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার ওয়াফাতের সময় তিনি সেখানেই ছিলেন।

একত্রিশ হিজরীতে আটাশি বৎসর বয়সে তিনি মদীনায় ইন্তিকাল করিয়াছেন।

২৮। হযরত সাহল বিন হোনায়ফ (রাঃ)

তাঁহার কুনিয়াত বা উপনাম সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ আবু ছাবিত, কেহ আবু সাঈদ আর কেহ আবুল ওয়ালিদ বলিয়াছেন। বদরসহ সকল যুদ্ধে তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে শরীক ছিলেন। অহুদ যুদ্ধে যখন মুসলমানগণ পরাজিত অবস্থায় ছত্রভংগ হইয়া গিয়াছিল তখনও তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের সংগে অবিচল ছিলেন। ঐ দিন তিনি তাঁহার হাতে মৃত্যুর শপথ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পরবর্তীতে তিনি হযরত আলী (রাঃ)-এর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। হযরত আলী (রাঃ) মদীনা হইতে বছরা গমনের সময় তাঁহাকে মদীনায় তাঁহার স্থলবর্তী করিয়া গিয়াছিলেন। ছিফফীন যুদ্ধে তিনি হযরত আলী (রাঃ)-এর সহিত শরীক ছিলেন।

হযরত সহল (রাঃ) কুফায় আটত্রিশ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। হযরত আলী (রাঃ) ছয় তাকবীর দ্বারা তাঁহার জানাযা পড়াইয়াছেন এবং কারণ হিসাবে বলিয়াছেন যে, ইনি বদরী ছাহাবী। (সুতরাং অধিক মর্যাদা লাভের অধিকারী।)

২৯। হযরত আবু খালিদ হাকীম বিন হিযাম (রাঃ)

ইতিহাসে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি কাবা শরীফের অভ্যন্তরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

ঘটনা এই যে, কোন এক উৎসব উপলক্ষে কাবা শরীফ সকলের জন্য উন্মুক্ত করা হইয়াছিল। তখন হযরত হাকীমের আম্মা তাহার সখীদের সহিত কাবা শরীফের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু হঠাৎ সেখানেই তাহার প্রসব বেদনা শুরু হইয়া গেল। এমন কি তাহাকে আর বাহির করিয়া আনা সম্ভব হইল না। তখন সেখানে চামড়ার চাদর বিছাইয়া প্রসবের ব্যবস্থা করা হইল। এইভাবে তিনি একমাত্র মানবসন্তান হিসাবে কাবাঘরে জন্ম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করিলেন।

তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন।

কোরায়শ গোত্রে তিনি অতি সম্মানের অধিকারী ছিলেন। হাজীগণকে আহারদান এবং প্রয়োজনে সাহায্য সহযোগিতাদান ছিল তাঁহার দায়িত্ব।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারিজন লোক সম্পর্কে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের মুশরিক থাকা আমার নিকট কষ্টকর। বরং আমি তাঁহাদের ইসলাম গ্রহণের আকাঙক্ষী। তাঁহারা হইলেন আত্তাব বিন ওসায়দ, জোবায়র বিন মুতইম, হাকীম বিন হিযাম ও সাহল বিল আমর। আল্লাহ পাকের কি শান! পরবর্তীতে তাঁহারা চারিজনই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইসলাম গ্রহণের পর একদিন তিনি কাঁদিতেছিলেন। তাঁহার পুত্র কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, প্রিয় পুত্র! এত বিলম্বে ইসলাম গ্রহণের কারণে কাঁদিতেছি। কেননা সৌভাগ্য লাভের বহু সুযোগ আমার হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে।

তিনি অতি দানশীল ছিলেন। একশত বিশ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। তাঁহার অর্ধেক জীবন কাটিয়াছে জাহেলী যুগে এবং বাকী অর্ধেক জীবন কাটিয়াছে ইসলামী যুগে।

চুয়ান্ন কিংবা আটান্ন হিজরীতে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর আমলে তিনি ইন্তিকাল করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণিত হাদীছ সংখ্যা চল্লিশ। বুখারী ও মুসলিম শরীফে একত্রে চারিটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে।

৩০। হযরত আবু ইয়ালা শাদ্দাদ বিন আউস (রাঃ)

ইনি হযরত হাসসান বিন ছাবিত (রাঃ)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। আটান্ন হিজরীতে পঁচাত্তর বৎসর বয়সে তিনি ফিলিস্তিনে ইন্তিকাল করেন। বাইতুল মুকাদ্দাসে বাবুর-রহমতের পাশে তাঁহার কবর বহুযুগ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।

তাঁহার বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা পঞ্চাশটি। বুখারী শরীফে একটি এবং মুসলিম শরীফে অন্য একটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে।

৩১। হযরত আবু তারীক আদি বিন হাতিম (রাঃ)

বিখ্যাত দানবীর হাতিম তাঈয়ের পুত্র। পিতার সূত্রে তিনি গোত্রের নেতা ছিলেন এবং এলাকার শাসক রূপে এক চতুর্থাংশ রাজস্ব লাভ করিতেন। তিনি খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী ছিলেন। ইসলামী বাহিনীর আগমনের খবর শুনিয়া তিনি সিরিয়ার দিকে পলাইয়া গেলেন। কিন্তু তাহার এক বোন সাফফানা বিনতে হাতিম মুসলমানদের হাতে বন্দিনী হন। তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু

উপাধি হইল সিদ্দীক (বা অধিক বিশ্বাসকারী।) কোন প্রকার দ্বিধা ছাড়াই যেতেতু তিনি নবুয়তের দাওয়াত বিশ্বাস করিয়াছিলেন সেহেতু তাঁহাকে এই উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছে। অন্য বর্ণনা মতে মেরাজের ঘটনা শুনিবামাত্রই বিশ্বাস করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার এই উপাধি। তাঁহার আম্মা-আব্বা পুত্র-কন্যা ও দৌহিত্র মুসলমান ও ছাহাবী ছিলেন। এই সৌভাগ্য আর কোন ছাহাবীর হয় নাই।

মক্কায় হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর বিরাট প্রভাব ও মর্যাদা থাকা সত্ত্বেও তাঁহাকে কঠিন নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছে। একবার মুশরিকরা তাঁহাকে প্রহার করিয়া অজ্ঞান অবস্থায় ফেলিয়া গিয়াছিল। যখন তাঁহার হুঁশ হইল তখন তাঁহার মা তাঁহার মুখে কিছু দিতে চাহিলেন। কিন্তু তিনি বলিলেন, আমার প্রিয় রাসূল কেমন আছেন ইহা না জানা পর্যন্ত আমি কিছুই মুখে দিব না।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের সংগী হিসাবে আল্লাহ্ হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে নির্বাচন করিয়াছিলেন এবং কোরআন শরীফে তাঁহার আলোচনা করিয়াছেন। তবুকের যুদ্ধের সময় তিনি তাঁহার যাবতীয় সম্পদ রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির করিয়াছিলেন। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবু বকর! ঘরে কি রাখিয়া আসিয়াছ? তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকে রাখিয়া আসিয়াছি।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াফাতের পর ধর্মত্যাগের ফিতনা যখন শুরু হইল তখন তিনি পাহাড়ের মত অটল থাকিয়া উহার মুকাবেলা করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ মন্তব্য ছিল এই–

اینقص الدین و انا حی *

আমি জিন্দা থাকিতে দ্বীনের কোন ক্ষতি হইবে!

আল্লাহর ভয় এবং কিয়ামতের হিসাব কিতাবের চিন্তায় তিনি এমনই অস্থির ছিলেন যে, প্রায় বলিতেন,

হায় আমি যদি গাছের পাতা হইতাম কিংবা ঘাস হইতাম তবে বকরী আমাকে খাইয়া ফেলিত। হায় যদি আমি কাষ্ঠ হইতাম তবে চুলায় জ্বালাইয়া ফেলা হইত।

অথচ দুনিয়াতেই তিনি জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

খলিফা হইবার পর একদিন তিনি কাপড় লইয়া বাজারে যাইতেছিলেন। পথে হযরত ওমর (রাঃ) তাঁহাকে বলিলেন, আপনি ব্যবসায়ে লিপ্ত হইলে খিলাফতের কাজ কিভাবে চলিবে? হযতর আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, কিন্তু বাজারে গিয়া ব্যবসা না করিলে আবু বকরের সংসার চলিবে কি করিয়া? এই কথা শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ) বিশিষ্ট ছাহাবা কেরামের সহিত পরামর্শক্রমে খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর জন্য সামান্য পরিমাণ ভাতা নির্ধারণ করিয়া দিলেন।

একবার হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর স্ত্রীর সাধ হইল পরিবারের সকলকে হালুয়া তৈয়ার করিয়া খাওয়াইবেন। তাই প্রতিদিনের সংসার ব্যয় হইতে সামান্য পরিমাণ করিয়া বাঁচাইয়া হালুয়া তৈয়ার করিলেন। আর হযরত আবু বকর (রাঃ) পুরা বিষয় জানিতে পারিয়া বাইতুল

আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে নিজের পরিচয় দিলেন। আর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাতা হাতিমের প্রতি সৌজন্যবশতঃ তাঁহাকে মুক্তিদান করিলেন। হযরত সাফফানা (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করিয়া ভাইয়ের নিকট ফিরিয়া গেলেন এবং তাঁহাকে দরবারে নববীতে আত্মসমর্পণ করিতে উদ্বুদ্ধ করিলেন। তখন আদী বিন হাতিম মদীনা আগমন করিয়া মুসলমান হইলেন। ইহা নবম হিজরীর শাবান মাসের ঘটনা।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিতেন। প্রথমবার সাক্ষাতের সময় তিনি নিজে মাটিতে বসিয়া তাঁহাকে চামড়ার তাকিয়ায় বসাইয়াছিলেন।

তাঁহার মহানুভবতার অবস্থা এই ছিল যে, পিঁপড়াকে তিনি রুটি গুঁড়া করিয়া দিতেন আর বলিতেন, ইহারা আমার প্রতিবেশী। ইহাদের হক রহিয়াছে।

ছিফফীন যুদ্ধে তিনি হযরত আলী (রাঃ)-এর পক্ষে লড়াই করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াফাতের পর যখন চারিদিকে ধর্মত্যাগের ঝড় শুরু হইল তখনও তিনি এবং তাঁহার পুরা কাওম ইসলামের উপর অবিচল ছিলেন।

উনসত্তর হিজরীতে একশত বিশ বৎসর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করিয়াছেন।

তাঁহার বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা ছিষট্টি। তন্মধ্যে বুখারী ও মুসলিম শরীফে একত্রে তিনটি এবং এককভাবে মুসলিম শরীফে দুইটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে।

৩২। হযরত আবু উমামা ছোদায় বিন আজলান আল বাহেলী (রাঃ)

তিনি প্রসিদ্ধ ছাহাবী ছিলেন। মিশরে বসবাস করিতেন। পরে হিমছ শহরে আসেন এবং সেখানেই একাশি হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন। সিরিয়া অঞ্চলে মৃত্যু বরণকারী সর্বশেষ ছাহাবী ছিলেন তিনি।

তাঁহার বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা দুইশত পঞ্চাশ। বুখারী শরীফে এককভাবে পাঁচটি এবং মুসলিম শরীফে তিনটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে।

৩৩। হযরত আবু উমারাহ্ বারা বিন আযিব (রাঃ)

ইনি আওস গোত্রের আনছারী ছাহাবী। তাঁহার পিতা 'আযিবও ছাহাবী ছিলেন। বদর যুদ্ধে তিনি অল্প বয়স্ক বিবেচিত হইবার কারণে শরীক হইতে পারেন নাই। অহুদের যুদ্ধই হইল তাঁহার প্রথম যুদ্ধ। বাই'আতে রিযওয়ানেও তিনি শরীক ছিলেন যাঁহাদের সম্পর্কে আল-কোরআনে সাধারণ সন্তুষ্টির ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে। কুফায় হযরত মুছ'আব বিন যোবায়র (রাঃ)-এর আমলে তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

তাঁহার সূত্রে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে তিনশত পাঁচটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বুখারী ও মুসলিম শরীফে সম্মিলিতভাবে বাইশটি হাদীছ এবং এককভাবে বুখারী শরীফে পনেরটি ও মুসলিম শরীফে ছয়টি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে।

৩৪। হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ)

উম্মতের শ্রেষ্ঠ মানব। তাঁহার নাম আব্দুল্লাহ বিন উছমান। উপনাম আবু বকর। আর

মালে এই মর্মে খবর পাঠাইলেন যে, আবু বকরের প্রতিদিনের বরাদ্দ হইতে এই পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া হউক। কেননা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই পরিমাণ কম হইলেও আবু বকরের পরিবারের চলিয়া যায়।

ইহা সত্ত্বেও মৃত্যুর সময় তিনি অছিয়ত করিয়া গিয়াছিলেন যেন তাঁহার বাগান বিক্রি করিয়া ভাতা বাবদ বাইতুল মাল হইতে গ্রহণকৃত সমুদয় অর্থ ফেরত দেওয়া হয়।

খলীফা অবস্থায়ও তিনি মদীনার এতীম ও বিধবাদের সেবা করিতেন। তাঁহাদের বাজার করিয়া দিতেন এবং দুধ দোহন করিয়া দিতেন। মোটকথা, উম্মতের দ্বীন ও দুনিয়া সকল বিষয়েই তিনি উম্মতের প্রতি অতি দরদী ছিলেন। তাই তাঁহার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

ارحم امتی لامتی ابو بکر *

আমার উম্মতের মাঝে আমার উম্মতের প্রতি সর্বাধিক দয়ালু হইলেন আবু বকর।

তাঁহার ফযীলত ও গৌরব বর্ণনা করিয়া শেষ করা সম্ভব নহে। তবে এতটুকু বর্ণনা করাই যথেষ্ট হইবে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

ان امن الناس علی فی صحبته و ماله ابو بکر و لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر، و لکن اخوة الاسلام *

আপন সংগ দ্বারা এবং আপন সম্পদ দ্বারা আমার প্রতি মানুষের মাঝে সর্বাধিক অনুগ্রহকারী ব্যক্তি হইলেন আবু বকর। যদি আমি আমার প্রতিপালক ছাড়া অন্য কাহাকেও বন্ধু রূপে গ্রহণ করিতাম তবে আবু বকরকেই করিতাম। কিন্তু ইসলামের ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ছাড়া অন্য কিছু নাই।

তের হিজরীর জুমাদাল উলা মাসের বাইশ তারিখে মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে তেষট্টি বৎসর বয়সে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। যে চৌকিতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমাইতেন সেই চৌকিতেই তাঁহাকে বহন করা হইয়াছিল। হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) তাঁহার জানাযা পড়াইয়াছেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের পাশে তাঁহাকে দাফন করা হইয়াছে।

হে আল্লাহ! আমাদের অন্তরেও ছিদ্দীকী ঈমানের একটুখানি নূর দান করুন। আমীন।

৩৫। উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রাঃ)

তাঁহার আসল নাম হিন্দ বিনতে আবু উমাইয়া। তিনি এবং তাঁহার স্বামী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল আসাদ প্রথম নয় দশজনের পরেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কোরায়শদের নির্যাতনের মুখে হাবশায় হিজরত করিয়াছিলেন। পরে আবার মক্কায় ফিরিয়া আসিয়া মদীনায় হিজরত করিয়াছিলেন। তাঁহার হিজরতের কাহিনী বড়ই করুণ। তিনি নিজে বর্ণনা করেন–

আবু সালামা আমাকে এবং আমার পুত্র সালামাকে একটি উটনীর পিঠে বসাইয়া নিজে উট চালাইয়া মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন। কিন্তু কিছু দূর যাইবার পর আমার গোত্রের

লোকেরা আমাকে এবং আমার পুত্রকে আবু সালামার নিকট হইতে এই বলিয়া ছিনাইয়া লইল যে, তুমি যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার কিন্তু আমাদের মেয়েকে লইয়া দেশে দেশে ঘুরিবে তাহা হইবে না। আমার স্বামীর গোত্রের লোকেরা ইহা দেখিয়া ভীষণ ক্রুদ্ধ হইল এবং বলিল, তোমরা তোমাদের মেয়ে লইয়া যাইতে পার কিন্তু ছেলে তো আমাদের। সুতরাং আমাদের ছেলেকে তোমাদের নিকট রাখিব না। এই বলিয়া তাহারা আমার পুত্রকে টানাটানি শুরু করিল, এমনকি তাহার হাত ভাংগিয়া গেল। এইভাবে মুহূর্তে আমি নিঃসংগ ও নিঃসহায় হইয়া পড়িলাম। আমার স্বামী মদীনায়। পুত্র সালামাকে বিধ্বস্ত অবস্থায় আমার নিকট হইতে বনু আবদুল আসাদ গোত্র ছিনাইয়া লইয়া গেল। আর আমাকে আমার গোত্র বনু মাখযুম আটক করিয়া রাখিল। সেই দিন হইতে প্রতিদিন আমি ঐ স্থানে আসিয়া রাত্র পর্যন্ত কাঁদিতে থাকিতাম।

এইভাবে এক বৎসর চলিয়া গেল। তখন সকলের অন্তর নরম হইল এবং তাহারা আমাকে আমার পুত্রসহ মদীনায় হিজরত করিবার অনুমতি দিল।

অহুদ যুদ্ধের পর তাঁহার স্বামীর ইন্তিকাল হইলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিলেন।

একষট্টি হিজরীতে নব্বই বৎসর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করিয়াছেন। জান্নাতুল বাকীতে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হইয়াছে। তিনিই হইলেন সর্বশেষ মৃত্যু বরণকারিণী উম্মুল মু'মিনীন। তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে তিনশত আটাত্তরটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে বুখারী ও মুসলিম শরীফে একত্রে তেরটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে এককভাবে বুখারী শরীফে তিনটি এবং মুসলিম শরীফে তেরটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে।

৩৬। হযরত আবু আমর সুফয়ান বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ)

তিনি তায়েফের অধিবাসী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াফাতের পরে তিনি হযরত ওমর (রাঃ)-এর পক্ষ হইতে নিযুক্ত প্রশাসকরূপে তায়েফে অবস্থান করিয়াছেন। পরবর্তীতে হযরত ওমর (রাঃ) তাঁহাকে বাহরাইনে প্রেরণ করেন। তাঁহার এই একটি মাত্র হাদীছ মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে।

৩৭। হযরত আবু সিরওয়া'আ উকবা ইবনুল হারিছ (রাঃ)

অনেকের মতে হযরত ওকবা হইলেন আবু সিরওয়া'আ (রাঃ)-এর ভাই। তাঁহারা উভয়ে মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার সূত্রে বুখারী শরীফে তিনটি হাদীছ বর্ণনা করা হইয়াছে।

৩৮। হযরত আবু আব্দুল্লাহ হোযায়ফাতুবনুল ইয়ামান (রাঃ)

হযরত হোযায়ফা ও তাঁহার পিতা হযরত ইয়ামান উভয়ে একসংগে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। উভয়ে অহুদ যুদ্ধে শরীক হইয়াছিলেন। অহুদ যুদ্ধে হযরত ইয়ামান (রাঃ) ভুলক্রমে মুসলমানদের হাতেই শহীদ হইয়াছিলেন। হযরত হোযায়ফা (রাঃ) বার বার চিৎকার করিয়া বলিতেছিলেন, হে আল্লাহর বান্দাগণ! আমার বাবা! আমার বাবা! কিন্তু যুদ্ধের ভীষণ

শোরগোলে তাঁহার চিৎকার তলাইয়া গিয়াছিল। পরে নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়া মুসলমানদের অনুতাপের শেষ ছিল না। কিন্তু হযরত হোযায়ফা তাঁহার রক্তের দাবী মুসলমানদের জন্য দান করিয়া বলিলেন, আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করুন।

তিনি বিশিষ্ট ফকীহ ও ফতোয়া প্রদানের যোগ্য ছাহাবী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বহু ভেদ তাঁহার নিকট আমানত ছিল। মুনাফিকদের তালিকা ও পরিচয় এবং ভবিষ্যতের বিভিন্ন ফিতনা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে জানাইয়া গিয়াছিলেন। বিভিন্ন যুদ্ধে তিনি বহু কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। খন্দক যুদ্ধের সময় প্রচণ্ড ঝড় ও শীতের রাত্রে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে শত্রু শিবিরে গিয়া খবরাখবর আনিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত দক্ষতা, বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতার সহিত উক্ত দায়িত্ব পালন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন নামায পড়িতেছিলেন। তিনি তাঁহার কদম মোবারকের পাশে জড়োসড়ো হইয়া শুইয়া পড়িলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে চাদরের একাংশ দ্বারা ঢাকিয়া দিয়াছিলেন।

পরবর্তীতে বিভিন্ন দেশজয়ে তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। হামাদান ও দিনাওর তাঁহার হাতে বিজিত হইয়াছিল। হযরত ওমর (রাঃ) তাঁহাকে মাদায়েন শহরের শাসক নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

ছয়ত্রিশ হিজরীতে মদীনা শরীফে তাঁহার ইন্তিকাল হয়। একশতের কিছু বেশী হাদীছ তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে বুখারী ও মুসলিম শরীফে একত্রে বারটি হাদীছ এবং এককভাবে বুখারী শরীফে আটটি এবং মুসলিম শরীফে সতেরটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে।

৩৯। হযরত আবু ফিরাস রাবী'আ বিন কা'আব আসলামী (রাঃ)

ইনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশিষ্ট খাদিম ছিলেন এবং সর্বক্ষণ মসজিদেই পড়িয়া থাকিতেন। নিজের সম্পর্কে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরজায় রাত্রি যাপন করিতাম এবং তাঁহার অযুর পানি আগাইয়া দিতাম। তখন রাত্রির এক প্রহর তাঁহাকে سمع الله لمن حمد বলিতে শুনিতাম এবং পরবর্তী প্রহর الحمد لله رب العلمين বলিতে শুনিতাম।

তেষট্টি হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

তাঁহার বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা চারিটি। মুসলিম শরীফে শুধু একটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে।

৪০। হযরত ছাওবান (রাঃ)

ইনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। আযাদী লাভ করা সত্ত্বেও তিনি খিদমতে নববীতেই পড়িয়া ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াফাতের পর তিনি হিমছ শহরে চলিয়া যান এবং সেখানেই চুয়ান্ন হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন।

তিনি সর্বমোট আটাশটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। বুখারী শরীফে তাঁহার কোন হাদীছ নাই। মুসলিম শরীফে দশটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে।

৪১। হযরত আবু ছাফওয়ান আব্দুল্লাহ্ বিন বুসর আসলামী (রাঃ)

হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় ইনি অল্প বয়স্ক ছাহাবী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার মাথায় হাত রাখিয়া দু'আ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, এই বাচ্চা এক শতাব্দী আয়ু লাভ করিবে। পরে সত্য সত্যই তিনি একশত বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। তাঁহার পিতাও ছাহাবী ছিলেন। ছিয়ানব্বই হিজরীতে একশত বৎসর বয়সে হিমছ শহরে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। তাঁহার বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা পঞ্চাশ। বুখারী শরীফে একটি এবং মুসলিম শরীফে একটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে।

৪২। হযরত আবু মাসউদ উকবা বিন আমর আনছারী (রাঃ)

ইনি আকাবার দ্বিতীয় বাই'আতে এবং বদর যুদ্ধে শরীক ছিলেন। হযরত আলী (রাঃ)-এর পরে তিনি মৃত্যু বরণ করিয়াছেন। তাঁহার সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে একশত দুইটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বুখারী ও মুসলিম শরীফে একত্রে সাতটি এবং এককভাবে বুখারী শরীফে একটি এবং মুসলিম শরীফে নয়টি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে।

৪৩। হযরত আবু যর জুনদাব বিন জুনাদাহ্ (রাঃ)

গিফার গোত্রের সুপ্রসিদ্ধ ছাহাবী। বর্ণিত আছে যে, তিনি চতুর্থ কিংবা পঞ্চম ব্যক্তি রূপে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। তবে বিশুদ্ধ মত এই যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার শুরু করিবার পরেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন।

তাঁহার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা এই যে, 'মক্কায় আরবের নবী আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন' এই খবর পাইবার পর তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করিলেন। হারাম শরীফে একজন পরদেশী মুসাফির রূপে আলী (রাঃ)-এর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি পরপর তিনদিন তাঁহার মেহমানদারি করিলেন। অতঃপর তাঁহার উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া অতি গোপনে তাঁহাকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির করিলেন। হযরত আবু যর (রাঃ) আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ বলিয়া তাঁহাকে সালাম করিলেন। ইসলামের ইতিহাসে তিনিই সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এইভাবে ইসলামী সালাম করিয়াছিলেন।

হযরত আবু যর (রাঃ) বলেন, ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, মক্কায় কাহাকেও তুমি তোমার ইসলাম গ্রহণের কথা বলিও না। কেননা আমার আশংকা হয় যে, তোমাকে তাহারা হত্যা করিয়া ফেলিবে।

কিন্তু আমি বলিলাম, ঐ সত্তার শপথ যাঁহার হাতে আমার প্রাণ! মসজিদুল হারামে গিয়া কোরায়শের সম্মুখে সত্যের ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত আমি মক্কা ত্যাগ করিব না।

অতঃপর আমি মসজিদে গিয়া উচ্চস্বরে ঘোষণা করিলাম যে, হে কোরায়শ গোত্র!

اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله *

আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই এবং মুহম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ্র রাসূল।

এই ঘোষণা শুনিবামাত্র লোকেরা আমার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। তখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব আমাকে আগলাইয়া রক্ষা করিলেন এবং বলিলেন, সর্বনাশ হউক তোমাদের! তোমরা গিফার গোত্রের একজন মানুষকে হত্যা করিতেছ। অথচ তাহাদের এলাকা দিয়াই তোমাদের বাণিজ্য কাফেলার যাতায়াতের পথ। তখন তাহারা আমাকে ছাড়িয়া দিল।

অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে আপন গোত্রে ফিরিয়া আসিলেন। পরে তাঁহার দাওয়াতে পুরা কাওম মুসলমান হইল এবং তাহাদিগকে লইয়া তিনি মদীনায় হিজরত করিলেন।

তাঁহার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

ما اقلت الغبراء و لا اظلت الخضراء اصدق لهجة من ابى ذر *

আবু যরের চাইতে সত্যভাষী কাহাকেও পৃথিবী বহন করে নাই এবং আকাশ ছায়া দান করে নাই।

শেষ জীবনে তিনি মদীনার পার্শ্ববর্তী রাবযা নামক পল্লীতে বসবাস করিতেন। সেখানেই বত্রিশ হিজরীতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

তাঁহার বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা দুইশত একাশি। তন্মধ্যে বুখারী ও মুসলিম শরীফে বারটি এবং এককভাবে বুখারী শরীফে দুইটি এবং মুসলিম শরীফে সতেরটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে।

৪৪। হযরত মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)

আঠার বৎসর বয়সে তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। 'আকাবার বাই'আত ও বদরসহ সকল যুদ্ধে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত অংশ গ্রহণ করিয়াছেন।

তাহার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اعلم امتى بالحلال و الحرام معاذ بن جبل *

আমার উম্মতের মাঝে হালাল হারাম সম্পর্কে মু'আয বিন জাবাল সর্বাধিক জ্ঞাত।

অপর এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে মু'আয! আমি তোমাকে ভালবাসি। তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র কসম! ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমিও আপনাকে ভালবাসি।

রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন মু'আয আলিমগণের অগ্রে একতীর পরিমাণ দূরত্বে অবস্থান করিবে।

আঠার হিজরীতে মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়সে প্লেগে আক্রান্ত হইয়া তিনি মৃত্যু বরণ করেন। পূর্ব জর্দানের বায়সান অঞ্চলে তাঁহার কবর বিদ্যমান।

তাঁহার বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা একশত সাতান্ন, তন্মধ্যে বুখারী ও মুসলিম শরীফে একত্রে

দুইটি হাদীছ এবং এককভাবে বুখারী শরীফে দুইটি এবং মুসলিম শরীফে একটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে।

৪৫। হযরত আবুল মুনযির উবাই বিন কা'আব (রাঃ)

ইনি খাযরাজ গোত্রের আনসারী ছাহাবী। আসল নাম উবাই, কুনিয়াত বা উপনাম আবুল মুনযির। এই উপনাম স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাখিয়াছেন।

দ্বিতীয় 'আকাবার বাই'আতে অংশ গ্রহণকারী সত্তর জন আনসারীর কাফেলায় তিনিও শরীক ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত বদরসহ সকল যুদ্ধে শরীক ছিলেন। তাহার গুণ ও গৌরব অনেক। তন্মধ্যে একটি এই যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার উবাই ইবনে কা'আব (রাঃ)-কে সূরা "লাম ইয়াকুন" পড়িয়া শুনাইলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ আমাকে হুকুম করিয়াছেন তোমাকে পড়িয়া শুনাইবার জন্য। বস্তুতঃ ইহা এমন অনন্য গৌরব যাহাতে অন্য কোন ছাহাবী তাঁহার শরীক নহেন।

হযরত উছমান (রাঃ)-এর খিলাফতকালে ত্রিশ হিজরীতে মদীনা শরীফে তিনি ইনতিকাল করেন এবং সেখানেই সমাধিস্থ হন। তাঁহার বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা একশত চৌষট্টিটি। তন্মধ্যে বুখারী ও মুসলিম শরীফে একত্রে তিনটি এবং এককভাবে বুখারী শরীফে তিনটি এবং মুসলিম শরীফে সাতটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে।

৪৬। হযরত আবু মুহম্মদ আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আছ (রাঃ)

তাঁহার পিতা আমর ইবনুল আছ (রাঃ)ও প্রসিদ্ধ ছাহাবী ছিলেন। তাঁহার ও তাঁহার পিতার বয়সের মাঝে মাত্র বার বৎসরের ব্যবধান ছিল। পিতার পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে ইলম ও হাদীছ সংগ্রহকারী ছাহাবাগণের মাঝে তাঁহার স্থান ছিল সর্বোচ্চ। কিন্তু তিনি মিশরে অধিবাস গ্রহণের কারণে তাহার ইলম ও হাদীছ প্রসার লাভ করে নাই। পক্ষান্তরে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) মদীনায় থাকিবার কারণে তাঁহার হাদীছ প্রসার লাভ করিয়াছে। অত্যধিক ইবাদতগুযার ছিলেন। এমন কি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে ইবাদতের পরিমাণ কমাইবার উপদেশ দিয়াছিলেন। সর্বদা কোরআন তিলাওয়াত ছিল তাঁহার প্রিয় আমল। তাঁহার বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা সাতশত। তন্মধ্যে বুখারী ও মুসলিম শরীফে একত্রে সতেরটি এবং এককভাবে বুখারী শরীফে আটটি এবং মুসলিম শরীফে বিশটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে।

৪৭। হযরত জাবির বিন সামুরাহ (রাঃ)

তাঁহার উপনাম হইল আবু আব্দুল্লাহ। তিনি ও তাঁহার পিতা হযরত সামুরাহ উভয়ে ছাহাবী ছিলেন। ছিষট্টি হিজরীতে তাঁহার ইন্তিকাল হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে তিনি একশত ছয়চল্লিশটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে বুখারী ও মুসলিম শরীফে একত্রে দুইটি এবং এককভাবে মুসলিম শরীফে তেইশটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে।

৪৮। হযরত আবু জোহায়ফা ওয়াহব বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ)

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াফাতের সময় তিনি অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন। আলী

(রাঃ) তাঁহাকে খুব ভালবাসিতেন এবং সম্মান করিতেন। তিনি তাঁহাকে কুফার বাইতুল মালের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বাহাত্তর হিজরীতে সেখানেই তাঁহার ইন্তিকাল হয়।

তাঁহার বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা পঁয়তাল্লিশটি। তন্মধ্যে বুখারী ও মুসলিম শরীফে একত্রে দুইটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে এককভাবে বুখারী শরীফে দুইটি হাদীছ এবং মুসলিম শরীফে তিনটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে।

৪৯। হযরত হানযালাহ (রাঃ)

তাঁহার কুনিয়াত বা উপনাম হইল আবু রিবঈ। তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ অহী লিপিবদ্ধ করিবার দায়িত্ব পালন করিতেন। একবার রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে তায়েফবাসীদের নিকট এই বার্তাসহ প্রেরণ করিলেন যে, তোমরা সন্ধি চাহ কি না? যখন তিনি রওয়ানা হইলেন তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা তাহার এবং তাহার মত লোকদের অনুসরণ কর। তাঁহার বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা মাত্র তিনটি।

৫০। হযরত ইরবায বিন সারিয়া (রাঃ)

তাঁহার উপনাম হইল আবু নাজীহ। ইনি আহলে ছুফফার সদস্য ছিলেন। আল্লাহর ভয়ে যাহারা সর্বদা ক্রন্দন করিতেন ইনি ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। খুব শুরুর দিকেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সিরিয়ার হিমছ অঞ্চলে বসবাস করিতেন। সেখানেই পঁচাত্তর হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তাঁহার বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা একত্রিশ।

৫১। হযরত সালামা বিন আমর বিন আকওয়া (রাঃ)

তিনি বাইআতুর রিযওয়ানে শরীক ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে প্রথমে, মাঝে ও শেষে তিনবার বাই'আত হইয়াছেন। তিনি অসাধারণ সাহসী ও পাকা তীরন্দাজ ছিলেন। নেক ও পূণ্যের কাজে এবং সদাচারে অধিক অগ্রগামী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে সাতটি গাযওয়ায় শরীক ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সম্পর্কে বলিয়াছেন−

خير رجالنا سلمة بن الاكوع *

সালামা বিন আকওয়া আমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ পুরুষ।

তিনি মদীনাতে বসবাস করিতেন। কিন্তু উছমান (রাঃ)-এর শাহাদাতের পর তিনি মদীনার পার্শ্ববর্তী রাবযা এলাকায় চলিয়া যান এবং সেখানেই বসবাস করিতে থাকেন। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে তিনি মদীনায় ফিরিয়া আসেন এবং সেখানেই মৃত্যু বরণ করেন। চুয়াত্তর হিজরীতে আশি বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তাঁহার সূত্রে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে সাতাত্তরটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বুখারী ও মুসলিম শরীফে একত্রে ষোলটি এবং বুখারী শরীফে এককভাবে পাঁচটি এবং মুসলিম শরীফে নয়টি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে।

৫২। হযরত নোমান বিন বশির (রাঃ)

তাঁহার কুনিয়াত বা উপনাম হইল আবু আব্দুল্লাহ। ইনি খাযরায গোত্রীয় আনছারী ছাহাবী ছিলেন। তিনি ও তাঁহার পিতা উভয়ে ছাহাবী ছিলেন। তাঁহার পিতা বশির দ্বিতীয় 'আকাবার বাই'আত এবং বদর, অহুদসহ সকল যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে শরীক ছিলেন। তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর হাতে বাই'আতকারী প্রথম আনছারী ছাহাবী। তাঁহার পুত্র নোমান হিজরতের চার মাসের মাথায় জন্ম গ্রহণ করেন। হিজরতের পর তিনিই হইলেন প্রথম জন্মগ্রহণকারী আনছারী সন্তান। চৌষট্টি হিজরীর যিলহজ্জ মাসে সিরিয়ার হিমছ অঞ্চলে তিনি শহীদ হন। তাঁহার বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা একশত চৌদ্দ। তন্মধ্যে বুখারী ও মুসলিম শরীফে একত্রে পাঁচটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে এককভাবে বুখারী শরীফে একটি এবং মুসলিম শরীফে চারিটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে।

৫৩। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রাঃ)

তাঁহার বিভিন্ন কুনিয়াত বা উপনাম বর্ণিত আছে, যেমন আবু সাঈদ, আবু আব্দুর রহমান ও আবু যিয়াদ।

ইনি বাই'আতুর রিযওয়ানে শরীক ছাহাবী। প্রথমে মদীনাতেই বাস করিতেন। পরে বসরায় চলিয়া যান। তিনি ঐ সকল ক্রন্দনকারীদের একজন যাঁহাদের সম্পর্কে আয়াত নাযিল হইয়াছে–

وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَا اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا اَجِدُ مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَنْ لَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُوْنَ *

ষাট কিংবা ঊনষাট হিজরীতে বছরায় তিনি ইন্তিকাল করিয়াছেন এবং তাঁহার অছিয়ত মুতাবিক আবু বারযা আসলামী তাঁহার জানাযা পড়াইয়াছেন।

তাঁহার সূত্রে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে সর্বমোট তেতাল্লিশটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বুখারী ও মুসলিম শরীফে একত্রে চারিটি এবং এককভাবে বুখারী শরীফে একটি এবং মুসলিম শরীফে একটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে।

সমাপ্ত